জন্মান্তর রহস্য।

শ্রী সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সন ১৩০৬ সাল।

বিজ্ঞাপন।

জন্মান্তর ও জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলজনিত সুখ দুঃখ প্রাপ্তি প্রভৃতি আমাদের দেশীয়গণকে নূতন করিয়া বুঝাইতে যাওয়া কর্ম্মভোগ সন্দেহ নাই। কেন না, এতদ্দেশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জন্মান্তর ও জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন; এবং ব্রত-নিয়ম, জপ-তপ, দান-ধ্যান প্রভৃতি সমস্তই এই বিশ্বাসের পরিচায়ক। এই বিশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়াই ভারতীয় সতীকুল পতিপ্রেম বুকে করিয়া পরলোকে বা পরজন্মে পতির সঙ্গে মিলনের জন্য জ্বলন্ত চিতায় মৃতপতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন। এই বিশ্বাসের বলেই ভারতীয় নরগণ, বিপন্নার্ত্তিহর,—জড়দেহ বলি দিয়া শরণাগত রক্ষণে প্রস্তুত হইতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের নিকট সে সকল কবি-কল্পনা—আর কাব্যের অলঙ্কার। বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভ্রাটের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সমাজ হইতে যেন এই বিশ্বাসও শিশিস্থ কর্পূরের মত উপিয়া যাইতেছে। যদি জন্মান্তর, জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল ভোগ প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জাগরূক থাকিত, যদি আমরা অধ্যাত্ম জীবনের কথা, পরলোকের কথা, কর্ম্মফলজনিত অদৃষ্টের কথা, ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতির তলে না চাপিয়া ফেলিতাম, তবে কখনই ইহজীবনে পাপের আগুন জ্বালিয়া লইয়া দানবী-দীপ্তি-পূর্ণ াহনিতে বাসনার বসাহুতি লইয়া দাঁড়াইতাম না। আগেকার মত রোপকার, যম, নিয়ম [illegible] দ্ধি, অহিংসা, সত্যান্বেষণও ছাড়িতাম না। াহাতেই আমাদের [illegible] ব। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণাদি ধ্যাত্মশাস্ত্র সন্নিকর্ষে [illegible] বতারণা। তাহাতেই পারিজাত

প্রস্ফুটিত নন্দনকাননে এসেন্সের শিশি হাতে করিয়া দাঁড়ান। কিন্তু সময় যে তাহাই—আমাদের দেশের গোলাপ, জুঁই, চামেলি বিলাত ঘুরিয়া এসেন্স হইয়া আসিলে, তবেই ত আমরা আদর করি।

জন্মান্তর ও পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে, মানুষ কিসের জন্য ধর্ম্ম করিবে? ইহলোকের সঙ্গেই যদি মানুষের সকল সম্বন্ধ মুছিয়া যায়, মানুষের সকল জ্বালা ঘুচিয়া যায়—তবে যম, নিয়ম, উপাসনাদির আবশ্যক কি? কঠোর সংযম-বিধানের প্রয়োজন কি? তাহাতেই এই সমাজ-বিপ্লবের দিনে, এই ধর্ম্মবিভ্রাটের সময়ে আমি জড়বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য রাখিয়া, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-মতের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করিলাম। যদি ইহা পাঠে, একজন মানুষের হৃদয়েও পরলোকের দৃশ্য অঙ্কিত হয়, তবে কৃত-কৃতার্থ ও মানবজন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরন্তু আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণ জন্য মেস্‌মেরিজ, হিপ্‌নসিস, দূরানুভূতি বা ভাব পরিচালন প্রভৃতি এতৎ পুস্তকের অন্তর্গত করিয়াছি। তৎপরে, আত্মিক বা প্রেত-জীবনের তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে বলিয়া, কাযেই দেশীয় ও বিদেশীয় সর্ব্ব প্রকার ভৌতিকচক্র ও মন্ত্র তন্ত্রাদিও ইহাতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে, আমাকে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অনুসন্ধানে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর জজকোর্টের প্রধানতম উকিল, আমার পরম হিতৈষী বহু বিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বিএ, বি এল্, মহাশয় দুইখানি দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পাশ্চাত্য-দেশীয় পুস্তক প্রদানে এবং এই গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে বহুবি উপদেশ দানে, আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশ [illegible] র সমধিক সাহায্য কারি চির-বাধিত করিয়াছেন। তৎপরে কৃ[illegible] ত স্বীকার করিতে যে, কলিকাতার খ্যাতনামা উ[illegible] াবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত [illegible]

লার সুবিখ্যাত কবিরাজ চরক-সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে
স্কৃতশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত মহাশয় ভৃতি
ন্ধুর ও হিতৈষীগণ এই বিষয়ে উপদেশ দানে, গ্রন্থদানে ও
আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।
দি, পাঠকগণ এতৎগ্রন্থের অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া
মাঝে মাঝে দুই এক পাতা উল্টাইলে, এই কঠিন বিষয়ের
মীমাংসাই হইবে না। তজ্জন্য আমার বিনীত অনুরোধ
ইহার পাঠ আরম্ভ করিবেন। অবশেষে দুঃখের সহিত
যে, এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ রিয়াই আমি দারুণ
আক্রান্ত হই। এখনও তাহা হইতে াহতি পাই নাই।
গিয়াই আছে। সুতরাং এই পুস্তকের প্রুফসিট আমি
পারি নাই। বর্ণশুদ্ধি
য়াণের

সূচীপত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বিষয়।	পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জন্মান্তর রহস্য।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্মিকতত্ত্ব।

শিষ্য। জীবনে জন্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য-ইচ্ছার বশীভূত হইয়াই আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিব। প্রশ্নটা আপাততঃ অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু যে, যে প্রকারে যে বিষয় বুঝিতে পারে, তাহার সেই প্রকারে বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত। আপনি প্রেততত্ত্ব বিষয়ে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। তুমি 'প্রেত' এই শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহার করিতেছ? প্রেত (প্র + ইত) এই অর্থে প্রকৃষ্টরূপে গত, অর্থাৎ স্বর্গগত সূক্ষ্মশরীরী

বুঝাইত; কিন্তু আমার বিশ্বাস, মহাভারতের সময় হইতেই প্রেত শব্দ অন্যরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

শিষ্য। কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে?

গুরু। প্রেতযোনি ও প্রেতমূর্ত্তি ঘৃণাবাচক শব্দ হইয়াছে। প্রেতের আকৃতি ভয়ঙ্কর, দেহ দুর্গন্ধময় এবং জীবন কর্ম্মফলের অলঙ্ঘনীয় শাসনে অত্যন্ত ক্লেশজনক। প্রেতযোনি ধারণ করিয়া মানবাত্মা বিন্মূত্র ভক্ষণ করে, তাহাদের দেহে কীটাদির যন্ত্রণাদায়ক দংশন হইয়া থাকে। কিন্তু স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মা গত হইলেই তাহাকে প্রেত বলে। এখনকার পণ্ডিতগণ প্রেত শব্দ ঐরূপ কদর্থে পরিণত হওয়ায় সূক্ষ্মদেহীকে আত্মিক বা মুক্তাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি কি জানিতে চাহিতেছ, তাহা বল?

শিষ্য। যাহাকে The Science of Spiritualism অথবা Spiritual Philosophy বলে, অর্থাৎ মানুষ মরিয়া গিয়া আবার দেখা দেয়, জন্মান্তরের সকল কথা বলিয়া দেয়, স্থল বিশেষে দৌরাত্ম্যও করে, অসম্ভাবিত এবং অলৌকিক ক্রিয়াসকল পরিদর্শন করায়, ইহলোকের জীবন্ত মনুষ্যকে ভূতে পায়, জন্ম-জন্মান্তরের প্রতিহিংসা সাধন করে,—আমি সেইরূপ প্রেততত্ত্বের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

গুরু। এই তত্ত্বকে ইয়োরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ইংরেজি ফরাসী বিবিধ ভাষায় Psychical Science এবং Psychical Philosophy প্রভৃতি গৌরবাত্মক আখ্যায় আখ্যাত করিতেছেন। ঐগুলির বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে আত্মিকতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বলা যাইতে পারে। প্রাগুক্ত সুসভ্য দেশসমুদয়ে এই তত্ত্বের বহুল আলোচনা ও আবিষ্কার হইতেছে। ‘প্রেত’ এই শব্দ পরিত্যাগ করিয়া তুমি তাহাকে আত্মিক বা মুক্তাত্মা বলিয়া গেলে সুষ্ঠু

হইতে পারিবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি ভূতই না হয় বল,—ভূত সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস কি ?

শিষ্য। ভূতে আমার বিশ্বাস নাই।

গুরু। কেন ?

শিষ্য। মানুষ মরিলে কি আবার কিছু থাকে ?

গুরু। কিছু থাকে না ?

শিষ্য। কি থাকে ?

গুরু। আগে তাহাই স্থির কর,—তারপরে ভূত আছে কি না বলিব।

শিষ্য। হাঁ, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বিষয়টী অত্যন্ত জটিল। আবহমান কাল হইতে ঐ বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়া আসিতেছে।

শিষ্য। তবে বলিতে হইবে, এ বিষয়ের কোন মীমাংসাই অদ্যাপি হয় নাই।

গুরু। মীমাংসা নিশ্চয়ই হইয়াছে। তবে বুঝিবার ক্ষমতা চাই,—কোন বিষয়ই নিজে বুঝিতে না পারিলে, অপরে বুঝাইতে পারে না।

শিষ্য। আপনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, আমি বুঝিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

গুরু। এ স্থলে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিতে চাহি;—তুমি বোধ হয় জান, আমি প্রেততত্ত্ব (আত্মিকতত্ত্ব বলাই সঙ্গত) বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য অনেক দিন ধরিয়া অনেক প্রকার চেষ্টা করিতেছি, অনেক ভূতের ওঝার সঙ্গে এই বিষয়ের অনেক আলোচনা ও অনেক প্রকার পরীক্ষাদি করিয়া আসিতেছি। অনেক প্রকার ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অনেক পদস্থ বন্ধু-বান্ধবের নিকটেও এই

বিষয়ের অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, অনেক সাধু-মহান্তের নিকটে, অনেক ইয়োরোপীয় প্রেততত্ত্ববিৎ (Spiritualist) পণ্ডিতের নিকটে এ সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক কাণ্ড শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে উপদেশ দিতে হইলে, কিছু এক কথায় সমস্ত ব্যাপার বুঝান যাইবে না,—বিষয় অত্যন্ত গুরুতর; তুমি এ সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া বা অবগত হইয়া কি করিবে?

শিষ্য। আমার বিশ্বাস,—এই তত্ত্ব ভাল করিয়া জানিতে পারিলে এই জটিল বিশ্ব-রহস্যের সমুদয় অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবনের পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মফলের শক্তি ও গতি জানিবারই আমার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-পথে যাইবার জন্যই আমার এই প্রশ্ন। বলা বাহুল্য, প্রেততত্ত্বে জ্ঞান জন্মিলে, সে সকল জানিতে বাকি রহিবে না।

গুরু। এক্ষণে তুমি কি জানিতে বাসনা কর?

শিষ্য। আমি ত বলিয়াছি—ভূত আছে কি না?

গুরু। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি এবং তোমাকে দেখাতে পারি—ভূত আছে।

শিষ্য। ভূত আছে, বিশ্বাস করিতে পারি,—এবং আপনি যে দেখাইতে পারেন, তাহাও হয় ত বিশ্বাস করিতে পারি,—কিন্তু মানুষ মরিয়া ভূত হয়, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

গুরু। তবে কি বিশ্বাস কর? আমি তবে কি দেখাইতে পারি মনে কর?

শিষ্য। যে পঞ্চভূতে এই বিশাল-বিশ্ব বিরচিত, তাহারই এক দুই বা তিনের সংযোগ-বিয়োগে বিস্ময়কর ঘটনা সকল দর্শাইতে পারেন।

গুরু। অবশ্য রাসায়নিক ব্যাপারে এরূপ ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু তোমার ভুল যে, আত্মিকের (ভূতের) দ্বারা যে কার্য্য সংঘটন

ও সংসাধিত হয়, তাহা পাঞ্চভৌতিক সমষ্টি বা ব্যষ্টি দ্বারা ঘটিতে পারে।

শিষ্য। তবে কি যথার্থই ভূত আছে?

গুরু। নিশ্চয়ই আছে।

শিষ্য। ভূত হয় কে?

গুরু। ভূত হয় জীবাত্মা। ভূত শব্দের অর্থ গত। জীবাত্মা দেহ হইতে গমন করিলেই তাহাকে ভূত বলা যাইতে পারে। মানুষ মরিয়া গেলেই তাহার সমস্ত শেষ হয় না। মৃত্যুর নাম মহানিদ্রা, অথবা মহানির্ব্বাণ কহে;—মৃত্যুর নাম দেহত্যাগ। সাপ যেমন তাহার বহিরাবরণ (খোলস) পরিত্যাগ করিলেও ঠিক যেমন ছিল তেমনই থাকে,—কোন অংশেই পরিবর্ত্তিত হয় না; মানুষ ঠিক সেই প্রকার তাহার পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিলেও ঠিক যেমন ছিল, তেমনই থাকে,—কোন অংশেই পরিবর্ত্তিত বা অন্যপ্রকার হইয়া যায় না। এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া গত হইলেই তাহাকে ভূত বলে। ভাল কথায় আত্মিক বা মুক্তাত্মা বলাই সঙ্গত।

শিষ্য। আমি যদি বলি, পঞ্চভূতের গঠিত দেহের বিনাশে সকলের শেষ হয়, মৃত্যুর পরে আর কিছুই থাকে না!

গুরু। এরূপ প্রকারের কথা অনেকে বলিয়াছে, কিন্তু তাহার মূলে কিছুই নাই।

শিষ্য। ভাল, আত্মা যদিই থাকে, তবে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ত বিনাশ হইতে পারে?

গুরু। আত্মা অজয়, অমর ও অব্যয়।

শিষ্য। মৃত্যুর পরে আত্মা কি তবে চিরকালই ভূত হইয়া থাকে?

গুরু। এরূপ তুমি কি প্রকারে বুঝিলে ?

শিষ্য। তবে আত্মা কি, আত্মার আধার কোথায়, মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরে আত্মা কি অবস্থায় কোথায় যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাকে আগে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। এক কথায় এই সমুদয় বিষয়ের উত্তর হইতে পারিবে না। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে ; ঐ দেখ ভগবান্ মরীচিমালী তাঁহার দিগন্তবিস্তারী রশ্মি-কিরীট সংযত করিয়া পশ্চিমগগন-গায়ে মিশিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা-উপাসনার সময় হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার পরে আসিও, তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর করিতে চেষ্টা করিব।

শিষ্য। প্রণাম ;—তবে এখন বিদায় হই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ কাহাকে বলে ?

শিষ্য। আমি বৈকালে আপনাকে যে প্রশ্নগুলি করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর দিতে পারিবেন কি ?

গুরু। আমি পারিব না কেন ? আমি ব্রাহ্মণ—আবহমান কাল হইতে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ অধ্যাত্ম-জগত্তত্ত্বের আলোচনাতেই জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন। গুরুগিরিই আমার জাতীয় ব্যবসায়। কাজেই অধ্যাত্ম-জগতের আলোচনা করা ও সংবাদ অবগত হওয়া এবং শিষ্যগণকে সেই সংবাদ জ্ঞাত করানই আমার কার্য্য। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে কেন পারিব না ?

শিষ্য। আমি সেরূপ অর্থে বলি নাই। আমার ঐরূপ কথা

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই সময়ে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার অবকাশ আছে কি না?

গুরু। সকলগুলির উত্তর কি একবারেই হইতে পারিবে? ক্রমে ক্রমে হউক। একে একে জিজ্ঞাসা কর,—অদ্য যতদূর হয়, মীমাংসা হউক।

শিষ্য। আত্মা সম্বন্ধীয় প্রমাণ জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

গুরু। আত্মা সম্বন্ধীয় প্রমাণ কি,—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রমাণ কয় প্রকার, তাহা অবগত আছ কি না?

শিষ্য। হাঁ, তাহা জানি। প্রমাণ চারি প্রকার।

গুরু। কি কি?

শিষ্য। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ।

গুরু। ঐ চারি প্রকার প্রমাণ ভিন্ন বেদান্ত মতে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামে আরও দুই প্রকার প্রমাণ আছে। তুমি ইহার মধ্যে কোন্ কোন্ প্রমাণ মান্য কর?

শিষ্য। প্রত্যক্ষ।

গুরু। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহাকে বলে জান?

শিষ্য। হাঁ, জানি। ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। ইহা ষড়্‌বিধ—ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পার্শন ও মানস।

গুরু। ঐ ষড়্‌বিধ প্রমাণের অর্থগুলি ভাল করিয়া বল।

শিষ্য। ঘ্রাণজ—যাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানিতে পারা যায়; যথা—গন্ধ পাইয়া অবগত হওয়া যায় যে, বাগানে গোলাপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। রাসন—রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা জানিতে

পারা যায় ; যথা—চিনিতে মিষ্টত্ব আছে, রসনায় দিলে বুঝিতে পারা যায়। শ্রাবণ—যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানিতে পারা যায় ; যথা—কোকিলের স্বর-বিস্তার শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, বৃক্ষ-পত্র-কুঞ্জে কোকিল বসিয়া ডাকিতেছে। চাক্ষুষ—যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—ঐ আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছেন,—ইহা আমি চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। স্পার্শন—ত্বগিন্দ্রিয় সাহায্যে জ্ঞান। বায়ুর অস্তিত্ব-প্রমাণ এতদ্দ্বারাই হইয়া থাকে। মানস—যাহা মনের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় ; যথা—কালীঘাটে কালী আছেন, ইহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া মনে করিতে পারি।

গুরু। এতদ্ভিন্ন অপর প্রমাণগুলিও তোমাকে মান্য করিতে হইবে।

শিষ্য। অপর কোন্‌গুলি ?

গুরু। পূর্ব্বে যে অনুমান, উপমান ও শাব্দ প্রভৃতি প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিষ্য। কেন ?—যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, এমন প্রমাণ যদি আমি অস্বীকার করি—তাহাতে কি দোষ হয় ?

গুরু। অস্বীকার করিতে পার না। ধূম দেখিয়া অগ্নি আছে ইহা বুঝা যায়,—সুতরাং ধূম দেখিয়া অগ্নি আছে ইহা অনুমান প্রমাণের দ্বারাই স্থির হয়।

শিষ্য। অনুমান অর্থ কি ?

গুরু। হেতু বা তর্কদ্বারা কোন বস্তুর অনুভব।

শিষ্য। ধূম দেখিয়া আগুন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়,—ইহার হেতু হইল ধূম, কিন্তু সর্ব্বত্র ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব ঠিক হয় না। শীতকালের প্রত্যূষে নদী, পুষ্করিণী ও কূপ হইতে ধূম উঠে—খড় বা পললস্তূপ হইতে হেমন্ত বা শীতকালে ধূম উঠে,

তাহা দেখিয়া আগুন আছে, স্থির করিলে নিশ্চয়ই সে আগুন পাওয়া যায় না।

গুরু। সেই ভরসায় বহ্নিমান্ কাষ্ঠখণ্ডে হস্ত প্রদান করিলে হাত না পুড়িয়া কখনই থাকে না। সুতরাং কদাচ ব্যত্যয় ঘটিলেও সর্ব্বত্র সমীচীন। কাজেই তোমাকে অনুমান প্রমাণটিও মান্য করিয়া চলিতে হইবে। জ্যোৎস্না দেখিয়া চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে।

শিষ্য। উপমান কাহাকে বলে ?

গুরু। সাদৃশ্য-জ্ঞান-জন্য জ্ঞান। যথা—গো সদৃশ গবয়পদ বাচ্য ইত্যাকার জ্ঞান।

শিষ্য। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। গরুর সদৃশ কিন্তু কোন কোন লক্ষণ অল্পাধিক দর্শন করিয়া অপর জন্তুকে গবয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদি তোমাকে বলিয়া দি, বাজার হইতে তন্দুক ক্রয় করিয়া লইয়া আইস। তুমি কি-কিছু কিনিয়া আনিতে পার ?

শিষ্য। তন্দুক কাহাকে বলে ?

গুরু। তন্দুকের অন্য অর্থ আমি জানি না। দেখিতে ঠিক বেগুণের মত, কিন্তু তাহার বোঁটায় কাঁটা নাই আর একটু চেপ্টা।

শিষ্য। এখন আনিতে পারি।

গুরু। এবারে তুমি উপমান প্রমাণের বলে তন্দুক চিনিতে পারিলে ; সুতরাং ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, তুমি উপমান প্রমাণ মান না।

শিষ্য। শাব্দ কাহাকে বলে ?

গুরু। শব্দের দ্বারা যাহা প্রমাণীকৃত হয়।

শিষ্য। ভাল এ সকল প্রমাণ মানিলাম। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করুন।

গুরু। তাহার উত্তর দিব বলিয়াই তোমাকে প্রমাণগুলি শুনাইলাম। কেন না, সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে এই সকল প্রমাণের আবশ্যক হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আত্মার অস্তিত্ব।

গুরু। এক্ষণে, আত্মা কি তাহা বলিবার চেষ্টা করিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু আত্মতত্ত্ব অতি গহনবিষয়, উহা শাস্ত্রাদির আশ্রয় ব্যতীত বুঝা বা বুঝান যায় না। ইহার সমালোচনায় আমাদিগকে প্রধানতঃ শাস্ত্রেরই আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইবে। তৎপরে অন্যান্য যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারাও তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রুতি বলেন,—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ—
অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা—ইত্যাদি।

কঠশাখায় উক্ত হইয়াছে,—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মমঃ প্রগ্রহমেব চ॥—ইত্যাদি।
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

দ্বা সুপর্ণা সজুষা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

অর্থাৎ সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সখা, তাহার মধ্যে একটি (জীবাত্মা) সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্য (পরমাত্মা) নিরশন থাকিয়া, কেবল দর্শন মাত্র করেন।

শিষ্য। আরও গোলযোগ বাধাইলেন। আত্মা কি তবে দুইটি?

গুরু। হাঁ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মা কোন কর্ম্মের ফল-ভোক্তা নহেন—জীবাত্মাই সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে না পারিবার কারণ আছে। আদৌ তুমি পাঞ্চভৌতিক দেহাতিরিক্ত কিছু আছে, তাহারই ধারণা করিতেছ না,—তাহার উপরে আবার পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথা হইতেছে।

শিষ্য। আপনি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। পরমাত্মা, অজ, নিত্য, পরম, পুরাণ। পরমাত্মার যেরূপ উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরূপ সৃষ্টি-অবস্থায় সেই পরমাত্মার যে সকল অংশ বা বিভূতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ভিন্নভাবে জীবাত্মারূপে বিচরণ করে, তাহাদেরও কখন জন্ম-মৃত্যু নাই। (১) পরব্রহ্মের এক অংশ কলা বা পাদ চরাচর কারণ-কূটস্থ অব্যক্ত অক্ষর পরম অব্যয় ব্রহ্মরূপে ব্যাপ্ত হইয়া সৃষ্টিতে পুরুষোত্তম বীজপ্রদ পিতা ঈশ্বররূপে প্রকাশিত। তাঁহার দুইরূপ প্রকৃতি—এক দৈবী পরা বা জীব প্রকৃতি, যাহা হইতে ভূত বা

ভোক্তা পুরুষ, ক্ষর ক্ষেত্রজ্ঞ বীজরূপে উদ্ভূত। আর এক (২) অপরা বা ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতি, যাহা হইতে জগৎ-যোনি মহান্ বা চৈতন্য-পরিণাম পর্য্যন্ত ক্ষেত্র উদ্ভূত বিকৃত হইয়া জড় জগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সনাতন জীবভূত অংশ জগৎ ধারণ করে, আবার মহালয়কালে ঈশ্বরে লীন হয়। অথচ এই পুরুষ-প্রকৃতিরূপ ঈশ্বরের ভাব অনাদি, তবে ইহা কেবল সৃষ্টিকালেই নিত্য ও প্রকট অবস্থায় থাকে।

শিষ্য। তাহা হইলে আপনার মতে জীবাত্মাই কর্ম্মফলাদি ভোগ করিয়া থাকেন ?

গুরু। আমার মতে কি বলিতেছ ? ইহাই সাধারণ এবং শাস্ত্রের মত।

শিষ্য। তাহা হইলে পরমাত্মাই ব্রহ্ম ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। তবে ত অনন্ত কোটি জীবে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মের অবস্থিতি ! ব্রহ্ম কতগুলি ?

গুরু। মূর্খ ! তাহা নহে। একব্রহ্মেরই ভোগজন্য অধ্যাসহেতু সমস্ত জগতে নানারূপ শরীরধারী আত্মা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে ;—"অন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তং পঞ্চকোষান্ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানং কল্পিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" ব্যষ্টিপুরুষের ন্যায় সমষ্টি আত্মার বা অব্যয় পুরুষ ঈশ্বরের পঞ্চকোষময় দেহ আছে। যথা,—(১) পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত ও তাহার কার্য্যাত্মক স্থূল সমষ্টিই অন্নময়কোষ, ইহাই বিরাট মূর্ত্তি ; (২) উহার কারণ স্বরূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত ও তাহার কার্য্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময়-কোষ ; (৩) তাহার নাম মাত্রাত্মক সমষ্টি জ্ঞানশক্তি মনোময় কোষ ; এবং (৪) তাহার স্বরূপাত্মক বিজ্ঞানময়

কোষ। এই প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময় কোষ বা সূক্ষ্ম সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভাখ্য লিঙ্গশরীর। আর (৫) উহার কারণাত্মক মায়া উপস্থিত চৈতন্য সর্ব্ব-সংস্কার শেষ আত্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ। সাঙ্খ্যমতে শরীর দুই প্রকার—সূক্ষ্মশরীর এবং স্থূল বা মাতা-পিতৃজ শরীর। মৃত্যুতে কেবল স্থূল বা অন্নময় শরীর ধ্বংস হয়। জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীরের সহিত এ জীবনের ও পূর্ব্বজীবনের সংস্কারগুলিতে বদ্ধ হইয়া প্রয়াণ করে। কারণ শরীর দেবতার, আর লিঙ্গশরীর মানুষের। এই শরীর পাঁচটি কোষ বা আবরণময়। যথা—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ। মৃত্যুতে কেবল অন্নময়-কোষ ধ্বংস হয়। মোক্ষলাভে সকল কোষগুলিই ধ্বংস হয়, পুরুষ এই শরীর হইতে ভিন্ন।

শিষ্য। আত্মার অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করি?

গুরু। কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে?

শিষ্য। যে বস্তুর প্রত্যক্ষ নাই, তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ কি?

গুরু। প্রত্যক্ষ দেখিয়া কোন্ পদার্থটি বস্তু বলিয়া স্থির করিতে পার? আমাদের সম্মুখে ঐ যে পিতলের ঘটীটা রহিয়াছে, উহাকে কি বলিয়া ভাবিতেছ?

শিষ্য। যখন উহাকে চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি, তখন উহাকে বস্তু বলিব বৈ কি।

গুরু। কোন্ সাক্ষীর বলে উহাকে বস্তু বলিতেছ? চক্ষে দেখিতেছ, উহার বর্ণ পীত এবং লম্বাটে আকার, আর হস্তের স্পর্শে অনুভব করিতেছ, উহা কঠিন পদার্থ। ইহা ব্যতীত ঐ ঘটী সম্বন্ধে তোমার আর কি প্রকৃত বস্তু-জ্ঞান জন্মিয়াছে? ঐ ঘটীটাকে তাপ-সহযোগে গলাইলে তোমার এই বস্তুসংজ্ঞা-জ্ঞান নষ্ট হইয়া যাইবে,—যখন বহ্নির উত্তাপে তরল ও পীতবর্ণ ধারণ করিবে, তখন তুমি কি আর পিত্তল

বলিয়া চিনিতে পারিবে? তৎপরে বাতাসকে দেখিতে পাও না, কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার কর। চিনি যেমন দুগ্ধে মিশিয়া যায়, তখন তাহাকে আর দেখিতে পাও না, তখনও কি তাহাকে কেবল রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে চিনির অনুভব জ্ঞান করিয়া দুগ্ধের মধ্যে অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর না?

শিষ্য। হাঁ—তাহা করিতে হয় বই কি!

গুরু। চক্ষুতে না দেখিতে পাইলেও ক্রিয়াদর্শনে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। রথের গতি দর্শনে যেমন সারথির বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ দেহের বিদ্যমানতা ও দৈহিক ক্রিয়া দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং অস্থি-মাংসময় স্থূলদেহ ভিন্ন আর যে কিছু আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

দেহাত্মবাদ খণ্ডন।

শিষ্য। আপনি যে স্থূল দেহাতিরিক্ত আত্মার কথা বলিলেন, অনেক খ্যাতনামা দার্শনিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক হক্স্‌লি বলেন,—প্রাণপঙ্ক নামক এক প্রকার জৈবনিক পদার্থের পারমাণবিক শক্তিসমষ্টির ফল আমাদের জীবন এবং সেই জৈবনিক পদার্থের পারমাণবিক পরিবর্ত্তনেরই বিকাশ চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্য ও প্রতিভা, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মানসিক কার্য্য সকল শরীরের বিশেষ অংশে সংঘটিত পারমাণবিক পরিবর্ত্তনমাত্র।

তিনি আরও বলিলেন, বিজ্ঞানে উন্নতির সঙ্গে জড়তত্ত্ব ও কার্য্যকারী তত্ত্বের অধিকার বিস্তৃত হইবে এবং তৎসঙ্গে মনুষ্যের চিন্তারাজ্য হইতে আত্মতত্ত্ব বিদায় গ্রহণ করিবে, * আমাদের আর্য্যপণ্ডিতগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, যদিও ভূতসকল অচেতন তথাপি তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে, তাহাতে চৈতন্য জন্মে। গুড় তণ্ডুল প্রভৃতি প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য একত্র হইলে ক্রিয়াবিশেষে তদ্দ্বারা সুরা প্রস্তুত হয়, এবং তখন তাহার মাদকতা শক্তি জন্মে। সেইরূপ ঐ দেহ অচেতন ভূতসমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেও সমষ্টির পরিমাণে তাহাতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, পৃথক্ কোনরূপ আত্মার অস্তিত্ব নাই। †

গুরু। হক্সলি প্রভৃতি জড়বাদিগণ (Materialist) জড়তত্ত্বেরই আলোচনায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া জড়তত্ত্বে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া কেবল বিরোধ করিবার আশায় সময়ে সময়ে ইন্দ্রিয়াতীত গূঢ় রহস্য আত্ম-তত্ত্বের নিকটে উপস্থিত হইলে, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক প্রকৃত সত্য যে জানিতে পারিবেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? তুমি বোধ হয় স্বীকার করিবে যে, কোন স্থূল বিষয়েরও পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও তদ্বিষয়ক ধ্যান না করিলে, তাহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। পাশ্চাত্য জড়বাদিগণ জড়ের আলোচনা ও ধ্যান করিয়া চৈতন্যের সন্ধান কোথায়

* The progress of science in all ages has meant the extension of the province of what we call matter, causation and the concomitant gradual banishment from all regions of human thought, of what we call spirit and spontaneity.

† চতুর্ভ্যঃ ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভো মদশক্তিবৎ॥ চার্ব্বকাঃ।

পাইবে ? আত্মার সহজ জ্ঞানের প্রতি যদি আমাদের সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কেবল ঈশ্বর-জ্ঞানের কেন, কোন প্রকার জ্ঞানেরই ভিত্তি থাকিতে পারে না। ঈশ্বর আপনার সত্তা দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ রাখিতে পারেন, কিন্তু সহজ জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলে আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না। সহজজ্ঞান যেমন জড়তত্ত্বের মূলসত্য প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মতত্ত্বেরও মূলসত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, কার্য্য করিতেছি, কিন্তু "আমি" যে এই সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা যুক্তি তর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করা যায় না, তথাপি সহজ জ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করি যে, আমার কৃত কার্য্য আমিই করিতেছি। আমি নদীর তীরে বসিয়া সুন্দর দৃশ্যসমূহ দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি ; সহসা তথায় দুইটি বালক কলহে প্রবৃত্ত হইয়া একটি অপরকে ঠেলিয়া নদীগর্ভে ফেলিয়া দিল,—পতিত বালক নদীমধ্যে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। আমি প্রথম বালকের দুর্ব্বৃত্ত আচরণ দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম এবং দ্বিতীয় বালকের কষ্ট দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য নদীতে অবতরণ করিলাম। এখানে সহজজ্ঞান কেমন সুন্দর প্রকাশ করিতেছে যে, এই দেহমধ্যস্থ ব্যক্তিই (আত্মা) আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, কলহ দেখিয়াছে, একটি বালককে তাহার আচরণের জন্য শতবার ধিক্কার দিয়াছে ; এবং অপর বালককে রক্ষা করিবার জন্য নদীতে অবতরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি সে নিজে জানিয়াছে যে, সে এই কার্য্যগুলি করিয়াছে। এই আত্মা সর্ব্বপ্রকার চিন্তার, সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির ভিত্তিস্বরূপ অবস্থিত ; সুতরাং ইহা একটি সদ্বস্তু (Nomenon) অর্থাৎ ইহা ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত বা তিরোহিত হয় না।

অধিকাংশ জড়বাদী এই সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য না বুঝিয়া, আত্মাকে প্রতিভাসের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপের জড়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদীদিগের অন্যান্য গুরুকুলতিলক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার অনেক আলোচনার পরে এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। অবশেষে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, জড়াতিরিক্ত আরও কোন কিছু আছে। তিনি বলিতেছেন যে, প্রতিভাস মাত্রেরই বিষয়ী * থাকিবে। এই বিষয়ী না থাকিলে সংশয়বাদী তাঁহার অনুভূতি প্রভৃতি প্রতিভাসকে তাঁহার বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না, আর সংশয়বাদী অন্যান্য প্রতিভাসের ন্যায় স্বীয় ব্যক্তিগত অস্তিত্বেরও (আত্মার অস্তিত্ব) প্রতিভাস যখন প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি অন্যান্য প্রতিভাসের প্রকৃত সত্তা স্বীকার করিলেও স্বীয় ব্যক্তিগত প্রতিভাসকে অস্বীকার করেন কেন, ভ্রান্ত কেন?—তাঁহার মতে কোন সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী এই সকল গুরুতর আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন না; এবং সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। † সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে, বিষয়ী আত্মা না থাকিলে অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি কোন কর্ম্মই চলিতে পারিত না, তখন আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদির

* দার্শনিকভাবে এই কথার অর্থ এইরূপ হইতে পারে,—বিষয়,—Object. বিষয়ী—Subject.

† How can conciousness be wholly resolved into impressions and ideas, that is, into sensations and thoughts—when an impression necessarily implies something impressed? Or again, how can the sceptic, who has decomposed his consciousness into impressions and ideas, explain the fact that he considers them as his? Or once more, if he admit (as he must) that he has an impression of his personal existence, what warrant can be shown

দ্বারা অনুভব করা যায় না বলিয়া যে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইতে পারে না।

আর চার্ব্বাকদর্শনের যে কথা তুমি উত্থাপন করিয়াছিলে, তাহাও গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেন না, গুড়-তণ্ডুল পৃথক্‌ভাবে মাদক নহে, একত্র হইয়া ক্রিয়াবিশেষে মাদকত্ব প্রাপ্ত হয়,—কিন্তু তাহার একরূপ শক্তিই জন্মিয়া থাকে। মানুষের দেহে যদি সেইরূপ ভূতসমষ্টিতে কোন শক্তি জন্মিত, তাহা এক প্রকারেরই হইত; এবং দেহাবয়ব পরিবর্ত্তনে সে জ্ঞানেরও ধ্বংস হইত। বাল্যকালে যে জ্ঞান হইয়াছিল, যৌবনকালে তাহার আর কিছুই থাকিত না; কেন না দেহের পরিমাণ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আশ্রয়ের নাশ না হইলে, পরিমাণের নাশ হয় না। বাল্য-শরীরে পরিমাণের নাশ হইয়াছে দেখিয়া, ঐ পরিমাণের আশ্রয় বাল্য-শরীরেরও নাশ হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখ,—বাল্যশরীর যে বস্তু দেখিয়াছিল, যৌবনশরীর সে বস্তুর স্মরণ কি প্রকারে করিতে পারিত? যদি ভূতসমষ্টি-দেহই চৈতন্য হইত, তবে বাল্য-দেহই দর্শন করিয়াছিল, তাহার যখন বিনাশ হইয়াছে, তখন সে স্মৃতিরও বিনাশ হইয়া যাইত।

শিষ্য। এখানে আমার একটী কথা আছে। যদি বলি, কারণ যে বস্তু অনুভব করিয়াছিল, কার্য্য সেই বস্তু স্মরণ করিতে পারে?

গুরু। কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তোমার কথার বোধ হয় ভাবার্থ এইরূপ যে, পূর্ব্ব শরীরের উৎপন্ন সংস্কার সকল পরবর্ত্তী শরীরে সংক্রামিত হয়।

---

for rejecting this impression as unreal, while he accepts all his other impressions as real? Unless he can give satisfactory answers to those questions, which he can not, he must abandon his conclusions, and must admit the reality of the individual mind.

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। তাহা হইতে পারে না;—কেন না তাহা হইলে মাতা কর্তৃক অনুভূত বস্তুর গর্ভস্থ শিশু কর্তৃক স্মরণ হইত। মাতা যে সকল বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, মাতার শরীর হইতে উৎপন্ন সন্তান সেই সকল বস্তু কেন স্মরণ করিতে পারে না? তবেই দেখ, ভূতসমূহের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, একথা বলা অসঙ্গত—এতদতিরিক্ত যে এক নিত্য বিরাট চৈতন্য দেহে আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

বিশেষতঃ দেহ চেতন হইলে, বালকের প্রথম প্রবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইচ্ছা ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না,—ইহা তাহার প্রিয় এবং তাহার অপ্রিয়; এজ্ঞান তখনও তাহার জন্মে নাই। বালক সর্প দেখিলে স্বচ্ছন্দে হস্তপ্রসারণ করিয়া দেয়, তবে তাহার ইচ্ছা আইসে কোথা হইতে? যদি বল, বালক জন্মান্তরে অনুভূত ইষ্ট ও অনিষ্টের স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু দেহ চৈতন্য হইলে তাহার সে দেহ ত পূর্ব্বজন্মেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব দেহ চৈতন্য নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্যই আত্মা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।

শিষ্য। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণই সমস্ত ক্রিয়ার কারণ ও কর্ত্তা অর্থাৎ চৈতন্য ইন্দ্রিয়সমূহেই বিদ্যমান আছে, পৃথক্ আত্মা নাই; এরূপ বুঝিলে কি দোষ হয়?

গুরু। তাহাও কি হইতে পারে? চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে চৈতন্য কখনও নাই। কেন না, তাহা হইলে কোন ইন্দ্রিয়ের বিনাশে তদিন্দ্রিয়-

জনিত অনুভবের স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চক্ষুর নাশ হইল, অথচ পূর্ব্বদৃষ্ট স্মরণ হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এ স্মরণ কে করিতেছে? অবশ্যই যে অনুভব করিয়াছিল, সেই স্মরণ করিবে; কিন্তু অনুভবকারীর চক্ষুরিন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই; অপর কাহাকর্তৃক স্মরণও সম্ভবপর নহে, কারণ স্মরণ ও অনুভবের সামানাধিকরণ্য হেতু পরস্পর কার্য্য-কারণ ভাব সম্বন্ধ; অনুভব করিয়াছিলেন গোপীনাথ, স্মরণ করিলেন যজ্ঞেশ্বর, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অবশ্যই ইন্দ্রিয়গণ ব্যতিরিক্ত কোন আত্মা আছেন, যিনি মন ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থ দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে চক্ষুর নাশ হইলে, তৎপদার্থের স্মরণ করিতেছেন!

শিষ্য। ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তা না হউন,—কিন্তু যে মনের কথা বলিবেন—সেই মনই কর্ত্তা। মন ব্যতীত আত্মা নামক কোন পদার্থ নাই। মনই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপের দর্শন করেন, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শের অনুভব করেন, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করেন। মনই সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয়; ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস হইলেও মনেরই সে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। অতএব মন ব্যতীত পৃথক্ আত্মা নাই, বলিলে কি দোষ হয়?

গুরু। তাহাতে দোষ আছে, মনও আত্মা নহে। জ্ঞান-সুখাদি মনের ধর্ম্ম বা গুণ হইলে আমরা জ্ঞান-সুখাদি অনুভব করিতে পারিতাম না। "ত্বঙ্ মনঃসংযোগো জ্ঞানসামান্যে কারণম্" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে সময়ে চক্ষুরি য়ের সহিত রূপের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ ও মনের সংযোগ হইয়া দর্শনজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সময়ে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ হইলেও মনঃসংযোগভাবে শ্রবণ উৎপন্ন হয় না।

যদি মন মহৎ, বিভু বা ব্যাপনশীল পদার্থ হইত, তাহা হইলে যখন মন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া দর্শনজ্ঞানোৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্রবণ জ্ঞানোৎপাদনেও ব্যাপৃত থাকিতে পারিত। তাহা হইলে যুগপৎ দর্শন-শ্রবণাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইত। কিন্তু সকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং পাশ্চত্যদর্শনও স্বীকার করিয়াছে যে, এককালে দুই বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায় না। জ্ঞান সকলের যুগপৎ অনুপপত্তিহেতু মন মহৎ, বিভু বা ব্যাপনশীল পদার্থ নহে, সুতরাং মন অণুপদার্থ। অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব মনেরও প্রত্যক্ষ অসম্ভব। যদি মনই অপ্রত্যক্ষ হইল, তাহা হইলে জ্ঞান-সুখাদি মনের গুণসমূহও অপ্রত্যক্ষ হইবে, অর্থাৎ চাক্ষুষাদি মানস পর্য্যন্ত কোন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবে না। আমাদের মন ব্যতীত এক ব্যাপনশীল আত্মা আছে, জ্ঞান সুখাদি উহারই গুণ. মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উক্ত জ্ঞান-সুখাদির মানস প্রত্যক্ষ হয়; অতএব ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপের জ্ঞান হয়; কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়, নাসিকার দ্বারা গন্ধের জ্ঞান হয়, জিহ্বা দ্বারা রসের জ্ঞান হয়, ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শের জ্ঞান হয়,—কিন্তু সুখ-দুঃখাদি চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করা যায় না, অপর ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়দ্বারাও সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান জন্মে না। অতএব সুখ-দুঃখাদি অনুভবের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। সেই অন্তরিন্দ্রিয়ই মন, এবং মনের সাহায্যে যিনি সুখ-দুঃখাদি অনুভব করেন, সেই কর্ত্তার নাম জীবাত্মা।

শিষ্য। সকলেই বলিয়া থাকে, ঐ মানুষের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, —ঐ বৃক্ষের প্রাণ নাই, মরিয়া গিয়াছে—তাহা হইলে বোধ হয় স্থূলদেহে প্রাণাতিরিক্ত আর কিছুই নাই? প্রাণই সকল।

গুরু। প্রাণ কি, জান?

শিষ্য। লোকে বলে, প্রাণবায়ু—যথা অমুকের প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গিয়াছে।

গুরু। হাঁ, প্রাণবায়ু; ইহা নিশ্চিত। তবেই দেখ—সদ্‌বস্তু হইতে পারে না। সদ্‌বস্তু অর্থাৎ আত্মা হইতেই প্রাণ জন্মিয়াছে,—যেমন পুরুষের ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাতেই প্রাণ অবলম্বিত। মনের সঙ্কল্প মাত্রেই প্রাণসকল এই শরীরে আগমন করিয়াছে। *

শিষ্য। প্রাণসকল,—সে কি প্রকার?

গুরু। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই দেহস্থ পঞ্চ বায়ু—এই পাঁচটিকেই প্রাণ বলিয়া থাকে,—তদতিরিক্ত নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পাঁচটী বায়ু বা প্রাণ আছে।

শিষ্য। এই সকল বায়ু দেহের কোথায় কি অবস্থায় থাকে এবং তাহাদিগের ক্রিয়া কি—তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। জীবের "দেহের স্বরূপতত্ত্ব" বিষয়ক প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে সমস্তই বলিব। এক্ষণে প্রাণ যে আত্মা নহে এবং আত্মা হইতেই যে প্রাণের সদ্ভাব,—তাহাও বুঝিয়া লও। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও এ কথা স্বীকার করেন। অধ্যাপক টেট্ (Professor Tait) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি-সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ভৌতিক তত্ত্বাবলীর সাহায্যে প্রাণ পদার্থ কি, জানিলেও জানা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ বিনা প্রাণের

---

* আত্মন এব প্রাণো জায়তে
যথৈষা পুরুষেচ্ছায়ৈ তস্মিন্ এতদাততম্।
মনঃ কৃতেনায়াত্যস্মিন্ শরীরে ॥ প্রশ্নোপনিষৎ ॥
প্রাণাপাণৌ তথা ব্যানসমানোদানসংজ্ঞকাঃ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়।
দশৈতো বায়ু বিকৃতীস্তথা গৃহ্ণাতি লাঘবম্ ॥ শিবগীতা।

উৎপত্তি যে অসম্ভব, তাহা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। *
অতএব ইহা সর্ব্বপ্রকারেই স্থির হইতেছে যে, প্রাণ আত্মা নহে,--প্রাণ
হইতে জীবাত্মা পৃথক্‌।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান-সমষ্টি আত্মা নহে।

শিষ্য। এখানে আর একটি কথা আছে। যদি চক্ষুরাদির কারণত্ব
অস্বীকার করিয়া স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞান-সমষ্টিকেই আত্মা বলা যায় এবং সুখ-
দুঃখাদি উহারই আকার-বিশেষ বলিয়া অবধারণ করা যায়,—তবে কোন
আপত্তি হইতে পারে কি ?

গুরু। ছিন্ন রজ্জুতে সর্পভ্রম করিলে, আপত্তি না হইয়া থাকিতে
পারে কি ? এ তর্ক যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। জ্ঞানসমষ্টি আত্মা হইতে পারে না, স্বভাবতঃই জ্ঞান জন্মিতেছে,
চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ যথাক্রমে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানসমূহের কারণ বা
সাধন নহে ; বোধ হয়, তুমি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতে চাহ ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। তাহা হইতে পারে না। কারণ স্বভাবতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন

* But let no one imagine that, should we ever penetrate this mystery, we shall thereby enable to produce, except from life even the lowest form of life—Recent Advance in Physical Science P. 14.

হইতেছে, তাহা কি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞান কি যৎকিঞ্চিৎ বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান ? যদি অখিলব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞান হয়, তবে সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়েন। আর যদি যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়, তবে কোন্ বিষয়ের জ্ঞান, এরূপ নিয়ামকের অভাব হইয়াপড়ে। কোন ব্যক্তিই কোন বস্তুই নির্দ্দিষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন না। কেন না, কোন্ জ্ঞান জন্মিবে, তাহার নিশ্চয় নাই। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ স্বীকার করিলে, ঘটাদিও জ্ঞান হইয়া পড়ে, জ্ঞাতব্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত কোন পদার্থই থাকে না। যদি বল, জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, অতএব ঘটও জ্ঞান, তাহা হইলে অনুভূয়মান ঘটাদির অপলাপ করা হয়। যদি বল ঘট, জ্ঞানেরই আকার বিশেষ তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি এই আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু আছে কি না। যদি আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু নয়, তাহা হইলে আকারের জ্ঞান হইতে পারে না ; এবং জ্ঞান ব্যতিরিক্তও পদার্থ আছে, স্বীকার করা হয়। আর যদি আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু না হয়, তাহা হইলে সমূহাবলম্বনে নীলাকারও পীতাকার হইয়া পড়ে, কেন না জ্ঞানের স্বরূপতঃ কোন বিশেষত্ব বা বিভেদ নাই।

শিষ্য। এস্থলে আমার একটী কথা আছে।

গুরু। বল কি ?

শিষ্য। অপোহরূপ অর্থাৎ অতদ্ব্যাবৃত্ত (Different from what is not that, i, e, a blue is that which is different from not blue) নীলত্বাদি জ্ঞানের ধর্ম্ম হউক, অর্থাৎ নীলজ্ঞান হইবার সময় অনীল (পীত শ্বেত ইত্যাদি) হইতে পৃথক্, এরূপভাবে জ্ঞান হউক।

গুরু। তাহা অসম্ভব। কেন না, নীলত্ব ও অনীলত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র জ্ঞানে সমাবেশ ব্যতীত অনীল হইতে পৃথক্ নীল এরূপ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ নীলত্ব ও অনীলত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একত্র

জ্ঞানে সমাবেশিত হইতে পারে না। যদি বল নীলত্ব ও অনীলত্ব একত্র জ্ঞানে সমাবেশিত হইতে পারে, তাহাও হইতে পারে না;—কেন না, নীলত্ব অনীলত্ব এরূপ বিরোধ কিরূপে উৎপন্ন হইল।

শিষ্য। এখনও আমার বুঝিতে গোল আছে। আমাদের দেশের একজন পণ্ডিত * লিখিয়াছেন, "পরস্পর কিয়দংশ সদৃশ ও কিয়দংশে বিসদৃশরূপে প্রতীত জ্ঞানসমূহের যে সমষ্টি তাহার নাম অথবা অভিধান অথবা সংজ্ঞাই আত্মা অথবা আমি।" ইহার উত্তর কি?

গুরু। বল দেখি, ঐ জ্ঞানসমূহ কি? ইহারা কিরূপেই বা উৎপন্ন হইল?

শিষ্য। এ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য্য।

গুরু। স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানসমূহ যে আত্মা নহে, পূর্ব্বেই আমি তাহা তোমাকে বলিয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, জগৎ কিরূপে বিজ্ঞান-জগতে পরিণত হইল, Physical Phenomena কিরূপে Psychical Phenomena হইয়া পড়িল; অতএব তাহা হইতেই পারে না।

শিষ্য। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন,—রূপ কর্ত্তৃক চাক্ষুষ স্নায়ু অভিহিত হইলে, তন্মধ্যস্থিত স্বচ্ছ তরল পদার্থের কম্পন হয়, এবং তন্মধ্যে এক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্ককেন্দ্র বা মস্তকের স্নায়ুকে আঘাত করতঃ দর্শন জ্ঞান উৎপন্ন করে। শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদন, স্পর্শন আদি জ্ঞানেরও এইরূপে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রমে নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান (Sensation) হইতে বেদনা (Perception) সংস্কার (Imagination) সবিকল্পক জ্ঞান (Conception) পক্কতা জ্ঞান (Judgment) ও যুক্তি অনুমানাদি

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, লিখিত ১৩০১ সালের "সাহিত্য" মাসিক পত্রে "একটী পুরাতন বিষয়" শীর্ষক প্রবন্ধ।

(Reasoning) জটিলতর জ্ঞানের উদ্ভব হয়, এরূপ হইলে আপনার আপত্তি খণ্ডন হইতে পারে না কি ?

গুরু। তোমার কথিত এই তত্ত্ব এক্ষণে প্রামাণ্য বলিয়া আর প্রচলিত নাই। কেন না, স্নায়বিক উত্তেজনা (Nervous stimulation) কিরূপে নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে (Sensation) পরিণত হইল, এ জটিলতার ভঞ্জন-পদ্ধতি এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দ্বারা আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত হয় নাই। একজন বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক পণ্ডিত (James Sully) লিখিয়াছেন,—

"This doctrine is known as that of human automatism the doctrine that we are essentially nervous machines with a useless appendage of consciousness somehow added. The doctrine obviously fails to explain why consciousness should appear on the scene at all."

যদি জ্ঞানসমূহকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ভেদজ্ঞান, সাদৃশ্যজ্ঞান, উদ্বোধক ও ধারণা ইত্যাদি যত ইচ্ছা ধরিয়া লওয়া হউক, তাহাতে জটিলতার কোন প্রকার সমাধানই হইতে পারে না। তুমি যে সকল জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিতে চাহিতেছ, তাহারা কি একাকার নহে ? তাহাদের কি কোন বিভেদ আছে ? যদি একাকার জ্ঞান হয় ; তাহা হইলে সাদৃশ্যজ্ঞান, ভেদজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের বিভেদ কিরূপে উৎপন্ন হইল ? যদি জ্ঞানগুলি পরস্পর বিভিন্ন হয়, তবে বিভেদ সম্বন্ধ নামক অতিরিক্ত জ্ঞান স্বীকারের কি প্রয়োজন হয় ? বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হইল, বলিলেই ত বুঝা যায় যে, আমি জানি ইহা হইতে ইহা পৃথক্, তবে আর অতিরিক্ত বিভেদ সম্বন্ধের কল্পনার প্রয়োজন কি ?

আরও এক কথা,—তুমি যে জ্ঞান-সমষ্টির কথা বলিয়াছ, সে সমষ্টি কিরূপে উৎপন্ন হইল ? অবশ্যই জ্ঞানের দৈশিক ব্যাপকতা (Exten-

sion in space) স্বীকার কর না, তবে কালিক সম্বন্ধে (Relation in time) মানিতে হইবে। তুমি যখন জ্ঞানাতিরিক্ত কোন জ্ঞাতা আছে বলিয়া স্বীকার করিতেছ না, তখন সেই জ্ঞানসমূহের সমষ্টি কোথায় হইল? আর জ্ঞানের সমষ্টি বলিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের স্মরণ ও বর্ত্তমান জ্ঞান এই দুইয়েরই সমষ্টি বুঝা যায় ;—কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের স্মরণ কে করিল? আর জ্ঞানসমূহ কাহার নিকটই বা সদৃশ এবং কাহার নিকটই বা বিসদৃশ রূপে প্রতীত হইল? কেন না, তুমি বলিয়াছ, জ্ঞানের প্রত্যেতা (জ্ঞাতা) নাই, অথচ জ্ঞান প্রতীত হইতেছে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রিয়া মাত্রেরই কর্ত্তা আছে—ক্রিয়ার কারকই কর্ত্তা, সুতরাং অনুমান প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের জ্ঞাতা নিরূপিত হইবে।

শিষ্য। কিন্তু জ্ঞানাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা আছে কি না, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ না করিয়া, ক্রিয়া মাত্রের কর্ত্তা আছে, এরূপ ব্যাপিনী প্রতিজ্ঞা (Universal proposition) কিরূপে ধরিয়া লওয়া যায়?

গুরু। কেন? মানবের অনুভবে অর্থাৎ জ্ঞানে যত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্ত্তা আছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কেহ কখনও ইহার ব্যভিচার দেখেন নাই। অতএব এই ব্যাপিনী প্রতিজ্ঞা লইয়া বর্ত্তমান অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার অনুমান করিতে হইবে—যদি সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ঘটনা দেখিয়া একটী ব্যাপিনী প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে হইত, তাহা হইলে যুক্তির অধিরোহণ (Induction) ও অবরোহণ (Deduction) প্রণালী অসম্ভব হইয়া পড়িত।

শিষ্য। এ প্রতিজ্ঞাতেও সন্দেহ করিবারও কারণ আছে।

গুরু। এ প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ করিতে পার না। বুঝিয়া দেখ যে মানবের নিশ্চিত জ্ঞানে যত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মনুষ্যত্ব ও

মরণ-ধর্ম্মবত্বের সামানাধিকরণ্য ছিল। এই ঐকাধিকরণ্য দেখিয়া বিশ্বের সমস্ত মনুষ্যকে পরীক্ষা না করিয়াই মানবমাত্রেরই মরণ ধর্ম্মবান্ প্রতিজ্ঞা স্থাপন করা যায়।

জ্ঞানসমষ্টি আত্মা নহে, জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞাতা আছে, ইহা কেবল যে হিন্দু দর্শনেরই মত, তাহা নহে। পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণও তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেন। মহামতি জন্ ষ্টুয়ার্টমিলও উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অতএব জ্ঞানেরও জ্ঞাতা আছেন এবং সেই জ্ঞাতা জীবাত্মা, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দেহের স্বরূপ-তত্ত্ব।

শিষ্য। হিন্দুশাস্ত্রেতে দেহের স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন।

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর। শাস্ত্রমতে,—নির্ম্মল, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ,

* If therefore we speak of mind as a series of feelings we are obliged to complete the statement by calling it a series of feelings which is aware of itself as past and future and we are reduced to the attention of believing that the mind or ego is something different from any series of feelings of possibilities of them or of accepting the paradox that something which exhypothesi is but a series of feelings can be aware of itself is a series.

অসঙ্গ, নিরহঙ্কার, শুদ্ধ, নিত্য ও অজ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম অবিদ্যাসংযোগে জগতের কর্তৃত্বভাগী হইয়া থাকেন। তাঁহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী অনির্ব্বচনীয়া পরিণামিনী মহাবিদ্যা শক্তি আছে। সত্ত্ব গুণ শুক্লবর্ণ,—সুখের ও জ্ঞানের কারণ; রজোগুণ দুঃখাস্পদ,—রক্তবর্ণ ও চঞ্চলস্বভাব; এবং তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ,—জড় ও সুখাদির অনুৎপাদক। পরব্রহ্ম স্বতঃ অসঙ্গ উদাসীন হইলেও তাঁহার ঐ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তিই তাঁহার সমযোগ বশতঃ নানাবিধ জগদ্রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

মায়োপহিত চৈতন্য হইতেই আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, এবং এই পঞ্চভূত হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের এবং জীবদেহের উৎপত্তি হয়। পিতা মাতার ভুক্ত অন্ন হইতে এই ষট্কোষবিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি হয়,—তন্মধ্যে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই সকল পিতা হইতে উৎপন্ন এবং ত্বক্, মাংস ও রক্ত মাতা হইতে হইয়া থাকে। এই শরীর সম্বন্ধে মাতৃজ, পিতৃজ, রসজ, আত্মজ; সত্ত্বসম্ভূত এবং স্বাত্মজ এই ষড়বিধ ভাব আছে।* তন্মধ্যে শোণিত, মেদ, মজ্জা, প্লীহা, যকৃৎ, গুহ্যদেশ, হৃদয়, নাভি এই সমুদয় মৃদুপদার্থরাশি মাতৃজভাব; শ্মশ্রু, রোম, কেশ, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, নখ, দন্ত, শুক্র ইহারা পিতৃজভাব। শরীরোপচিতি অর্থাৎ উৎপত্তিকালে শরীরের স্থূলতা, বর্ণ, ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি, অবয়বের দৃঢ়তা, অকার্পণ্য উৎসাহ, তৃপ্তি, বল ইহারা রসজ, অর্থাৎ সপ্তধাতুর অন্যতম ধাতুজভাব,—

---

* পিতৃভ্যামশিতাদন্নাৎ ষট্কোষং জায়তে বপুঃ।
স্নায়বোঽস্থীনি মজ্জা চ জায়ন্তে পিতৃতস্তথা॥
ত্বঙ্ মাংস-শোণিতানীতি মাতৃতশ্চ ভবন্তি হি।
ভাবাঃ স্যুঃ ষড়্ বিধাস্তস্য মাতৃজাঃ পিতৃজাস্তথা।
রজসা আত্মজাঃ সত্ত্বসম্ভূতাঃ স্বাত্মজাস্তথা॥

এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, প্রযত্ন, জ্ঞান. আয়ু এবং ইন্দ্রিয় ইহারা আত্মজ অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মজ ভাব।

ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ,—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ. নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়। বাক্, পাণি, পাদ. পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ এবং রমণ ক্রমে এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের স্বরূপ অন্তরিন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটিকে অন্তঃকরণ বলে। তন্মধ্যে সুখ ও দুঃখ মনের বিষয়, এবং স্মৃতি, ভয় ও বিকল্পাদি মনের ক্রিয়া;—এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি, অহং মম ইত্যাকার বৃত্তিকে অহঙ্কার এবং অতীত বিষয়ের স্মরণাত্মক বৃত্তিকে চিত্ত বলিয়া জানিবে। এই সত্ত্ব নামক অন্তঃকরণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে তিন প্রকার, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বজভাবও তিন প্রকার। তন্মধ্যে আস্তিক্য মনোনৈর্ম্মল্য ও মুখ্যরূপে ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি ইত্যাদি সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহারা রাজস-সত্ত্বজ ভাব। নিদ্রা, আলস্য, অনবধানতা ও বঞ্চনা প্রভৃতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন,—ইহারা তামস-সত্ত্বজ ভাব। এই দেহ মাত্রাত্মক, অর্থাৎ এই দেহ ইহার উপাদান পঞ্চভূত তাদাত্ম্যেই উৎপন্ন, সুতরাং উপাদানীভূত প্রত্যেক ভূতের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। * যথা;—এই স্থূল দেহ আকাশ হইতে শব্দ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বক্তৃত্ব, কর্ম্ম-কুশলতা, লঘুত্ব, ধৈর্য্য এবং বল এই সপ্ত গুণ গ্রহণ করে। বায়ু হইতে স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, গমন, প্রসারণ ও কর্কশতা এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর,

* দেহো মাত্রাত্মকস্তস্মাদাদত্তে তদ্গুণানিমান্

দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ প্রকার বায়ু-বিকার ও লঘুতা এই একোনবিংশতি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই দশবিধ বায়ুর মধ্যে প্রাণই মুখ্যতম। এই প্রাণবায়ু কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে এবং নাসিকারন্ধ্র, নাভি ও হৃদয়দেশে বিচরণ করিয়া থাকে। এই প্রাণবায়ুই শব্দোচ্চারণ, নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের কারণ। অপান বায়ু গুহ্য, মেঢ্র, কটি, জঙ্ঘা, উদর, কণ্ঠ, ঊরু এবং জানুদেশে অবস্থিত আছে, ইহা দ্বারা মূত্র-মলাদির পরিত্যাগক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্যান বায়ু চক্ষু, কর্ণ, গুল্‌ফ, জিহ্বা এবং নাসিকাদেশে অবস্থিত, ইহা দ্বারা প্রাণায়াম বিষয়ে কুম্ভক, রেচক ও পূরক ইত্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে। সমান বায়ু শরীর-বহ্নির সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, এবং দ্বিসপ্ততি সহস্র শরীরস্থ নাড়ীর অভ্যন্তরে বিচরণ করে,—এই বায়ু ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের রস সকল আনয়ন করতঃ দেহের পুষ্টিসাধন করে। উদান-বায়ু পাদ, হস্ত এবং অঙ্গ সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া দেহের উন্নয়ন ও উৎক্রমণাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত নাগাদি পঞ্চ উপবায়ু ত্বক্, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা এবং স্নায়ু প্রভৃতি ধাতু আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। এই পঞ্চবায়ুর মধ্যে নাগ বায়ুর উদ্গার ও হিক্কাদি; কূর্ম্মের নিমেষ, উন্মেষ ও কটাক্ষাদি; কৃকরের ক্ষুধা, পিপাসা; দেবদত্তের আলস্য, নিদ্রা ও জৃম্ভণাদি এবং ধনঞ্জয়ের শোক ও হাস্যাদিরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, পাঞ্চভৌতিক দেহ,—এক্ষণে আমাকে বুঝাইয়া দিন, দেহ কোন্ ভূত হইতে কোন্ গুণ গ্রহণ করে?

গুরু। দেহ তেজোদ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্যামিকাদিরূপ, শুক্লরূপ, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক শক্তি, স্ফূর্ত্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা, কৃশতা, ওজঃ সন্তাপ, পরাক্রম এই সমগ্র গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জল হইতে ধারণাশক্তি,

রসনেন্দ্রিয় ষড়্‌বিধ রস, শৈত্য, স্নেহ, দ্রব, ঘর্ম্ম এবং শরীরের মৃদুতা গ্রহণ করে; পৃথিবী হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধ, স্থিরতা, ধৈর্য্য, গুরুত্ব, ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্রধাতু উৎপন্ন হয়। প্রাণিমাত্রেরই ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নি দ্বারা তিনভাগে পরিণত হয়—তন্মধ্যে স্থূলভাগ মল, মধ্যভাগ মাংস এবং শেষভাগ মনরূপে পরিণত হয়, তাই মনকে শ্রুতিতে অন্নময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * জলের স্থূলভাগে মূত্র, মধ্যভাগে রুধির এবং শেষভাগ প্রাণরূপে পরিণত হয়, তাহাতেই প্রাণকে জলময় বলে। † তেজ অর্থাৎ ঘৃতাদির স্থূলভাগ অস্থি ‡ মধ্যভাগ মজ্জা এবং শেষভাগ বাগিন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়, তাহাতেই বাগিন্দ্রিয়কে তেজোময় বলিয়া থাকে। রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মাংস হইতে নাড়ী এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটীও ধাতু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

---

* অন্নং পুংসাশিতং ত্রেধা জায়তে জঠরাগ্নিনা।
মলং স্থবিষ্ঠো ভাগঃ স্যান্মধ্যমো মাংসতাং ব্রজেৎ।
মনঃ কনিষ্ঠো ভাগঃ স্যাত্তস্মাদন্নময়ং মনঃ॥

† অপাং স্থবিষ্ঠো মূত্রং স্যান্মধ্যমো রুধিরং ভবেৎ।
কনিষ্ঠভাগঃ প্রাণঃ স্যাত্তস্মাৎ প্রাণো জলাত্মকঃ॥

‡ তেজসোঽস্থি স্থবিষ্ঠঃ স্যান্মজ্জা মধ্যসমুদ্ভবঃ।
কনিষ্ঠা বাঙ্মতা তস্মাত্তেজোঽবন্নাত্মকং জগৎ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

জীবাত্মা ও স্থূলদেহ।

শিষ্য। এক্ষণে আমার উত্তমরূপেই ধারণা হইয়াছে যে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রভৃতি হইতে জীবদেহে পৃথক্ কোন পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থের নাম জীবাত্মা। দয়া করিয়া বলুন, সেই জীবাত্মা কি প্রকার এবং স্থূলদেহ ও গুণাদির সত্তা কি?

গুরু। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এবং প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত হয়। এই লিঙ্গশরীরাভিমানী অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই ব্যবহারিক জীব ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ নামে কথিত হইয়া থাকে। এই জীবই প্রবাহরূপে অনাদি পুণ্য-পাপ-জনিত অদৃষ্টের ফল ভোগ করে। এই লিঙ্গশরীরকে নিমিত্ত করিয়া ইহলোক পরলোক গমন ও জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে।

এই দেহ তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম ভৌতিক আবরণকে স্থূলদেহ বা শরীর কহে। দ্বিতীয় সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তিপূর্ণ মনোময় অবস্থা। তৃতীয় দেহের নাম কারণ, তথায় কেবল বুদ্ধ্যাদি চৈতন্য ও কর্ত্তব্য-শক্তির সহিত জীবাত্মা বাস করেন। এই জীব বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার অংশবিশেষ, তাঁহার ভোগ বা ক্ষয় কিম্বা লয় কিছুই নাই। তাঁহার যে তেজ সূক্ষ্মদেহের উপর আধিপত্য করে, সেই মনোময় কর্ত্তার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা; এই সত্তা হইতে লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহ চালিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে সকল শক্তি সমষ্টি দ্বারা স্থূলদেহ রক্ষিত ও চালিত হয়, সেই শক্তিকে স্থূলের

আত্মা ও ভূতাত্মা কহে,—সাংখ্যমতে ইহাই প্রকৃতি। * এখন দেখিতে হইবে, প্রধান চেতয়িতা জীব,—তিনি সাক্ষীমাত্র; প্রত্যেক দেহ-প্রকাশের সহিত তাঁহার প্রকাশ, দেহক্ষয়ে অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল আবরণক্ষয়ে তাঁহার ক্ষয় হয় না। তিনি কারণরূপে সচল-স্বাধীন শক্তির সহিত বর্ত্তমান থাকেন। কার্য্যের প্রেরক ও ভোগকারী ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা অর্থাৎ মনোময় ভাগের তিনি চৈতন্য সত্তা। স্থূল শরীরের কর্ত্তা ভূতাত্মা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তিগণ ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ-তেজে সচেতন হইয়া শরীররূপী ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া, সেই ক্ষেত্রজ্ঞকেই ভোগ করায়। ক্ষেত্রজ্ঞই গুণানুসারে দেহের গঠন মতে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই স্থূল সূক্ষ্মের অধিকারী ক্ষেত্রজ্ঞ উপাদানরূপী মহত্তত্ত্বের ওঁকাররূপী জীব-ভাবীয় পরমাত্মার আশ্রয়ে প্রতি প্রাণীর পুরীতে চেতয়িতা ও ভোগকর্ত্তা ভাবে থাকেন। মন, ইন্দ্রিয়শক্তি ও ভূতশক্তিই এই ক্ষেত্রজ্ঞকে ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। মনাদি যদি কুভাবে উন্নত হয়, তবে তিনি কু-ভোগ করেন, মনাদি যদি পুণ্য কার্য্য করে, তবে তিনি পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন। যেমন আবরণ দ্বারা সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোককে হ্রাস-বীর্য্য করিয়া অন্ধকার করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মনাদিকে কুভাব করিলে ক্ষেত্রজ্ঞও অজ্ঞানাবরণে আবৃত হইয়া পরমাত্মার-সান্নিধ্য-তেজ হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়েন। আবার যখন মনাদিকে পবিত্র করা যায়, তখনই আবরণ উন্মুক্ত হইলে পরমাত্মার তেজ ক্ষেত্রজ্ঞের তেজে মিলিত হইতে পারে। এই পরমাত্ম-ভাবের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সমভাব ঘটাইতে যে সকাম অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই পুণ্য; এবং তজ্জন্য যে নিষ্কাম অনুষ্ঠান, তাহাই মুক্তির উপায়;—আর পরমাত্মা হইতে ভোগাবরণে কুভাবে

* মৎপ্রণীত "দেবতা ও আরাধনা" নামক পুস্তকে এ প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধীয় কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তাঁহাকে আবৃত করা যায়, তাহাই পাপ, অজ্ঞান বা অধর্ম্ম। পাপাচরণ করিলে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্ম-ভাব হইতে আবৃত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় যে যাতনা ভোগ হয়, তাহাকেই পাপ-যাতনা বা নরক-যাতনা বলে। যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফাদি সাধারণ ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য হইলে দেহের ধাতুগত যাতনা হয়, তদ্রূপ মানবের স্বাভাবিক সত্ত্বগুণের বিপক্ষে অর্থাৎ পরমাত্ম-ভাবের প্রতিকূলে কোন অনুষ্ঠান করিলে লিঙ্গদেহে ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে ; ঐ যাতনা কি ইহলোকে কি পরলোকে—অর্থাৎ স্থূলদেহের স্থিতিকাল বা স্থূলের বিনাশ হইলেও ঐ যাতনা ভোগ হইয়া থাকে।

শিষ্য। পূর্ব্বে যদি কেহ পাপ করিয়া থাকে এবং তৎপরে যদি জ্ঞান লাভ করতঃ সৎপথে যাইবার চেষ্টা করে ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও কি তাহার নরকযন্ত্রণা হইবে ?

গুরু। তাহা কেন হইতে যাইবে ? তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে,—জীবের দেহ, বাক্য ও বুদ্ধিজাত পাপ ক্রমে নাশ হইয়া থাকে।

শিষ্য। পাপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কুসংস্কারের অভ্যাস বশতঃ সাধিত হইয়া থাকে কি না,—এবং তাহা যদি হয়, তবে কি প্রকারে তাহার ধ্বংস হইতে পারে ?

গুরু। বর্ত্তমানে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে ; * তবে স্থূল কথা তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অভ্যাস দ্বারা জীব পাতকের

* কিরূপে জীব কুসংস্কার নষ্ট করিয়া সৎপথে যাইতে পারে, তাহা এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে, সে সকল যোগের কথা, সুতরাং এস্থলে উল্লেখ ও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মৎপ্রণীত "যোগতত্ত্ববারিধি" নামক পুস্তকে তাহা লিখিত হইয়াছে।

অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে দশ প্রকার কুভাবের আবেশে মনের, কায়ের ও বাক্যের যে ব্যভিচার ও কদাচার উপস্থিত হয়, তাহাই পাপ বা অধর্ম্ম বলিয়া কথিত। ঐ দশ প্রকার কুভাবের মধ্যে মন তিনটী কার্য্য করে;—(১) পরদ্রব্য হরণেচ্ছা ও পরের অনিষ্টচিন্তা; (২) পরলোক নাই, বিষয়ভোগই সর্ব্বস্ব; (৩) ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও দেহাভিমান। বাক্য দ্বারা চতুর্ব্বিধ পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে;—(১) পরের যাহাতে কষ্ট হয়, এমন ভাবে অপ্রিয় ভাষণ; (২) অসত্য কথন; (৩) পরোক্ষে পরদোষ কীর্ত্তন; (৪) প্রয়োজন ব্যতীত কুৎসাকরণ। দৈহিক পাতক ত্রিবিধ প্রকারে সাধিত হয়;—(১) বঞ্চনা বা বলপ্রকাশে পরস্বাপহরণ; (২) অবৈধ প্রাণিহিংসা; (৩) পরদারাদি গমন। এই দশবিধ মৌলিক কুভাব হইতে অগণ্য কুকর্ম্ম জীব-হৃদয়ে বিচরণ করে।

শিষ্য। আমার পূর্ব্ব প্রশ্নের এখনও উত্তর পাই নাই।

গুরু। কোন্ প্রশ্ন?

শিষ্য। পূর্ব্বকৃত পাতকের ধ্বংস হইতে পারে কি না?

গুরু। নিশ্চয়ই পারে,—ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান উপস্থিত হইলে—সূর্য্য যেমন কুজ্ঝটিকাকে নিজ তেজে নিবারণ করেন, তদ্রূপ তদীয় কৃপাতে পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। সে সকল কথা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। * এক্ষণে তোমাকে জগাই মাধাইয়ের কথা, রত্নাকর দস্যুর কথা ও বিল্বমঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়া দিতেছি। তাঁহারা কি অশেষবিধ পাপ করিয়া শেষে ভগবৎকৃপায় পুণ্যের অতীত উচ্চস্তরে উত্থিত হয়েন নাই? জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবানের সতত চেষ্টা,—তিনি অবিরাম আমাদিগের উন্নতির পথে, উদ্ধারের পথে, সুখের পথে লইবার জন্য টানিতেছেন, কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব আমরা—আমরা সততই অনিত্য

---

* অন্য পুস্তকে।

বিষয়রসে ডুবিয়া মরিতেছি। লৌহখণ্ডকে চুম্বক আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যস্থলে একখানা ইষ্টক ফেলিয়া রাখিলে যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমরাও তাঁহার আকর্ষণের মধ্যে মায়া-বাঁধকে রাখিয়া তাঁহার করুণাকর্ষণ হইতে দূরে রহিয়াছি। ভগবানের কৃপায় যে, কিরূপে জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তাহার একটি উপাখ্যান তোমাকে শুনাইতেছি।

শিষ্য। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, তিনি যদি জীবকে টানিতেই থাকেন, তবে জীবের কি সাধ্য যে তাঁহার দিকে না গিয়া থাকিতে পারে?

গুরু। তিনি মহৎ আদি অণু পর্য্যন্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলেরই শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখেন, কখনই ব্যভিচার করেন না। তাই গীতায় বলিয়াছেন,—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
> যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
> উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
> সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥—গীতা, ৩ অঃ;

অর্থাৎ, হে পার্থ! ত্রিলোকের মধ্যে আমার কিছুরই অভাব নাই। সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। হে পার্থ! যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে সমুদয় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে। অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে, এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণেরও মলিনতার হেতু হইবে।

অতএব ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, তিনি জগতের সমস্ত

পদার্থের স্রষ্টা হইলেও সৃষ্ট পদার্থের শক্তিদ্বারাই কার্য্য হইতে দেন, কখনই ঐশীশক্তিদ্বারা কার্য্য হয় না। জীবকে তিনি ডাকিয়া থাকেন, তবে যাওয়া না যাওয়া সে জীবের পুরুষকার। একদা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সখে! তুমি জীবের উপরে অত্যন্ত করুণাপরায়ণ, তবে কেন জীবকে কুপথ হইতে সুপথে ডাকিয়া লও না? জীব যে আত্মকৃত কুকর্ম্মবশে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও আপন ভোলা! ভোলানাথহৃদ্‌বিহারি! জীবকে করুণা করিয়া ডাকিয়া লও। শ্রীকৃষ্ণ একটু হাস্য করিলেন, কিন্তু সে কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদ-সান্নিধ্যে একটা বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় গিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, একটি বৃক্ষে একখানা মধু-চক্র হইয়াছে এবং তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু মধুক্ষরণ হইতেছে—আর এক ব্যক্তি সেই চক্রতলে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া সেই এক বিন্দুর পর আর এক বিন্দু পান করিতেছে। কিন্তু তাহার অনতিদূরে এক ভীষণ সর্প তাহার বিস্তৃত বদন ব্যাদান করিয়া উহাকে গিলিতে আসিতেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সখে! দেখ, দেখ,—ঐ মধুবিন্দুপানাশয়োন্মত্ত ব্যক্তিকে সর্প ভক্ষণ করিতে আসিতেছে, শীঘ্র উহাকে ডাক। কোমলহৃদয় যুধিষ্ঠির অতি ব্যাকুলিত চিত্তে ও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, ওহে ভদ্র! কখন্ এক বিন্দু মধু চক্র হইতে ঝরিয়া পড়িবে, তাহাই পান করিবে বলিয়া মুগ্ধপ্রাণে হাঁ করিয়া আছ,—কালসর্প যে সমাগত; ঐ দেখ, চাহিয়া দেখ,—শীঘ্র পলাইয়া আইস! আর সময় নাই—এখনই তোমাকে গ্রাস করিবে। মধুবিন্দু পানাশয়ে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি সে কথার উত্তরই প্রদান করিল না। তখন যুধিষ্ঠির পুনরায় অতীব ব্যস্তভাবে ডাকিয়া বলিলেন, ওহে! তুমি কি বধির? সাপে যে তোমাকে গ্রাস করিল। সে তখন সে দিকে না চাহিয়া বলিল,

শুনিয়াছি মহাশয়! একটু অপেক্ষা করুন—আর এক ফোঁটা খাইয়া আসি। কিন্তু আর খাইতে হইল না, ভীষণ অজগর তাহার অনন্ত-বিস্তারী করাল বদনে হতভাগ্যকে গ্রাস করিয়া লইল। যুধিষ্ঠির এই ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকান্বিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্য সহকারে পার্শ্বস্থিত বিমর্ষ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, সখে! উহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই, ঐ আর এক ফোঁটা মধুর লোভে মরজগতের জীব-মাত্রেই ব্যাকুল। পার্শ্বে কালরূপ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমি আমার বিবেক-বাঁশীর মোহন সুরে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছি, কিন্তু ঐ "আর এক ফোঁটা মধুর" লোভে জীব কালসর্পের উদরস্থ হইতেছে।

শিষ্য। আপনিই পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ভগবানের কৃপা ভিন্ন উদ্ধারের উপায় নাই, আবার বলিতেছেন, তিনি জীবকে আহ্বান-আকর্ষণ করিয়াও নিকটে আনিতে পারেন না।

গুরু। জীবের একটা পুরুষকার আছে, স্বীকার কর?

শিষ্য। হাঁ, স্বীকার করি,—কিন্তু বুঝিতে পারি না। কোথাও বা পুরুষকারেরই কথা পাই—কোথাও বা অদৃষ্টেরই একমাত্র অধিকার দেখি।

গুরু। অদৃষ্ট আর পুরুষকার বড়ই ওতঃপ্রোত গাঁথাগাঁথি। অদৃষ্ট ও পুরুষকারে বড় সখিত্ব সম্বন্ধ। মনে কর, পুরুষকারের বলে জীব জমীতে ধান্যোৎপাদন করিতে পারে। মানব কর্ষণ করিল, বীজ ছিটাইল এবং যথাবিধি পাইট করিল,—কিন্তু ধান্য হইল না, কেন না অদৃষ্ট-শক্তি যথাসময়ে বর্ষণাদি না করায়, ধান্য হইতে পারে নাই। আবার কেবল অদৃষ্ট-শক্তি অনবরত বর্ষণ ও তাপদানেও কিছু করিতে পারে না, মানুষ যদি পাইট করিয়া জমীতে বীজাদি বপন না করে। সমুদ্রোপকূলের ক্ষুদ্র

ওষধি কপিকে মানুষ পুরুষকার বলে সুখাদ্যে পরিণত করিয়া লইয়াছে ;—পুরুষকার ও অদৃষ্ট দুইয়ে মিলিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। পুরুষকার ও অদৃষ্ট দুইটির বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—কাজেই সহজে বিশ্লেষণ হয় না। সেই অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়ে একত্র হইলে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়. চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে বিষয়বিরাগ জন্মিয়া ভগবদ্ভক্তি জন্মে,—এবং তাহা হইলে তাঁহার কৃপা হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে তুমি জীব কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি না,—তাহাই বল ?

শিষ্য। আমি সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। এক্ষণে জীবের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তাহাই বলুন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

প্রকৃতি ও পুরুষ।

গুরু। অনাদি, অনন্ত, পরমানন্দ এবং অব্যক্ত পরব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টির বাসনা হইলে, সেই বাসনা হইতে পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টি হয়।

শিষ্য। যিনি অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত—তাঁহার বাসনা কি প্রকার ? বাসনা ত গুণ,—গুণ থাকিলে কাজেই ব্যক্ত ও সগুণ।

গুরু। না, তাহা হইতে পারে না। কেন না তিনিই মূল ও চিদ্‌ঘন ; তাঁহার কি শক্তি, কোন্ ভাব—তাহা তুমি আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাদপি কীট, আমরা কি বুঝিব বল ? তোমার মনে রাখা উচিত, আমরা কাহার বিষয় আলোচনা করিতেছি। যিনি শ্রুতিতে "অবাঙ্মনসগোচরঃ" অর্থাৎ

বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার মায়ায় ত্রিজগৎ মুগ্ধ, সেই নিরঞ্জন পদার্থকে আমরা নাম ও রূপে পরিণত করিয়া বাক্য-মনের গোচর করিতে চেষ্টা করিতেছি। যাহা হইতে পারে না, তাহারই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। তবে ঋষিগণ শিষ্য বোধের জন্য তাঁহার যেরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ বলিতেছি। যে কোন বিষয় বুঝাইতে বা বুঝিতে হইলেই তাঁহাকে বিষয়ে ও বাক্যে আনিতে হয়, নতুবা প্রকাশ করা যায় না। মনে কর, ভৈরব-রাগের রূপ ও ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে—বস্তুতঃ সেই স্বরের কি রূপ আছে? তাহাকে স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য, শিষ্যকে তাহার ভাব অনুভব করাইবার জন্যই ঐরূপ করা হইয়াছে।

শিষ্য। হাঁ, বুঝিলাম।

গুরু। সেই অবাঙ্মনসগোচর পরব্রহ্ম হইতে পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহা-ভূতের আবির্ভাব হয়। আর প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত, প্রথম পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রে বিলীন হয়, পরে পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন হয় এবং অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়।

শিষ্য। আমাকে একে একে বুঝিতে দিন। প্রকৃতি কিরূপ?

গুরু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্॥

অর্থাৎ প্রকৃতি একা, অজ (জন্ম রহিত), লোহিত-শুক্ল কৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী), তুল্য জাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ ॥—গীতা ১৩।২০

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে; সমস্ত বিকার ও গুণ প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত জানিবে। এই প্রকৃতি সমস্ত ভূতের সার সূক্ষ্ম পরিণাম বা জননীমাত্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বলেন, এই প্রকৃতি বা Matter এর উৎপত্তি হয় না, বিনাশ হয় না,—কেবল অবস্থান্তর হয় মাত্র।*

শিষ্য। প্রকৃতিকে "অজা" বলিলেন, কি প্রকারে? প্রকৃতি ত পরব্রহ্মের বাসনা হইতে সমুৎপন্না?

গুরু। অজা বলিবার কারণ এই যে, পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিতে উদ্ভূতা এই মাত্র—যেমন ফুলের গন্ধ। গন্ধ ফুল হইতে জন্মে না, ফুলের প্রাকৃতিক ধর্ম্মেই গন্ধ আছে। তৎপরে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র; প্রকৃতির আদি অন্ত নাই। কারণ প্রকৃতি নিত্য সদ্‌বস্তু। সতের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই।

নাসদুৎপদ্যতে ন চ সদ্ বিনশ্যতি। সাঙ্খ্যকারীকা।

অসতের উৎপত্তি নাই সতেরও বিনাশ নাই।

গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিয়াছেন,—

নাশতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।—গীতা।

অসতের ভাব হয় না, সতের অভাব হয় না।

শিষ্য। প্রকৃতি কি? আর একবার ভাল করিয়া বলুন।

গুরু। জড়জগতের যে অপরিচ্ছন্ন, নির্ব্বিশেষ, মূলউপাদান,

* Herbert Spencer's First Principles. The indestructibility of matter.

তাহাকেই প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে Eternal homogenius matter বলা যাইতে পারে। প্রকৃতির আর একটী নাম অব্যক্ত; তাহার কারণ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যক্ত (Unmanifest) অবস্থায় থাকে। অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥—গীতা।

অর্থাৎ প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়।

শিষ্য। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে সত্তরটী মূল ভূত (Elements) সংযোগে ও সংহননে জড়জগৎ বিরচিত। কিন্তু আপনি বলিতেছেন, একটা মাত্র মূলতত্ত্বের বিকাশ। কথাটার কি সামঞ্জস্য নাই?

গুরু। হাঁ, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান বহুদিন অবধি সত্তরটি মূল ভূতের পরমাণুকে পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের চিরদিনই একটা আশা-কল্পনা ছিল যে, এই সমস্ত মূল ভূত এক অদ্বিতীয় উপাদানের এক চরম ভূতের পরিণাম মাত্র। মনীষী সার উইলিয়ম ক্রুক্স (Sir William Crookes) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মূলভূতসমূহের পরমাণু, বস্তুতঃ স্বতন্ত্র বা নিত্য নহে। তাহারা এক চরমভূতের বিশেষ বিশেষ সঙ্ঘাতজনিত বিকার মাত্র। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন প্রোটাইল (Protile), ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন্ (Lord Kelvin বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি নিকোলা টেস্‌লা (Nikola Tesla) প্রভৃতি মনীষীগণ এই মতকে সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এখন বোধ হয়, প্রকৃতি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ?

শিষ্য। হাঁ,—এই বুঝিয়াছি যে, সমস্ত মহাভূতের যে অতি সূক্ষ্মাংশ,

অর্থাৎ যে মূল পদার্থ হইতে মহদাদি অণু পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি

গুরু। হাঁ,—তাহাই বটে; তবে আরও একটু কথা আছে। প্রকৃতিতে চৈতন্য অন্বিত না হইলে প্রকৃতির কোন প্রকার কার্য্য হয় না। প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নিগুর্ণ (গুণাতীত); প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি বিষয় (Object), পুরুষ বিষয়ী (Subject), প্রকৃতি কর্তৃক আবৃত হইয়া তবে চৈতন্য ক্রিয়াশীল হয়েন, আবার চৈতন্যে অন্বিত হইয়া তবে প্রকৃতি প্রকাশ হয়েন।

সাঙ্খ্য বলেন,—

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥

প্রকৃতি অচেতন সুতরাং অন্ধস্থানীয়; পুরুষ অকর্ত্তা, অতএব পঙ্গুস্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করে। সাঙ্খ্য তাই বলিতেছেন, যেমন অন্ধ দেখিতে পায় না এবং পঙ্গু চলিতে পারে না, উভয়ের সংযোগ হইলে যেমন তাহাদিগের কার্য্য চলিতে পারে অর্থাৎ অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু উঠিলে পঙ্গু পথ দেখায়,—অন্ধ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত হইয়া একের অভাব অন্যে পূরণ করে; তাহাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়।

গীতাও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন,—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। গীতা; ১৩।২২।
পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণ ভোগ করেন।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥ চণ্ডী।

সেই মূল প্রকৃতি মহাশক্তি নিত্যা, তিনি জগন্মূর্ত্তি—এবং তিনি সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ও তিনি প্রসন্না হইলে মনুষ্যদিগকে মুক্তির জন্য বরদান করিয়া থাকেন। তিনি বিদ্যা, সনাতনী ও সকলের ঈশ্বরী এবং মুক্তি ও বন্ধনের হেতুভূতা।

শিষ্য। একই প্রকৃতি বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইলেন কি প্রকারে?

গুরু। ইহা সম্ভব। একই সুন্দরী রমণী যেমন প্রিয়জনের সুখের, সপত্নীর দুঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে,—তেমনি মহাশক্তি বিদ্যাও অবিদ্যা • ও বন্ধনের হেতু হইয়া থাকেন।

এক্ষণে বুঝিয়া লও,—পরব্রহ্মের বাসনা হইতে পুরুষ ও প্রকৃতির উদ্ভব হইয়া, তাহাদের সংযোগে মহদাদ্যণু পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জীব-সৃষ্টি হইতে পারিল না। তখন জীবসৃষ্টির উপায় স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হইল। মূল প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের বিকাশেই এই তিনের সম্ভব।

দশম পরিচ্ছেদ।

—০—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

গুরু। স্মরণ রাখিও—আমি তোমাকে আমাদের এই সৌরজগতের কথাই বলিতেছি,—কেন না, আমাদের জ্ঞান অতি স্থূল,—কাযেই স্থূল-জগতের সূক্ষ্মত্বের আলোচনাই ধারণার অতীত, তদুপরি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মের

আলোচনা অসম্ভব। তবে যাঁহারা এই স্থূলের জগতে থাকিয়া যোগাদি দ্বারা সূক্ষ্মদেহে বিচরণশীল, তাঁহারা সূক্ষ্মালোচনারও অধিকারী এবং ভাবগ্রাহী যোগীজনেরা এই জন্যই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হয়েন।

মূল প্রকৃতি ও চৈতন্য পুরুষের উদ্ভব হইলে, তাহা হইতে পদার্থের সৃষ্টি হইল এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূল হইয়া সপ্তলোকের বিকাশ হইল। আমাদের এই সৌরজগৎ গণনা করিতে হইলে ক্রমে ঐ সপ্তলোকে এই রূপে গণনা করিতে হয়। যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপ ও সত্য। এই সপ্তকে ব্যাহৃতি বলে। ভূঃ—আমাদের এই পৃথিবীকে ভূর্লোক বলে। এই স্থানে আমাদের মত কাম-কামনা বিজড়িত স্থূলদেহিগণ বাস করিয়া থাকেন। ভুবঃ—আমাদের এই পৃথিবীর পরে ভুবর্লোক অবস্থিত। এই স্থানে প্রেতলোক; আমাদের মত জীবসকল স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্মদেহে এই লোকে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে। ইহার পর স্বর্লোক—অর্থাৎ স্বর্গলোক; এখানে পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থাকে। এই ত্রিজগতের সঙ্গেই আমাদের নিকট সম্বন্ধ; ইহা আমাদেরই পরিদৃশ্যমান এই সূর্য্যের প্রকাশস্থান। তৎপরে মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক। সত্যলোক সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মে জীব নিজ কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিলে লীন হয়। কর্ম্মসূত্র থাকিতে স্বর্গলোকের উপরে জীব গমন করিতে সক্ষম হয় না। অদৃষ্টশূন্য হইলে, তবে স্বর্গ-লোকের উপরে যাইতে পারে এবং যাহার যেমন শক্তি সে তত ঊর্দ্ধেই যায়। স্বর্গলোকের উপরে গমন করিলে, জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না; কিন্তু স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়াও জীব স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া তাহার সংস্কার লইয়া, পৃথিবীতে পুনরাগমন করিয়া থাকে।

ইয়োরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও এক্ষণে দৃঢ়তার সহিত এই সপ্তলোক স্বীকার করিতেছেন এবং এই

ভিত্তির উপরে তাঁহার ধর্ম্মকে দাঁড় করাইতেছেন। তাঁহারা এই সপ্ত-লোককে যথাক্রমে ফিজিক্যাল প্লেন, (Physical plane), অষ্ট্রাল প্লেন (Astral plane), মানসিক প্লেন, (Manasic plane), বুদ্ধিক প্লেন, (Buddhic plane), নির্ব্বাণিক প্লেন, (Nirvanic plane), পর-নির্ব্বাণিক প্লেন, (Paranirvanic plane), মহাপরনির্ব্বাণিক প্লেন, (Mahaparanirvanic plane), আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেছেন।

(১ম) ভূঃলোক বা ফিজিক্যাল প্লেন, পৃথিবতত্ব (Earth)
(২য়) ভুবঃলোক বা অষ্ট্রাল প্লেন, আপস্তত্ব (Water)
(৩য়) স্বঃলোক বা মানসিক প্লেন, অগ্নিতত্ব (Fire)
(৪র্থ) মহঃলোক বা বুদ্ধিক প্লেন, বায়ুতত্ব (Air)
(৫ম) জনলোক বা নির্ব্বাণিক প্লেন, আকাশতত্ব (Ether)
(৬ষ্ঠ) তপলোক বা পরনির্ব্বাণিক প্লেন, অনুপাদকতত্ব ;
(৭ম) সত্যলোক বা মহাপরনির্ব্বাণিক প্লেন, আদিতত্ব ॥

ঈশ্বরের উপরে অনুভবের শক্তি না থাকায়, জনলোক পর্য্যন্তই স্থির হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ জীবের জনলোক পর্য্যন্তই যথেষ্ট। নির্ব্বাণের পর আর আশা করা বিড়ম্বনা। তবে তুমি যেন মনে করিও না যে, নির্ব্বাণ অর্থে নিবিয়া যাওয়া বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংমিশ্রণ। সে সকল কথা পরে জানাইব।

এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম তাহাই শ্রবণ কর। অনন্তর উন্নতশীর্ষ পর্ব্বত হইতে সুনীচ তৃণ গাছটি—এমন কি অণু পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইল, সকলই সেই প্রকৃতির বিকাশ, এবং তাহার মধ্যে চৈতন্য আবৃত হইলেন, কিন্তু জীব-সৃষ্টি হইল না। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সৃষ্টি হইল। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার করেন। ব্রহ্মার সত্বগুণে সৃজন,

বিষ্ণুর রজোগুণে পালন ও শিবের তমোগুণে ব্যষ্টি, সমষ্টি ও ধ্বংসকার্য্য হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের গুণে আমাদের এই সৌরজগতে সূক্ষ্ম-জীব, স্থূলে পরিণত ও অবিদ্যাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বাসনা দ্বারা পরি-চালিত ও কর্ম্ম করিতে লাগিল।

আরও একটু পরে একথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। ক্রম-ভঙ্গ ভয়ে এস্থলে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন বোধ করিলাম।

তবে তোমাকে এস্থলে একথাও বলিয়া রাখি যে, সেই নিত্য নিরঞ্জন পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাদির সৃষ্টি হইলেও তিনিই সকল, এ সমুদয়ই তাঁহার বিভূতি। ভাগবতে ব্রহ্মা পরব্রহ্মকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রমাণ এবং আমার পূর্ব্বোক্ত কথার ভিত্তিস্বরূপ। ব্রহ্মা ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে স্তব করিয়া তাঁহার উদ্দেশে বলিতেছেন—

"বিভো! চৈতন্যই আপনার স্বরূপ। তন্নিবন্ধন আপনি নিরন্তর ভেদ-ভ্রম শূন্য। অপর বোধই আপনার বিদ্যাশক্তি। সুতরাং আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আপনি বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণীভূত মায়ার বিলাস দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। হে ঈশ্বর! আমরা আপনাকে নমস্কার করি।

ব্রহ্মন্! আপনি ভুবনস্বরূপ বৃক্ষ। যে প্রকৃতি আপনাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; আপনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিমিত্ত সেই প্রকৃতিকে আমি (ব্রহ্মা), বিষ্ণু ও শিব রূপ ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া তিন স্কন্ধ বিস্তার করতঃ ঐ বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ ও মনু সকল ঐ বৃক্ষের ভূরি ভূরি শাখা প্রশাখা। বিভো! আমরা সেই ভুবনদ্রুমরূপী আপনাকে নমস্কার করি।" *

* শ্রীমদ্ভাগবত;—তৃতীয় স্কন্ধ; ৯ম অঃ। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

প্রলয়কালে জীব ধ্বংস হয় কি না?

শিষ্য। জীব প্রলয়কালে ধ্বংস হয় কি না—যদি প্রলয়কালে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে আর পাপ পুণ্যের প্রয়োজন কি? কেন না—সাগর-বক্ষঃ হইতে যে বুদ্‌বুদ্ উঠিয়াছে, একটু নাচিয়া একটু ক্রীড়া করিয়া সময়ে আপনিই ভাঙ্গিয়া জলে মিশাইয়া যাইবে। আমরাও তদ্রূপ সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছি,—এখন যেমন কার্য্যই করি, যত কষ্টই পাই, প্রলয়ের সময় নিশ্চয়ই জীবত্ব ঘুচাইয়া ব্রহ্মত্বে পরিণত হইব।

গুরু। প্রলয় কাহাকে বলে, জান?

শিষ্য। জগৎ যখন ধ্বংস হইয়া যায়, তখন তাহাকে প্রলয় বলে।

গুরু। না।

শিষ্য। তবে কাহাকে বলে?

গুরু। তোমরা হিন্দু হইয়া হিন্দুর অমৃতমাখা অনন্ত জ্ঞানের আধার শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠ কর না। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশদ-বিস্তার বর্ণনা আছে। ভাগবত হইতে এই বিষয় বলিতেছি—শ্রবণ কর;—

"যাহা কার্য্যের অংশসমূহের চরম অংশ, (যাহার আর অংশ নাই) যাহা অনেক (যাহা কার্য্যাকার্য্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই) এবং যাহা সর্ব্বদা অসংযুক্ত তাহারই নাম পরমাণু। ঐ সকল পরমাণু একত্র মিলিত হইলে উহাদিগের হইতে মনুষ্যদিগের অবয়বীয় জ্ঞান জন্মে। পরমাণু যে কার্য্য-পদার্থের চরম অংশ, ঐ সকল পদার্থ আপন আপন স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর মিলিত ও একীভূত থাকিলেই পরম মহৎ নামে

কথিত হয়। উহাতে বিশেষের বা ভেদের আশঙ্কা নাই। পদার্থ যেরূপ সূক্ষ্ম ও স্থূল, কালও সেইরূপ সূক্ষ্ম, স্থূল ও মধ্যম। কাল ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ এবং উৎপত্তি বিষয়ে দক্ষ, সুতরাং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও পরমাণুর ব্যাপ্তি দ্বারা ব্যক্ত পদার্থের পরিচ্ছেদ করিতেছে।

যে কাল কার্য্যের পরমাণু অবস্থা ভোগ করে, তাহারই নাম পরমাণু। আর যে কাল উহার সাফল্য অবস্থা সম্ভোগ করে, (অর্থাৎ যতক্ষণ সূর্য্য দ্বাদশ রাশি পরিমিত স্থান অতিক্রম করেন) তাহার নাম পরম মহৎ।

পূর্ব্বোক্ত দুই পরমাণুতে এক অণু; এবং তিন অণুতে এক ত্রাসরেণু হয়। ত্রাসরেণু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণ গবাক্ষ দিয়া প্রবিষ্ট হইলে, দেখিতে পাওয়া যায়, ত্রাসরেণু সকল তন্মধ্যে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়াছে। যে কাল তিন ত্রাসরেণু ভোগ করে, (অর্থাৎ যতক্ষণে সূর্য্য তিন ত্রাসরেণু পরিমিত স্থান অতিক্রম করেন) তাহার নাম ত্রুটি। একশত ত্রুটিতে এক বেধ হয়। ঐরূপ তিন বেধে এক লব; তিন লবে এক নিমেষ এবং তিন নিমেষে এক ক্ষণ হয়। এইরূপ পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, এবং পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু হইয়া থাকে। পঞ্চদশ লঘুর নাম এক নাড়িকা। দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত। রাত্রি দিবার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে ছয় বা দশ নাড়িকায় এক প্রহর হয়। প্রহর মনুষ্যদিগের রাত্রি বা দিবার চতুর্থাংশ। এক প্রস্থ পরিমিত জল যতক্ষণে চারি মাষা স্বর্ণে বিনির্ম্মিত * চতুরঙ্গুল বিস্তার শলাকা দ্বারা কৃত একটী ছিদ্র দিয়া ছয় পল পরিমিত † এক তাম্রপাত্রে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে নিমগ্ন করে, ততক্ষণ এক নাড়িকার পরিমাণ।

* ২ সেরে এক প্রস্থ, এবং ১২ বার রতি বা ৵০ আনায় এক মাষা।

† ৮ তোলায় এক পল।

চারি চারি যামে মনুষ্যদিগের দিবা বা রাত্রি হয় (অর্থাৎ চারি যামে রাত্রি ও চারি যামে দিবা)। পঞ্চদশ দিবসে এক পক্ষ। (পক্ষ দুইটি) কৃষ্ণ ও শুক্ল। দুই পক্ষে এক মাস। উহাই পিতৃগণের দিবা ও রাত্রি; (অর্থাৎ মানুষের এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র) এইরূপ দুই মাসে এক ঋতু; এবং ছয় মাসে এক অয়ন। অয়নও দুই;—দক্ষিণ এবং উত্তর। দুই অয়নে দেবতাদিগের দিবা ও রাত্রি হয়।

দ্বাদশ মাসে এক বৎসর। এইরূপ একশত বৎসর মনুষ্যদিগের পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গ্রহ ১ নক্ষত্র ২ ও তারাগণের ৩ দ্বারা চিহ্নিত যে কালচক্র,—তত্রস্থ কালাত্মা ঈশ্বর ৪ পরমাণু অবধি বৎসর পর্য্যন্ত কালদ্বারা দ্বাদশরাশিময় এই ভুবনকোষ পর্য্যটন করিতেন। বৎসর পাঁচ প্রকার; সংবৎসর ৫, পরিবৎসর ৬, ইদাবৎসর ৭, অনুবৎসর ৮ ও বৎসর ৯।

যে মহাভূত আপনার কালশক্তি দ্বারা (বীজাদির) কার্য্যশক্তি ১০, নানাপ্রকারে প্রবর্ত্তিত করিয়া মনুষ্যদিগের মোহশান্তির নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন ১১ এবং যিনি যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া স্বর্গাদি ফল প্রদান করিতেছেন, সেই তেজোমণ্ডলরূপী বৎসরপ্রবর্ত্তক সূর্য্যকে পূজা কর।

---

১ চন্দ্রাদি। ২ অশ্বিনী প্রভৃতি। ৩ অন্যান্য নক্ষত্রের। ৪ সূর্য্য। ৫ যতকালে সূর্য্য মেষাদি দ্বাদশরাশি অতিক্রম করেন। ৬ যতকালে বৃহস্পতি দ্বাদশরাশি ভোগ করেন। ৭ ত্রিংশৎ সূর্য্যোদয়ে যে মাস পরিমিত হয়, তাহার দ্বাদশ মাস। ৮ যতকালে চন্দ্র দ্বাদশরাশি অতিক্রম করেন। ৯ নক্ষত্র দ্বারা পরিমিত মাসে দ্বাদশ মাস। ১০ অঙ্কুরাদি।

১১ অর্থাৎ সূর্য্যের গতি দ্বারা পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মনুষ্য সংসারাশক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

আপন আপন পরিমাণ অনুসারে পিতৃ দেবতা ও মনুষ্যের প্রত্যেকেরই পরমায়ু একশত বৎসর। ১২।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে চারি যুগ। প্রত্যেকের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ লইয়া ঐ যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ সমুদয়ে দেবতাদিগের দ্বাদশ বৎসর। তন্মধ্যে সত্যযুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর, এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রত্যেক চারিশত বৎসর। এইরূপে ত্রেতার পরিমাণ তিনসহস্র বৎসর, এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রত্যেক তিনশত বৎসর। দ্বাপরের পরিমাণ দুইসহস্র বৎসর, এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রত্যেকের দুইশত বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর, এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রত্যেকের একশত বৎসর। যুগের প্রারম্ভের নাম সন্ধ্যা, এবং অন্তের নাম সন্ধ্যাংশ। উহা শত সংখ্যক বৎসর পরিমিত। ঐ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী যে কাল, যুগবেত্তারা তাহাকেই যুগ কহিয়া থাকেন।

ত্রিলোকের বহির্ভাগস্থ মহর্লোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোক-সমূহে যে যুগচতুষ্টয় প্রচলিত আছে, তাহার সহস্র ব্রহ্মার একদিন। তাঁহার রাত্রির পরিমাণও তদ্রূপ—চারি সহস্রযুগ। ঐ রাত্রিকালে বিশ্বস্রষ্টা নিদ্রা সম্ভোগ করেন।

অনন্তর নিশাবসান হইলে পুনর্ব্বার লোকসৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঐ সৃষ্টি যতকাল চতুর্দ্দশ মনু ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন † ততকাল ব্রহ্মার একদিন।

১২ সূর্য্য যতক্ষণ দ্বাদশরাশি অতিক্রম করেন, উহা মনুষ্যদিগের এক বৎসর এইরূপ একশত বৎসর মনুষ্যদিগের পরমায়ু। মনুষ্যের এক মাসে পিতৃদিগের এক দিবস; এইরূপ দিবস দ্বারা পরিগণিত এক বৎসরের একশত বৎসর তাঁহাদিগের পরমায়ু। মনুষ্যের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিবস; এইরূপ দিবসে পরিগণিত এক বৎসরের একশত বৎসর তাঁহাদিগের পরমায়ু।

* অর্থাৎ তদ্রূপ চারিসহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিন।

† অর্থাৎ যাবৎ কালে চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন ও বিলীন হন।

প্রত্যেক মনু আপন আপন কাল, অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক একসপ্ততিযুগ ভোগ করেন। মন্বন্তর সমূহে মনু ও তদ্বংশীয় রাজাসকল ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হন ; কিন্তু সপ্তর্ষিগণ, দেবতাগণ, ইন্দ্রগণ ও ইন্দ্রগণের অনুবর্ত্তী গন্ধর্ব্বগণ ইহারা সকলেই এককালেই সমুদ্ভূত হন।

এই যে সৃষ্টির কথা বলিলাম। ইহাই ব্রহ্মার প্রাত্যহিক সৃষ্টি। লোকত্রয় ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তির্য্যক্‌জাতি, মনুষ্য, পিতৃ ও দেবগণ আপন আপন কর্ম্মনিবন্ধন ইহাতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ মন্বন্তর-নিকরে সত্ত্বগুণ অবলম্বন করতঃ মনু প্রভৃতি আপন মূর্ত্তি দ্বারা পুরুষকার প্রকটীকৃত করিয়া এই বিশ্ব পালন করেন। অনন্তর দিবা অবসান হইলে তমোলেশ গ্রহণ করতঃ কথঞ্চিত আপন বিক্রম সংহার করেন। সেই সময় যাবতীয় পদার্থ কালবশে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় ; সুতরাং তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন। নিশাগমে ভগবান্ এইরূপে অন্তর্হিত হইলে পর, ভূরাদি লোকত্রয়ও তিরোহিত হয়।* পরে ভগবচ্ছক্তিরূপ সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নি দ্বারা ত্রিলোক যখন দগ্ধ হইতে থাকে, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ তখন সেই উত্তাপে তাপিত হইয়া মহর্লোক পরিত্যাগ করতঃ জনলোকে প্রস্থান করেন। এদিকে প্রলয়-কালের প্রবৃত্তি নিবন্ধন সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমুদ্রসমূহে উৎকট ক্ষোভজনক তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইয়া ত্রিভুবন প্লাবিত করে। সেই সময় ভগবান্ সেই সলিলের অভ্যন্তরস্থ অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রা অবলম্বন করতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকেন। জনলোকবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকে। †

* এই প্রলয়ে কেবল ভূর্ভুবঃস্বঃ অর্থাৎ মর্ত্ত্যলোক, প্রেতলোক ও স্বর্গলোক এই লোকত্রয় ধ্বংস হয়, মহ হইতে আর চারি লোক থাকে।

† শ্রীমদ্ভাগবত,—তৃতীয় স্কন্ধ ১১ অঃ।

"এই ব্রহ্মাণ্ড যখন সলিলময় হইয়াছিল, তখন একমাত্র ভগবানই সর্প শয্যায় দৃষ্টিহীন ও নিমীলিতনয়ন হইয়া নিদ্রিত ছিলেন। তৎকালে তিনি একাই আপনার স্বরূপানন্দে আপনি নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থিত ছিলেন।" *

শিষ্য। তাহা হইলে প্রলয়কালে ভগবান্ নিদ্রাগত হয়েন এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমুদয় সূক্ষ্মাবস্থায় তাঁহাতেই অন্বিত হইয়া থাকে ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। ভগবানেরও কি আবার নিদ্রা আছে ?

গুরু। জড় পদার্থ মাত্রেরই বিশ্রাম চাই,—একখানা এঞ্জিনকে তাহার শক্তিমতে পরিচালনা করতঃ আবার বিশ্রাম দিয়া পুনরায় চালাইতে হয়, নতুবা সে ফাটিয়া যায়।

যাহা হউক, জড় পদার্থ মাত্রেরই বিশ্রাম চাই,—ভগবান্ যখন জড়ে অন্বিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাতে যে জড়পদার্থ আছে, তাহারও বিশ্রাম চাই, এই বিশ্রামই নিদ্রা। এই বিশ্ব তাঁহারই মূর্ত্তি, সুতরাং তাঁহার নিদ্রাকালে সমস্ত পদার্থ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তাঁহাতেই লীন থাকে। প্রলয়কালে জীবের ধ্বংস হয় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

প্রলয়কালে জীব কোথায় থাকে ?

শিষ্য। কথাটা যেমন গুরুতর, তেমনি অস্পষ্ট হইল—সুতরাং বুঝিতে পারিলাম না, আরও একটু বিশদ করিয়া বলুন ?

---

* শ্রীমদ্ভাগবত—৩য়। ৮ম। ১০।

গুরু। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥
গীতা ৭ম অঃ। ৬—৭।

অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে; অতএব আমি এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয়কর্ত্তা। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, যেমন সূত্রে মণিসকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত হইয়াছে।

ইহাতে এবং পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই জগৎ ঈশ্বরের শক্তি-সমষ্টি মাত্র। যেমন একজন যোদ্ধা যুদ্ধকালে আপনার শক্তির নানা কৌশল একত্র করিয়া সমর করে; পরে সমরান্তে আত্ম-শক্তিকে আপনাতেই লুপ্ত রাখে, তদ্রূপ ঈশ্বর জগৎরূপে ব্যক্ত, আপনার শক্তিসমূহকে নিজ বাসনা দ্বারা নানাভাবে রূপান্তরিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার বাসনার বিরামে, ঐ শক্তিসমূহ তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। লীন হওয়া কেবল লীলাবিস্তারের জন্য বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর যে আধারে আত্ম-শক্তি রক্ষা করেন, সেই আধার কার্য্য-ভাবকে পুরুষ কহে। এবং সেই আধার ও কার্য্য এই উভয়ের সম্বন্ধকারক অবস্থাকে শক্তি কহে। ঐ আধার না থাকিলে ঈশ্বর-সত্তা-শক্তিসমূহকে নিয়মিত কার্য্যপর করিতে অক্ষম হয়েন। আধার ভিন্ন জগতের কোন বস্তু একভাবে অবস্থান করিতে পারে না। ফল পক্ষে ত্বক্। বীজ পক্ষে আবর্ত্তন। জীব পক্ষে প্রাণাদি বায়ুই

আধার স্বরূপ। যেমন ফলের ত্বক্ ও প্রাণীর প্রাণাদি বায়ু নষ্ট করিলে কার্য্যপ্রকাশক সকল শক্তির হ্রাস হয়, এবং ঐ ত্বকাদি আধার যেমন ফলাদি হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, তদ্রূপ ঈশ্বর জগতের কার্য্য জন্য যত শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, উহাদের সকলকেই আপন আধারের অধীনে রাখিয়াছেন। নচেৎ কোন কার্যই লীন হইতে পারিত না। ঈশ্বরপক্ষে আধারকে কাল কহে। ঐ কাল দ্বারা মায়াগত সকল শক্তিই ধৃত হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরের সত্তা ঐ আবরণের অন্তর্গত থাকে। যেমন প্রাণীর প্রাণ জীবনের ও জীবিকার সীমা প্রদান করে, যেমন ত্বক্ ফলের পালনকারী, তদ্রূপ ঐ কাল সকল শক্তির ও সমষ্টিগত জগতের প্রকাশক, বর্দ্ধক ও নিরোধক। ঈশ্বরের সত্তা উহা দ্বারা কর্ষিত হইয়া শক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে, এবং ঐশিক বাসনামতে সত্তার প্রকাশ লোপ হইয়া প্রলয় হইতেছে। জগতের তত্ত্বসংগ্রহকারী বলিয়া ঐ ঈশ্বরপ্রভাবকে কাল বলে। শক্তির সংযোগে জগদাদি কার্য্যে রত হয়েন বলিয়া উহাকে পুংভাবাপন্ন বলা যায়। ত্রিগুণ উহাতে সংযুক্ত হইলে, উহাই সত্ত্বগুণময়ে ব্রহ্মা, রজোগুণময়ে বিষ্ণু ও তমোগুণময়ে মহাদেব রূপে উদ্ভূত হয়েন।

সৃষ্টির আরম্ভ কালে গুণের সম্মিলন। প্রলয়কালে গুণহীন হইয়া একভাবে সেই সত্তারূপী পূর্ণব্রহ্মকে ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরের বিরাম স্থান রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই অবস্থায় ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়ভাবে সকল শক্তির সহিত সুষুপ্ত হয়েন,—ইহা সঙ্গত বুঝিতে হইবে।

যখন একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, ব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্যাদির ও প্রলয়াদির প্রকাশাদি ছিল না, সেই অবস্থাকে অনাদি অবস্থা বা ব্রহ্মাবস্থা বলা যাইতে পারে। কার্য্য হইবার জন্য যখন তাহার পরিবর্ত্তন প্রকাশ

হয়, পরিবর্ত্তনের অবস্থামতে ব্রহ্মেতে আদি ও অন্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই আদি ও অন্ত অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়, একটি প্রকাশ্য অবস্থার উপরে ঘটিয়া থাকে; সেই অবস্থার অতীত অর্থাৎ একমাত্র কর্ত্তার স্থিতি, তখন তাহাকে অনাদি, অনন্ত প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম অনুভবনীয় অবস্থার দ্বারা প্রকাশ করা যায়; অনুভব ভিন্ন জ্ঞান দ্বারা আর কোন উপায়ে প্রকাশ হইবার সম্ভব নাই; সেই মূল অবস্থাকেই ব্রহ্ম অবস্থা বলে। সেই অকর্ম্মী অবস্থা হইতে জগৎরূপী কার্য্য প্রকাশ হইয়াছে, এবং প্রকাশান্তে ইহার পরিবর্ত্তন অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারার্থ ও কারণসমূহের অবস্থান্তর করণার্থ যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই আদি ও অন্ত, কিম্বা সৃষ্টি ও প্রলয় বলা যায়।

বীজরূপে তৃণাদির অবস্থান্তর হইলে তৃণাদির সত্তা যেমন তাহার অন্তরে থাকে, তদ্রূপ জগতের সূক্ষ্ম উপাদানরূপী সলিল মধ্যে জগতের সত্তারূপী ঈশ্বর জগৎ প্রকাশক কালাত্মিকাদি শক্তির সহিত অবস্থিত থাকেন,—এবং সমস্ত জীব তাহাতে অন্বিত হইয়া থাকে। তৎপরে এই প্রলয়ের দ্বারা বিশ্বের বিস্তারাদি নানা প্রকার অবস্থায় প্রকাশ হইয়া থাকে;—পরে সৃষ্টির প্রথমাবস্থা বিকশিত হয়। অতএব প্রলয়কালে জীবসমুদয় সূক্ষ্মদেহে ভগবানে অন্বিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রলয়ান্তে জগৎ ও জীবের পুনঃ প্রকাশ।

শিষ্য। প্রলয়ান্তে যখন নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন জীব কি প্রকারে স্থূলদেহ লাভ করিয়া থাকে?

গুরু। তোমাকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, জগতের ও জীবের সমস্ত সূক্ষ্মভাব জীবভাবদ্বারা সংগৃহীত হইয়া প্রলয়াবস্থায় ঈশ্বরে লীন থাকে; তৎপরে পুনরায় জগৎ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইলে যে কার্য্যে যে উপাদান জীবভাবের প্রয়োজন হয়, কাল তাহা দান করিয়া থাকেন।

শিষ্য। তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইতে পারে?

গুরু। অনুমান প্রমাণের বলে ইহা স্থির করিতে হয়। কেন না, তখন সূক্ষ্মদেহ ব্যতীত স্থূলদেহে কেহই থাকে না, তবে স্থূলদেহীর তাহা কি প্রকারে স্মরণ থাকিতে পারে?

শিষ্য। কি প্রকার অনুমান?

গুরু। অনুমান এইরূপে হয়, যথা—বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন,—

"প্রাণিগত ও জগদ্গত যে সকল তত্ত্ব যে স্বভাবাক্রান্ত হইবে, কাল তাহাতে তদ্রূপ জীবভাব প্রদান করিয়া সত্ত্বসমূহ সক্রিয় করিয়া থাকেন।" . ইহার প্রমাণ এই যে,—একটী প্রাণী বা বৃক্ষ মৃত ও বিকৃত হইয়া পূর্ব্ব স্বভাব হইতে চ্যুত হইলে, তন্মধ্যগত তত্ত্বসমূহকে আশ্রয় করিয়া কোটী কোটী কীট ও পতঙ্গাদির জীবত্বের সঞ্চার হইয়া থাকে। সেই সমস্ত জীবত্বের অদৃষ্ট স্বভাবাদি ও চৈতন্যাদি ইতিপূর্ব্বে কখনই ঐ প্রাণী-আদির শরীরে ছিল না। কারণ বিজ্ঞানের বিশেষ বিচারে দেখা যায় যে, যে বস্তু যে স্বভাবাপন্ন, তাহার অংশ হইতে সেই স্বভাবাপন্নের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্ব স্বভাব নাশ হইলে পশু প্রভৃতির ভৌতিকাংশ তত্ত্বরূপে সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন হয়। কাল দ্বারা যে তত্ত্ব যে স্বভাবের বা অদৃষ্টধারণের উপযুক্ত, সে তাহা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিলীলা করিয়া থাকে। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, বিভিন্ন অদৃষ্টাদি ও স্বভাবাদি লইয়া এমন একটী নৈসর্গিকভাব ভবনে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি সতত আত্মকর্ম্ম সাধন করিতেছেন। কোন তত্ত্বকে অনুপযোগী করিয়া ত্যাগ করিতেছেন না। নৈসর্গিক শক্তিকে অদৃষ্টের ও আত্মার আধাররূপিণী কালশক্তি কহে। ঐ শক্তি দ্বারা উহার আদিকাল হইতে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে, ইহা অনুমান দ্বারা বুঝিতে হইবে।

ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"অনন্তর ভগবান্ আত্মশক্তির সহিত চারি সহস্র যুগ সেই কারণ-বারিতে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া আপনার দেহে কাল নামক শক্তিদ্বারা সংগৃহীত অদৃষ্ট সংযুক্ত জীবভাবসমূহকে জাগ্রত হইয়া দর্শন করিলেন!" শ্রীমদ্ভাগবত ;—৩য়। ৮ম। ১২।

ঈশ্বর পুনরায় যখন জাগ্রত হইলেন, অর্থাৎ চৈতন্যকে সক্রিয় করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ক্রিয়ার উপাদানরূপী ঐ সকল অদৃষ্টময় কাল

সংগৃহীত জীববৃন্দকে দেখিতে পাইলেন,—অর্থাৎ সৃষ্টিকালে যাহা প্রচলিত ছিল, তাহার সূক্ষ্মভাব কাল দ্বারা সংগৃহীত হইয়া ঐশিক ভাবে লীন ছিল, পুনরায় ঈশ্বর কার্য্যেচ্ছায় তাহা দেখিলেন। ঈশ্বর পুনরায় জগৎ বিস্তারেচ্ছায় জাগ্রত হইয়া ঐ কালসংগৃহীত জীবাদৃষ্টসমূহ আত্মদেহে দেখিলেন, ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন গমন ইচ্ছা করিলে মনের ক্ষমতা পদপ্রতিই ধাবিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের সৃষ্টি ভিন্ন অপর বাসনা নাই বলিয়া, উহাদের সৃষ্ট্যর্থ ইচ্ছা করিবামাত্রই দর্শন করিলেন। স্বদেহ বলিতে জগতের সূক্ষ্মাংশই তাঁহার দেহ শক্ত্যাদি ও উপাসনাদি সমস্তের মধ্যে কর্ত্তাই জীব ও অদৃষ্ট, এই জন্যই উহাদের দর্শন বা সক্রিয় করিতে ইচ্ছা করিলেন।

স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ
কালেন কর্ম্ম-প্রতিবোধকেন।
স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং।
বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত,—৩য় স্কন্ধ। ৮ম অঃ। ১৪ শ্লোক।

সেই রজোগুণাপন্ন সূক্ষ্ম অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রতিবোধক কাল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পদ্মকোষরূপে সহসা উত্থিত হইলেন। সেই সময়ে সেই আত্মযোনি সেই বিস্তৃর্ণ সলিলরাশির মধ্যে আপন অঙ্গতেজে সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র বিদ্যোতিত হইলেন।

আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বর-স্বভাব যখনই পুনর্ব্বার সৃষ্টি-প্রকাশার্থ প্রকাশ হইল, সেই সময়ে তাঁহার বাসনা সংযুক্ত দৃষ্টি, কালদ্বারা সংগৃহীত অদৃষ্টাদির উপরে পতিত হইয়াছিল। সেই ঈশ্বরাভিপ্রায় মতে তৎক্ষণাৎ কালদ্বারা রজোগুণ সংযোগে ক্রিয়ারম্ভ হইলে, নাভিদেশ হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্বক্রিয়া আবির্ভূত হইল।

প্রলয় সৃষ্টি বিস্তারের উপায়; সৃষ্টি তৎপ্রকাশ মাত্র। এই প্রলয় ও সৃষ্টির অতীত যে আদি অবস্থা, তাহাই অদৃষ্ট বা কারণাবস্থা এবং তাহাকেই ঈশ্বরের বাসনাগত স্বভাব কহে। সৃষ্টি মধ্যে যত কিছু প্রাণ-আদি নামধেয় মহাভূতরূপী কারণ প্রকাশিত হয়, সমস্তই সেই অদৃষ্ট বা ঈশ্বর স্বভাব হইতে প্রকাশিত। সেই স্বভাবটির বিলয় নাই। তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তত্ত্বসমূহ পুনরায় লীলাময় হইয়া এই জগৎ জীবত্বে পরিণত হইয়া থাকে। অদৃষ্টকেই কর্ম্ম কহে;—কাল সেই কর্ম্মসমূহকে আবৃত করিয়া অর্থাৎ আপন আশ্রয়ে রাখিয়া প্রয়োজন অনুসারে কার্য্যত্বে প্রদান করেন। এক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় উহা হইতে কার্য্য প্রকাশ হইবে বলিয়া, কাল আত্ম-ধর্ম্ম অর্থাৎ সক্রিয় করণার্থ রজোগুণ উহাতে অর্পণ করিলেন।

রজোগুণ প্রাপ্ত মাত্রে কালগত ঐ ঈশ্বর-স্বভাবকে তাহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিবার জন্য ধাবিত করিতে লাগিল। এই প্রথমাবস্থা কি হইল, তাহা বুঝাইবার জন্য ভাগবতকার বলিলেন, "প্রথমে সেই ঈশ্বর-স্বভাব কালের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পদ্মকোষরূপে প্রকাশিত হইলেন।"

পদ্মকোষ—যাহার অন্তরের সৃষ্টিগত সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ব্যাপ্ত আছে, এমন অবস্থাকে পদ্মকোষ বলে; অর্থাৎ ঐ অবস্থা হইতে সৃষ্টির যাহা কিছু প্রলয়-লীন উপাদান, তাহা প্রকাশ হইবে বলিয়া তাহাকে তত্ত্বাধার বা পদ্মকোষ বলা হয়।

কালের দ্বারা ঐ অবস্থা প্রকাশ হইলে তাহার নাম হইল, আত্মযোনি স্বয়ম্ভূ (আত্মা হইতে জাত যিনি তিনিই আত্মযোনি) আত্মা এস্থলে বিষ্ণু সঙ্কর্ষণরূপী সত্ত্বগুণান্বিত ব্রহ্মাবস্থা।

সূর্য্য যেমন আপন-প্রভাবে সর্ব্বত্র প্রকাশিত থাকিয়া আত্মসত্তা বর্ত্তমান রাখেন, তদ্রূপ আত্মযোনি বিশাল অর্থাৎ বিস্তৃর্ণ প্রলয়-সলিলেই

সর্ব্বাংশে আত্মতেজ বিদ্যোতিত করিয়া মধ্যস্থলে প্রকাশ হইয়া বসিলেন। প্রলয়-সলিলে বলিতে লুপ্ত ও বিকৃত তত্ত্বসমূহের মিশ্রণাবস্থা। সেই লুপ্তক্রিয় তত্ত্বসমূহকে সক্রিয় করিয়া ঈশ্বর স্বভাবরূপ আত্মযোনি কালের আশ্রয়ে এই বিশ্ব রচনা করিবেন বলিয়া আত্মভাব প্রকাশ করিলেন।

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাভবাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোহভূৎ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ; ৩য় স্কঃ। ৮ম অঃ। ১৫ শ্লোক।

ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব কারণ সংযুক্ত সেই লোকপদ্মের মধ্যে সঙ্কর্ষণ দেব বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র স্বয়ং বেদময় বিধাতারূপী হইলেন। তাঁহাকেই বিশ্বজনেরা স্বয়ম্ভূ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

এই শ্লোকের দ্বারা ভাগবতকার বুঝাইলেন যে, স্বয়ং ভগবান্—যিনি প্রলয়কালে সঙ্কর্ষণরূপে ছিলেন, তিনি এক্ষণে বিষ্ণুরূপে বিধাতা হইবার জন্য পদ্মকোষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিধাতা বলিতে সৃষ্টিগত—সকল বিধানের কর্ত্তা। জ্ঞান আদি প্রাথর্য্য ব্যতীত বিধি প্রকাশ অসম্ভব, সেই জন্য তিনি বেদময় ছিলেন, অর্থাৎ আপনি কিরূপে জগতের কার্য্য করিবেন, এই জ্ঞান ব্রহ্মস্বভাব হেতু তাঁহাতে নিত্য ছিল। সেই বেদ-স্বভাব-সহযোগে তিনি বিধি দান করণার্থ কর্ত্তা হইয়া ঐ লোক ও অদৃষ্টময় পদ্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইলেন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গুটিপোকা যেমন আপন শরীরগত রসে আবরণ প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে আত্ম-সত্তারূপী সন্তান স্থাপন করে ও পরে সেই অণ্ডনিবিষ্ট সন্তান আত্ম-স্বভাব দ্বারা আপনার বৃদ্ধির ইচ্ছার সহিত সেই আবরণকে ক্রমেই বর্দ্ধিত

করিয়া থাকে; তদ্রূপ ঈশ্বর আপনিই সঙ্কর্ষণরূপে প্রলয়ান্তে তত্ত্ব ও অদৃষ্টাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আবরণ করতঃ বিষ্ণু অর্থাৎ আত্মরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার অঙ্গজাত আবরণরূপী এই জগৎ প্রকাশ করেন মাত্র।

এই সর্ব্বকারণ মধ্যগত ঐশিক ভাবকে স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ ব্রহ্মা কহে।

তস্যাং স চাম্ভোরুহকর্ণিকায়া
মবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ।
পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্তনেত্র-
শ্চত্বারি লেভেহনুদিশং মুখানি॥
শ্রীমদ্ভাগবত—৩য় স্কঃ। ৮ম অঃ। ১৬ শ্লোঃ

ভগবান্ বিধাতা পদ্মকর্ণিকার উপরে অবস্থিত হইয়া লোকসমূহ দর্শন করিতে করিতে যেমন প্রলয়গত ক্রিয়াশূন্য স্থানের চতুর্দ্দিকে আপনার নেত্র বিস্তার করিলেন; অমনি তিনি প্রত্যেক দিক্ দর্শনার্থে এক একটি বদন লাভ করিলেন।

বিজ্ঞানবিদেরা বলেন,—কোন বস্তু বা অবস্থা প্রকাশ করিতে হইলে তিনটী পরিবর্ত্তন ও চারিটী সীমার স্থির করিতে হয়। নচেৎ বস্তু বা অবস্থা বোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। সীমা শব্দের প্রকৃত ভাব—নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে দীর্ঘাদি ক্রমে ব্যাপ্তি। পরিবর্ত্তন বলিতে—বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত; আদি, মধ্য ও অন্ত; কিম্বা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। এ পর্য্যন্ত কোন তত্ত্বই পরিবর্ত্তন শূন্য বা সীমাহীন হইয়া জ্ঞানের বোধক হইতে পারে নাই।

সহজ বুদ্ধিতে উপলব্ধি করাইবার জন্য কারণের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সীমা কিরূপে স্থির করিতে হইল, না প্রলয়-অবস্থায় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল বলিয়া, অবস্থান্তর বোধ হইল। সেই অবস্থান্তর একবারে

হয় নাই, কারণ ইহজগতে এক ভাবে এক সময়ে এক বস্তুর সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ অসম্ভব। এই নিয়মে ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্গলোকের প্রকাশভাবও যে একবারে না হইয়া ক্রমশঃ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সেই প্রথম প্রকাশ যে কর্তৃত্বভাবের দ্বারা যে অংশে আরম্ভ হইল, তাহাই প্রলয়ের মধ্যস্থল; অর্থাৎ সীমা বিন্দু। সেই কর্তৃত্ব-সংযুক্ত কারণ স্থান হইতে ব্যাপ্ত কারণ চারি সীমাবদ্ধ হইল; অর্থাৎ সেই সক্রিয়বিন্দু হইতে সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম এই চারি সীমা নির্দ্দেশ করা হইল।

অতঃপর এই চতুর্ব্বিধ ব্যাপ্তিতে বিধাতা স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব রচনা করিলেন। সমস্ত সৃষ্টি করিয়াও জীবজগতের কার্য্য চালাইতে সক্ষম হইলেন না। তখন জগতে জীবাদি কি উপায়ে সৃষ্টি হয়, তাহাই তাঁহার শ্রেয় হইলে, তিনি তদ্গত হইবার জন্য আত্মবিস্মৃত হইলেন, যে আধারে সৃষ্টির উপাদানরূপী পরিমাণ, অর্থাৎ সৃজন, পালন ও বিলয়াত্মক কারণ সমূহ ছিল, তন্মধ্যে ঈশ্বর-স্বভাব সৃষ্টির জন্য মধ্যগত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। ঋষিগণ স্থির করিয়াছেন যে ব্রহ্মা আপনা হইতে আত্মাকে প্রকাশ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য উপকরণ তৎসহযোগে প্রদান করতঃ তাহাকে কর্ম্মী করিবার জন্য প্রথমে বিস্ময় তাহাতে প্রকাশ করেন। ঐ বিস্ময়কে মহামায়া কহে। উহার তেজেই ব্রহ্মা তখন কর্ম্মপর হইলেন। তখন ব্রহ্মা ধ্যান দ্বারা অবগত হইতে পারিলেন যে, কালের ও কর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এক পুরুষ উদ্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার দেহ বিস্তৃত পর্ব্বতের ন্যায়,— সেই বিস্তৃত দেহে নীলাম্বর আছে, রত্নমণ্ডিত হইয়া আছে,—তাহাতে এত শোভা হইতেছে যে,যদি কোন মরকতময় পর্ব্বতের কটিদেশে সন্ধ্যাকালে ধূসর মেঘ থাকে ও শিরোদেশে সুবর্ণশৃঙ্গ থাকে, তাহাতে পর্ব্বতের যে শোভা হয়, তদপেক্ষা সেই শায়িত পুরুষের অঙ্গের

শোভা অধিক হইয়াছে। * সেই ঈশ্বরের অংশরূপী কালকেই মহাদেব কহে। বিস্ময় বা মায়ারূপে শক্তির সহিত এক ঈশ্বর আত্মাতে ও কালেতে সংযুক্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃপ্রবিষ্ট হইলেন, এই জন্য তাঁহাকে বিজ্ঞানে বিষ্ণু কহিয়া থাকে। এই প্রথম সৃষ্টি প্রকরণেই ব্রহ্ম ত্রিভাবময় হইলেন, অর্থাৎ চৈতন্যপ্রদাতা আত্মরূপে ব্রহ্মা হইলেন; কামরূপে কর্ম্মপ্রকাশ-কারী মহেশ্বর হইলেন, এবং বিস্ময় নাম্নী মায়া প্রচার-কর্ত্তা রূপে বিষ্ণু হইলেন। ঐ মায়ার দ্বারা আত্ম-কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আত্মা নিজ রক্ষণে নিযুক্ত হয়। মায়ার হাত হইতে সেই রক্ষণভাবোদ্দীপক শক্তিকে বিষ্ণুর পালন গুণ কহে।

অনন্তর স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের স্থূল রূপ প্রকাশ পাইল ও লয়কালে যাবতীয় জগৎ যে ভাবে ছিল, গুণকর্ম্ম সূক্ষ্মদেহে থাকা হেতু আবার তাহারা কর্ম্মাদির সহিত সেই সেই দেহ প্রাপ্ত হইল।

শিষ্য। এই সমুদয় বিষয় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে দুইটী জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে।

গুরু। কি কি?

শিষ্য। সূক্ষ্মদেহিগণ ঈশ্বরে আশ্রয় করিয়াছিল;—তৎপরে যখন জগৎ বিকশিত হইল, তখন তাহারা আপন আপন জড় দেহ চিনিয়া লইল কি প্রকারে?

গুরু। আপন আপন দেহ কি? পূর্ব্বপরিত্যক্ত জড় দেহ ত গলিয়া

---

* প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ
সন্ধ্যাভ্রনীবেরুরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ।
রত্নোদধাবৌষধিসৌমনস্য
বনস্রজোবেণু-ভুজাঙ্ঘ্রিঃ পাঙ্ঘ্রেঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত,—৩য় স্কঃ। ৮ম অঃ। ২৪ শ্লোঃ।

দ্রব হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে আবার সেই সূক্ষ্ম দেহ স্থূলে পরিণত হইল মাত্র।

শিষ্য। ভুল হইতে পারে না কি—মনুষ্য-আত্মা অশ্বের স্থূল দেহ ধারণ করিলেও পারে ত?

গুরু। তাহা কি হইতে পারে? ক্ষুদ্র অশ্বত্থ-বীজে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-বৃক্ষ অবস্থিত থাকে, অশ্বত্থ-বীজে আমবৃক্ষ বা আম্রবৃক্ষে কাঁঠালবৃক্ষ উৎপাদিত হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পুনর্জ্জন্ম।

শিষ্য। জীবাত্মা স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া, আবার মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করতঃ স্থূলদেহ ধারণ করে কি না?

গুরু। জীবাত্মা অনন্তকাল হইতে বিদ্যমান থাকিয়া সংসারচক্রের মধ্যে অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
গীতা,—৪র্থ অঃ। ৫ম শ্লোঃ।

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সে সমুদয় জানি, কিন্তু তুমি অবিদ্যাবৃত বলিয়া সে সমুদয় জান না।

শিষ্য। জীবাত্মার জন্ম গ্রহণ এবং মৃত্যুই কার্য্য; না জন্মমৃত্যু রূপ যাতায়াতের শেষ আছে?

গুরু। জীবাত্মার যতকাল পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত

তাহাকে বহু জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। সূত্র-গ্রথিত পুষ্পনিচয়ের একে একে স্খলন হইলেও সূত্রটি যেরূপ অক্ষত থাকে, সেইরূপ আত্মপরিগৃহীত দেহসমূহের একে একে ক্ষয় হইলেও আত্মা অবিকৃত থাকেন। সংসারে এমন কোন কারণ নাই, যাহা হইতে আত্মার ধ্বংস হইতে পারে।

যানি কর্ম্মানি সংসার-ফলহেতূনি সত্তম।
তানি তৎসাধনত্বেন দেহমুৎপাদয়ন্তি বৈ॥
শরীরারম্ভকং কর্ম্ম যোগিনোঽযোগিনোঽপি বা।
বিনা ফলোপভোগেন নৈব নশ্যত্যসংশয়ম্॥—গীতা।

হে সত্তম! যে সমস্ত কর্ম্ম সংসার-ফল-হেতুভূত, তাহারা ফলভোগ-সাধন দেহ উৎপন্ন করিয়া থাকে। যোগী বা অযোগী সকলেরই শরীরা-রম্ভক কর্ম্ম ফলোপভোগ ব্যতীত নিশ্চয়ই নষ্ট হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে;—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না;—ইনি অজ, নিত্য, ক্ষয়রহিত বা পুরাণ;—শরীর বিনষ্ট হইলেও ইহার নাশ হয় না। যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করেন।

মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে;—

যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে।
যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ॥

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥
এতা দৃষ্ট্বাস্য জীবস্য গতিঃ স্বেনৈব চেতসা ।
ধর্ম্মতোঽধর্ম্মতশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ ॥

যিনি এই শরীরকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা বলে, এবং যে কর্ম্ম করে তাহাকে পণ্ডিতেরা পাঞ্চভৌতিক দেহ বলেন। মনুষ্য শারীরিক পাপ দ্বারা স্থাবরযোনি, বাচিক পাপদ্বারা তির্য্যক্‌যোনি ও মানসিক পাপদ্বারা অন্ত্যজাতি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে জীবের যে সকল দশা উপস্থিত হয়, তাহা স্বয়ং অবলোকন করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে।

অতএব আত্মার কর্ম্ম নাশ না হইলে, তাঁহার জন্মান্তর পরিগ্রহের নিবৃত্তি হইবে না। মুক্তি হইলেও আত্মার নাশ হয় না, পরন্তু তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। কুম্ভকারের চক্র যেমন অন্তর্গত শক্তি-প্রভাবে অনবরত ঘূর্ণমান হইতে থাকে, সেইরূপ সংসার-চক্রও কর্ম্মফলস্বরূপ অন্তর্নিহিত শক্তি-প্রভাবে অবিরত বিঘূর্ণিত হইতেছে। যেমন কোন বোতলের মধ্যে কতকগুলি মধুকরকে প্রবেশ করাইয়া উহার মুখবন্ধ করিলে, ঐ মধুকরগুলির কেহ ঊর্দ্ধে উৎক্রমন, কেহ অধোদেশে গমন, কেহ বা মধ্যদেশে অবস্থান করে, কেহই উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ জীবসকল শুভাশুভ কর্ম্মদ্বারা সংসার চক্রে আবদ্ধ হইয়া কেহ সুরলোক, কেহ নরলোক, কেহ বা প্রেতলোকে গমন করিতেছে। কিন্তু কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই সংসরণশীল জীবসকল পরস্পর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সতত বিচরণ করিতেছে। কেহই সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারে না যে, ইনিই চিরকাল আমার পিতা, ইনিই চিরদিন আমার

মাতা ছিলেন,—আবার যে সকল জীব আছে, তাহাদের সহিত আমার কোনকালে পিতৃ-সম্বন্ধ বা মাতৃ-সম্বন্ধ যে ছিল না তাহাও নহে। কারণ একটী সামান্য জীবও কোটি কোটি জন্মে, অপর উন্নত জীবের পিতা মাতা হইতে পারে; বর্ত্তমান জন্মের সম্বন্ধই চরম সম্বন্ধ নহে। *

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, প্রতি সপ্ত বর্ষে দেহাবয়বের সম্পূর্ণ নবীকরণ হইয়া থাকে। সপ্তমবর্ষাভ্যন্তরে প্রত্যেক পরমাণুর বিচ্যুতি হইয়া দেহাবয়বে নূতন পরমাণু সংস্থাপিত হয়, অথচ দেহধারী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লোপ পায় না। এখন যদি দেহের শত পরিবর্ত্তনেও জীবের আত্মত্ব লুপ্ত না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুরূপ দৈহিক পরিবর্ত্তনেই বা আত্মার ধ্বংস কিরূপে হইবে? আমি সপ্তবর্ষ পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, এখনও তাহাই আছি, অথচ শরীরের ও মনের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতএব দৃষ্ট হইতেছে, ইহজন্মে শারীরিক ও মানসিক শত পরিবর্ত্তনেও আমার আমিত্ব লুপ্ত হয় না, তবে মৃত্যুরূপ শারীরিক পরিবর্ত্তনেই বা আমিত্বের একান্ত বিনাশ কিরূপে সম্ভব হয়? মৃত্যু শব্দের

---

* শত্রুমিত্রকলত্রাণাং বিয়োগঃ সঙ্গমস্তথা।
মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ বিবিধাস্তথা॥
অনুভূতানি সৌখ্যানি দুঃখানি চ সহস্রশঃ।
বান্ধবা বহবঃ প্রাপ্তাঃ পিতরশ্চ পৃথগ্বিধাঃ॥
ভৃত্যতাং দাসতাঞ্চৈব গতোঽপি বহুশো নৃণাম্।
স্বামিত্বমীশ্বরত্ব দারিদ্র্যত্বং তথাগতঃ॥
পিতৃ-মাতৃ-সুহৃদ্-ভ্রাতৃ-কলত্রাদি-কৃতেন চ।
তৃষ্ণোঽসকৃত্তথা দৈন্যমশ্রুধৌতাননো গতঃ॥
এবং সংসার-চক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা তাত সঙ্কটে।
জ্ঞানমেতন্ময়া প্রাপ্তং মোক্ষসংপ্রাপ্তি কামকম্॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণম্।

অর্থ আত্মার ধ্বংস নহে, দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ মাত্র। এক দেহের সহিত বিচ্ছেদ হইলেই দেহান্তরের সহিত সম্বন্ধ ঘটে।

ন্যায়দর্শনকার গৌতম বলেন, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বের অভ্যাস ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না, এবং পূর্ব্বশরীর ব্যতীত অভ্যাস হইতে পারে না। দেখা যায়, জীব ক্ষুধিত হইলে আহার করিতে অভিলাষ করে; আহার দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া সে জানিয়াছে, আহারই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায়। এই পূর্ব্বাভ্যাসের স্মৃতি বশতঃ তাহার উক্ত প্রকার অভিলাষ জন্মিয়া থাকে। এজন্মে সে কখনও শিখে নাই—আহারই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায়, তবে কেন তাহার আহারে অভিলাষ জন্মে? এখানে বলিতে হইবে, জাতমাত্র শিশু ক্ষুধিত হইয়া পূর্ব্বাভ্যাস স্মরণ করতঃ আহার অভিলাষ করিয়া থাকে। আত্মা পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করতঃ ক্ষুধাদ্বারা পীড়িত হইয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত আহারের স্মরণ পূর্ব্বক স্তন্যপান অভিলাষ করে। যদি বল, লৌহ যেমন অভ্যাস ব্যতীতও অয়স্কান্তের দিকে উপসর্পণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীতও স্তন্যপানে অভিলাষ জন্মে, তাহা হইলে বক্তব্য এই—শিশুর স্তন্যপান-ক্রিয়া প্রবৃত্তিপূর্ব্বক হইতেছে, কিন্তু লৌহের গমন প্রবৃত্তিপূর্ব্বক নহে। লৌহ যে কালেই হউক না কেন, অয়স্কান্তের সমীপে উপস্থিত হইলে তদভিমুখে ধাবিত হয়, ইহাতে তাহার অভিলাষ বা অনভিলাষ নাই। কিন্তু শিশু ক্ষুধিত হইলেই স্তন্যপান অভিলাষ করে, ক্ষুধার্ত্ত না হইলে অভিলাষ করে না। এই প্রবৃত্তিপূর্ব্বক ক্রিয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত আহারের স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন ক্রমেই উৎপন্ন হইতে পারে না।

এখানে আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, কেহই বীতরাগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশু রাগ-দ্বেষাদির চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তনই রাগ-দ্বেষাদির কারণ। পূর্ব্বজন্মে বিষয়ের অনুভব ব্যতীত এজন্মে ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাগ-দ্বেষাদির চিহ্ন প্রকাশ করিতে পারে না। যদি বল, দ্রব্য-গুণসমন্বিত হইয়াই উৎপন্ন হয়, নির্গুণ দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না, অতএব রাগ-দ্বেষাদি গুণসহ আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহা হইলে আপত্তি এই যে, সংকল্প-বিকল্প-দ্বারা রাগ-দ্বেষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু জড়পদার্থের গুণ সংকল্প-বিকল্প দ্বারা উৎপন্ন হয় না। অতএব জাতবালকের রাগ-দ্বেষাদি দেখিয়াও পূর্ব্বজন্মানুভব হইয়া থাকে।

জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবের রাগ-দ্বেষাদি যে সকল প্রবৃত্তি দেখা যায় উহা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ হইয়া থাকে; বর্ত্তমান জগৎ ঐ সকল সংস্কারকে উদ্বোধিত করিতেছে মাত্র। অতএব, ইহা নিশ্চয় যে, জীব আত্ম-কর্ম্ম-ফলভোগ জন্য মর্ত্ত্যলোক, প্রেতলোক ও স্বর্গলোক এই ভুবনত্রয়ের মধ্যে যাতায়াত ও জন্মাদি গ্রহণ করিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

জন্মান্তরীয় স্মৃতি।

শিষ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতির অনুভূতির দ্বারা জন্মান্তর আছে, ইহা স্বীকার করা গেল; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বিষয় যদি স্মরণ থাকিবে, তবে আমরা ইহার পূর্ব্বজন্মে কোথায় ছিলাম, কিরূপে বা স্বর্গ নরকাদি ভোগ করিয়াছি, আবার কেন বা এ জগতে আসিয়াছি, এ সকল ত আমাদের মনে থাকিত? যদিও আমাদের পূর্ব্বজন্মের জড় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তথাপি স্মরণ থাকিতে পারে। কেননা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,

জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, তাহা বর্ত্তমান কালবিষয়ক প্রমাণ, অতীত ও অনাগত বিষয় চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। কর্ণদ্বারা শুনা যায় না, অপর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও অনুভব করা যায় না। আমি বলিতেছি "কল্য বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম," এই বাক্যের প্রামাণ্য কোথায়?—চক্ষুতে না স্মৃতিতে? অবশ্যই বলিতে হইবে, স্মৃতিতে;—অবশ্যই বলিতে হইবে, স্মৃতিই অতীব ঘটনার প্রমাণ। তাই বলিতেছিলাম যদি জন্মান্তরীয় স্মৃতি লইয়া মানব জন্ম গ্রহণ করে, তবে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে থাকে না কেন?

গুরু। সকলেই যে পূর্ব্বজন্মের কথা ভুলিয়া যায়, তাহা নহে। তবে সাধারণ কামাদি জড়িত জীবের কথা এই যে,—শিশুর পূর্ব্বজন্মে যে বর্ণাদি ছিল, এখন তাহা নাই,—যে শরীর ছিল, তাহাও নাই,—সব নূতন,—সে তখন কেবল স্মৃতির সাহায্য গ্রহণ করে। এই জগতের কোন বস্তুর সাদৃশ্যবস্তু সে পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছে কি না স্মরণ করিতে থাকে। দেখে, পূর্ব্বানুভূত রূপ-রসাদির সদৃশ বহু বস্তু এই জগতে আছে। এই রূপে বর্ত্তমান জগতের রূপ-রসাদির ক্রমিক জ্ঞান হইয়া থাকে। সামান্য-বিশেষ ক্রমে সূক্ষ্মতর জ্ঞান জন্মিতে থাকে, ক্রমে এই সংসারের জ্ঞানে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মা পূর্ব্বজ্ঞান হারাইয়া থাকেন, পূর্ব্ব সংসারের মমতা ত্যাগ করিয়া এই সংসারের অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। তখন নিজের স্বরূপ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান,—দেহই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। আত্মা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতেও প্রয়াস পান না, বর্ত্তমান জগতের অর্থ বুঝিয়াই যে আদর্শের সাহায্য বুঝিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করেন, এই ত ঘোর মোহ। শাস্ত্রকারেরা এবম্প্রকার দেহাত্মবাদের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়াছেন। দেহের সহিত সম্বন্ধ হইলেই আত্মার এ মোহ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানসমূহ পূর্ব্বজন্মের

জ্ঞানসমূহকে আবৃত করিয়া ফেলে। এখন আর তুমি পূর্ব্বজন্মাভূতির কিরূপে স্মরণ করিবে? বাল্যকালে যখন এ পৃথিবীর জ্ঞান হয় নাই—তখন পূর্ব্বজ্ঞান (সংস্কাররূপে) সম্পূর্ণ পরিমাণে থাকে; এ সংসারের জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতীত জন্মের জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান বিনষ্ট হয় এরূপ নহে; কিন্তু বর্ত্তমান জন্মের জ্ঞানে মিশিয়া যায়; সুতরাং পূর্ব্বজন্মের সম্যক্ স্মৃতি কিরূপে হইবে?

সাদৃশ্য-জ্ঞানে বা সাক্ষাৎ দর্শনজ্ঞানে অনেক সময়ে এই বিলুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠে। হঠাৎ একজন অপরিচিত মানুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল,—জনস্রোতের মধ্যে যেন এই লোকটীকে কোথায় দেখিয়াছি, যেন তাহার সঙ্গে কত আলাপ ছিল,—যেন তাহার নিকট গিয়া দুইটা কথা বলিতে পারিলে হইত,—এমন একটা ভাব জন্মে। ইহা পূর্ব্বজন্মের পরিচয় স্মৃতির উদ্দীপনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

চ—বাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার খাস কামরার বারেণ্ডায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলাম; সেখানে আর কেহ ছিল না আমরাই দুই জনে ছিলাম। এমন সময় সেই বারেণ্ডার নিকট দিয়া এক ঘোষাণী দুগ্ধভাণ্ড কক্ষে করিয়া মন্থর গমনে তাঁহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘোষাণীর বয়স অনেক হইয়াছে—বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ঘোষাণী যখন তাহার প্রতিপদ-গমনে উচ্ছ্বসিত দুগ্ধভাণ্ড লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, তখন চ—বাবু গল্পরসে মনঃসংযোগহীন হইয়া সেই ঘোষাণীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন; সে চলিয়া গেলে মৃদু হাসিয়া অস্বাভাবিক ভাবে বলিলেন,—হাঁ, তারপর?

আমিও মৃদু হাসিয়া বলিলাম;—"তারপর, সহসা গল্পে অমনোযোগী হইয়া দুগ্ধভাণ্ডের উপরে, না দুগ্ধভাণ্ডধারিণী বৃদ্ধার উপরে অত্যন্ত ঐকান্তিক দৃষ্টিক্ষেপ করা হইতেছিল?"

চ—বাবু তাঁহার চেয়ারখানি আমার দিকে আরও অনেকখানি সরাইয়া আনিয়া বলিলেন, “ভাল কথা,—কাহারও সাক্ষাতে বলি নাই। তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করা আমার কর্ত্তব্য। শুন ভাই! ঐ যে ঘোষাণী আমার বাড়ীর মধ্যে দুগ্ধ লইয়া যাইতে দেখিলে, উহাকে দেখিলেই যেন উহাকে আমার মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। প্রাণে এক এক দিন এরূপ দুর্দ্দমনীয় উচ্ছ্বাস হয় যে, “মা” শব্দ যেন বাহির হইয়া পড়ে। আবার ঐ স্ত্রীলোকটীও আমাকে এত ভালবাসে, যেখানে ভাল দুগ্ধ পায়—আমার জন্য আনিয়া দেয়। যে মাসে আমার অসুখ করিয়াছিল, তাহাতে ঐ ঘোষাণী তিন দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার শিয়রে বসিয়াছিল।”

মনে মনে বুঝিলাম, পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধে ইহজীবনে সাদৃশ্য দর্শনে স্মৃতিতে উদয় হইয়াছে! বাবুকেও তাহাই বলিয়াছিলাম।

তোমার স্মরণ আছে কি? একবার পশ্চিমদেশীয় একখানা খবরের কাগজে লিখিত হইয়াছিল, “এক ব্যক্তি বঙ্গদেশ হইতে চাকুরী করিবার জন্য পশ্চিমদেশে আসেন। এখানে আসিয়া একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে গমন করেন, সেই বাড়ীতে গিয়াই যেন তাঁহার চিত্তে কোন পুরাণস্মৃতি জাগিয়া উঠে। তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট সেই বাড়ীর একটী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের এই বৈঠকখানায় ঐ উত্তরের পার্শ্বে বুদ্ধদেবের একখানি রৌপ্য-প্রতিমা ছিল না?”

বাড়ীর সেই ভদ্রলোকটী তদুত্তরে বলিলেন, “হাঁ মহাশয়, ছিল। আমার পিতা ঐ মূর্ত্তিটী স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও অনেক দিন ছিল। আমার বয়স যখন দশ বার বৎসর, তখন মাতাঠাকুরাণী উহা

একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোকের নিকটে বিক্রয় করেন,—তখন আমাদের বড়ই অর্থ কষ্ট হইয়াছিল।”

বঙ্গীয় যুবক বলিলেন,—“তোমাদের বাড়ীর মধ্যে একটা নিমগাছ ছিল, তাহা আছে?”

ভদ্রলোকটি বলিলেন—“কৈ না!”

“তোমার পিতা সেই বৃক্ষতলে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা অনেক—তোমরা পাইয়াছিলে কি?

ভদ্রলোক। সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

বঙ্গীয় যুবক। তোমার মাতাঠাকুরাণী জীবিত আছেন?

ভদ্রলোক। আছেন—কিন্তু অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছেন বলিয়া নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারেন না।

বঙ্গীয় যুবক। তাঁহাকে একবার এই কথাগুলা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।

টাকার লোভেই হউক, অথবা ভদ্রলোকের অনুরোধেই হউক, গৃহস্বামী তাহার বৃদ্ধা মাতার নিকটে গমন করিয়া ঐকথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, হাঁ নিমগাছ ছিল। সেবার ঝড়ের সময় গাছটা উপাড়িয়া পড়িয়া যায়, তুমি তখন খুব ছোট। আর তোমার পিতার যে কিছু টাকা ছিল, তাহা আমি জানি; কিন্তু কোথায় ছিল, তাহা তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। যে ভদ্রলোক এই সকল সংবাদ বলিয়াছেন, তিনি বোধ হয় ভাল জ্যোতিষী হইবেন, তাঁহাকে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলগে।”

গৃহস্বামী আসিয়া সে কথা বঙ্গীয় যুবকের নিকট বলিলে, তিনি বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। বাটীর মধ্যে গিয়া পূর্ব্বস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া পড়িল। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে মনে হইল,

পূর্ব্বজন্মে এই বাড়ী তাঁহারই ছিল,—ঐ প্রৌঢ়া ব্যক্তি তাঁহারই পূর্ব্ব-জীবনের পুত্র, এবং বৃদ্ধা তাঁহার মনোহারিণী কান্তা ছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া যেখানে টাকা প্রোথিত ছিল, তাহা বলিয়া দিলেন, পূর্ব্ব সম্বন্ধের কথাও প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব্বজন্মের বাড়ী-ঘর-দুয়ার কোন্ দেশে কোথায় পড়ে, হয় ত আর দর্শনই হয় না, কাজেই স্মৃতিও তাহা ভুলিয়া যায়। যুবকের ঐ মত চক্ষুর উপরে পড়িলে হয় ত মনেও হইতে পারে।

শিষ্য। একেবারে সম্পূর্ণভাবে কাহারও কি মনে থাকে না? অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে কি মনে থাকে না যে, আমি অমুক ছিলাম, তারপর অমুক জায়গায় জন্মিয়াছিলাম—কি এই জন্মিয়াছি।

গুরু। তাহাও থাকে বৈ কি! কিন্তু যোগাদির দ্বারা উন্নত আত্মা ভিন্ন তাহা স্মরণ করিতে পারে না। যাহাদের এইরূপ স্মরণ থাকে, তাহাদিগকে জাতিস্মর বলে। শ্রীকৃষ্ণদেব যখন মথুরায় জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন জন্মিয়াই বলিয়াছিলেন, আমাকে অতি ত্বরায় গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া আইস। তিনি কিছুই ভুলেন নাই, অবিদ্যা বা পৃথিবীর মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই—পৃথিবীর মায়ার সংস্পর্শেই ত জীবের যত ভুল! এই মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইবেন বলিয়াই শুকদেব মাতৃ-গর্ভ হইতে আর বাহির হইতে চাহে নাই; ভয় পাছে মর্ত্ত্যধামের মায়ার বাঁধনে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন।

এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি একটি সুন্দর উপাখ্যান শ্রবণ করাইতেছি। তাহা হইলে তুমি সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম হইবে। উপাখ্যানটি হরিবংশের একবিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। ঐ উপাখ্যানটি সনৎকুমার মার্কণ্ডেয়ের নিকটে বলেন। মার্কণ্ডেয় আবার ভীষ্মের নিকটে বলেন। মার্কণ্ডেয় দৃঢ়তার সহিত

বলিয়াছিলেন, ভগবান্ সনৎকুমার পূর্ব্বে যে অধার্ম্মিক পিতৃব্রত-পরায়ণ সপ্তব্রাহ্মণকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আমি কুরুক্ষেত্রে দিব্যনেত্রে নামতঃ ও কার্য্যতঃ সেই রাগতুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, মস্থণ ও পিতৃবর্ত্তী এই সপ্তব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়াছিলাম। ঐ সপ্তব্রাহ্মণ কুশিক তনয় বিশ্বামিত্রের পুত্র, এবং মহামুনি গর্গের প্রিয়তম শিষ্য। একদা গুরুর আজ্ঞায় তাহারা কপিলবৎসা পয়স্বিনী কপিলাকে চরাইবার জন্য কানন-মধ্যে গেল। তথায় বালভাব বশতঃই হউক, আর ক্ষুধার্ত্ত হইয়াই হউক—কপিলাকে বধ করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিয়া, আপনারা ভক্ষণ করিল এবং যথাসময়ে গুরুর নিকটে গিয়া বৎসটী প্রদান করিয়া বলিল, গাভীটীকে শ্বাপদে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। যথাসময়ে তাহাদের মৃত্যু হইলে, ঐ পাপে তাহারা উগ্র, হিংস্র ও বলবান্ হইয়া ব্যাধকুলে জন্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু পূর্ব্বে গাভী প্রোক্ষণ করতঃ পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়াছিল বলিয়া, তাহারা জাতিস্মর, মনীষী ও স্বকর্ম্ম-সাধন তৎপর হইয়া উঠিল। ব্যাধজাতি হইয়াও তাহারা হিংসা বা পশু হনন করিত না। ধর্ম্ম চর্চ্চাতেই জীবনাতিবাহিত করিত। তৎপরে আয়ুক্ষয়ে তাহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল,—এবারে তাহারা কালঞ্জর পর্ব্বতে সপ্তমৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল, মৃগজন্মেও তাহারা জাতিস্মর হওয়াতে পূর্ব্বজন্মের ও তৎপূর্ব্বজন্মের কথা এবং পাতক ভাবিয়া উদ্বিগ্নমানসে ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিল। আবার আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর এই সপ্তভ্রাতা জলবিহারী চক্রবাকযোনি লাভ করিল। জাতিস্মর থাকাতে তাহারা শরদ্বীপে মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন কাটাইয়া মৃত্যুর কোলে দেহ ঢালিয়া দিল। তৎপরে মানস-সরোবরে ঐ সপ্ত ভ্রাতাই হংস হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল এবং জাতিস্মর থাকায় যোগাবলম্বন করিয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময়ে একদা নৃপতি শ্রীমান্ বিভ্রাজ অন্তঃপুরচরে পরিবৃত হইয়া

সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে ঐ সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে একজনের একান্ত অভিলাষ হইল যে, ঐরূপ রাজা হইয়া বিচরণ করা বড়ই সুখের কার্য্য; আমি যদি ঐরূপ রাজা হইতে পারি, তবে বড়ই সুখী হই। এইরূপ ভাবিয়া সে কথা সে প্রকাশ করিয়া বলিল; তচ্ছ্রবণে অন্য আর দুইজন বলিল, তুমি যদি রাজা হও, আমরা তোমার মন্ত্রী হই। বাস্তবিক এই নিরশন যোগাচরণ অপেক্ষা উহাতে আনন্দ আছে, সন্দেহ নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রথম হংস বলিল,—কি দুর্ভাগ্য! যখন তোমরা যোগ-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া এইরূপ কামনা করিলে, তখন নিশ্চয়ই দেহান্তে কাম্পিল্য নগরের রাজা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! সাধ করিয়া আবার লৌহশৃঙ্খল পায় পরিধান করিলে! তখন তাহাদিগের জ্ঞান হইল, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কহিল ভ্রাতঃ! আমাদিগের উপায় কি হইবে? তাহাতে হংস উত্তর করিল, মানস-সরোবরে যে কামনা করিয়াছ, তাহা হইবেই। তুমি রাজা হইবে এবং তোমার সমুদয় জীবের কণ্ঠস্বর বুঝিবার ক্ষমতা থাকিবে ও শ্লোক শুনিলে তোমাদের তিনজনেরই শ্রেয়োলাভ হইবে, ইহা আমি যোগাবলম্বনে জানিতে পারিয়াছি।

অতঃপর এক সময়ে সকলেই দেহ পরিত্যাগ করিল। যে হংস রাজা হইবার কামনা করিয়াছিল, সে কাম্পিল্যরাজ অনুহের পুত্র হইয়া ব্রহ্মদত্ত নাম ধারণ করিল,—এবং মন্ত্রী হইবার জন্য যাহারা বাসনা করিয়াছিল, তাহারা দুই জনে দুই মন্ত্রীর পুত্র হইয়া জন্মিল। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। অসিত-দেবলের কন্যা সন্নীতি ব্রহ্মদত্তের সহধর্ম্মিণী হইলেন। ব্রহ্মদত্ত রাজা ও তাঁহার পূর্ব্ব ভ্রাতৃদ্বয় মন্ত্রী হইলেন, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের কথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

অবশিষ্ট চারিটী পক্ষী ঐ কাম্পিল্য নগরেই এক বেদ-বেদাঙ্গ পরায়ণ

সুদরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-জন্মের জ্ঞানোদয় বশতঃ তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! আমরা সংসার-বন্ধন ছেদন কামনায় বন-গমন পূর্ব্বক যোগাবলম্বন করিব। তচ্ছ্রবণে তাঁহাদের পিতা বলিলেন, আমি তোমাদিগকে স্নেহে লালনপালন করিয়াছি, সম্মুখে আমার বৃদ্ধ কাল; আমার দরিদ্র-জ্বালা মোচন ও পিতৃসেবা করা তোমাদের কর্ত্তব্য। তাহাতে ঐ চারি ভ্রাতা বলিলেন, পিতঃ! আপনাকে একটি শ্লোক বলিয়া দিতেছি, ঐ শ্লোকটি মহারাজ ব্রহ্মদত্ত-সকাশে গিয়া পাঠ করিলেই তিনি আপনাকে প্রচুর ধন দান করিবেন। তাহাতেই আপনার চিরদারিদ্র্য মোচন হইবে। এই কথা বলিয়া পিতাকে শ্লোক শিখাইয়া দিয়া তাঁহারা যোগমার্গাবলম্বন জন্য বন-গমন করিলেন।

এদিকে একদা রাজা ব্রহ্মদত্ত সহধর্ম্মিণী সন্নীতিসহ উপবন ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে সুন্দরী সন্নীতি সহসা উচ্চহাস্যের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে রাজা কহিলেন, চারুনয়নে! ঐ যে ক্ষুদ্র পিপীলিকা চীৎকার করিতেছে, শুনিতে পাইতেছ ও তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে একান্ত মোহিত হইয়া, তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে। স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া তদীয় মহিষী কোপ-ভরে পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। আমার এ ছার জীবনে কাজ নাই। তখন রাজা বলিলেন, সত্যই বলিতেছি, পিপীলিকা ঐ কথা বলিতেছে, এবং সেই জন্যই আমি হাসিয়াছি। তখন রাণী কহিলেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। মানুষে কখনই পিপীলিকার কথা বুঝিতে সক্ষম হয় না। যদি হয়, তবে আমাকেও পিপীলিকার কথা শুনাইতে হইবে, নতুবা তোমারই পায়ের উপর নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব।

রাজা তখন নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া শুদ্ধচিত্তে সপ্তাহকাল যোগাবলম্বন পূর্ব্বক নারায়ণে চিত্তার্পণ করিয়া রহিলেন। আকাশবাণী হইল,—"কল্য প্রাতে তোমার শ্রেয়ো-লাভ হইবে।"

এ দিকে সেই বিপ্র-চতুষ্টয়ের পিতা পুত্রগণের নিকট হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া সচিব-সহচর রাজাকে শ্লোক শুনাইবার জন্য অবসর অনু-সন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত অবসর পাইতেছিলেন না। অনন্তর নরপতি নারায়ণ দত্ত বর লাভ করিয়া স্নানান্তে প্রফুল্লচিত্তে সুবর্ণ রথা-রোহণে পুরমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রী-সহচর নরপতিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক শ্লোক পাঠ করিলেন ;—

"সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে॥
তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতো দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত॥"

"মহারাজ! যাহারা দশার্ণনগরে সপ্তব্যাধ, কালঞ্জর গিরিতে সপ্তমৃগ, শরদ্বীপে সপ্তচক্রবাক এবং মানস-সরোবরে সপ্তহংস হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলি, তাহাদিগের মধ্যে আমরা কুরুক্ষেত্রে বেদপারদর্শী সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ হইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করিলাম, কিন্তু তোমরা তিন জন আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ।"

ব্রাহ্মণের মুখে শ্লোক শুনিবামাত্র রাজা ও রাজমন্ত্রীদ্বয় মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। মূর্চ্ছান্তে তাঁহার দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। তখন সেই ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন এবং পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করতঃ সস্ত্রীক রাজা মন্ত্রীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া যোগাবলম্বন জন্য যাত্রা করিলেন।

ঐ শ্লোক দুইটি পিত্রাদির শ্রাদ্ধকালে এখনও শ্রাদ্ধমাহাত্ম্যকীর্ত্তন জন্য পঠিত হইয়া থাকে।

এই উপাখ্যানটীতে তোমার প্রশ্নের উত্তর অতি বিশদ ভাবেই আছে। মানুষ বাসনাদ্বারা সমাকৃষ্ট হইলে পূর্ব্বজন্মের কথা ভুলিয়া যায়। তিন জন বাসনাতে আকৃষ্ট থাকিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল,—তাহারা পূর্ব্বজন্মের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, আর যাহারা বাসনাবিষ্ট হয় নাই, তাহাদের সকলই স্মরণ ছিল। ইহজীবনেই যদি কোন একটি বিশিষ্ট বাসনাতে অভিনিবিষ্ট থাকা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বকৃত সমুদয় স্মৃতিই তাহাতে নিমজ্জিত থাকে। যখন কোন একটা কঠিন সমস্যার জটিলতা ভেদ করিতে বাসনা হয় এবং তদ্গত-চিত্ত হওয়া যায়—তখন কি আর কিছু মনে থাকে? তৎপরে সে অবস্থা অপনোদিত হইলে, আবার পূর্ব্ব বিষয় সমুদয় স্মরণ হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের কথা স্মরণ করিতে হইলে আধ্যাত্মিক সাধনা চাই;—সেই জন্য রাজা যে কারণেই হউক, সপ্তাহ যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক নারায়ণে সমর্পিতচিত্ত থাকার পরই ঐ শ্লোক শ্রবণে তাহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে পারিয়াছিল।

পূর্ব্বজন্মাদির কথা জানিতে ইচ্ছা করিলে, আধ্যাত্মিক বল লাভের চেষ্টা কর। বাসনাদি বিদূরিত কর। অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আলোচনা কর,—সমস্তই জানিতে পারিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

স্বর্গ, নরক এবং জন্মান্তর গ্রহণ।

শিষ্য। ভগবদ্গীতার যে শ্লোকটী ইতিপূর্ব্বে একবার আবৃত্তি করিয়াছেন তাহাতে আমার চিত্তে একটা বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

গুরু। কোন্ শ্লোক ?

শিষ্য।—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

এই শ্লোকে ত ইহাই প্রকাশ হইতেছে যে "যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া, অভিনব দেহ পরিগ্রহ করেন।"

এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, গীতার কথায় বলিলেন—নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া তবে জীবাত্মা পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অন্যত্র স্বর্গ ও নরক ভোগ প্রভৃতির কথাও আছে। মোক্ষ আছে,—নির্ব্বাণ আছে, এক্ষণে কোন্ কথা স্থির করি ?

গুরু। গীতার ঐ কথায় এবং অন্যান্য কথায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে লিঙ্গদেহে অন্বিত হন। লিঙ্গ-দেহ আশ্রয় করিয়া স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন এবং ঐ লিঙ্গদেহে ভূর্লোকে অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী হইতে অন্তরীক্ষ লোকে গমন করেন। এই স্থানকে প্রেতলোক কহে। প্রেতলোকে গিয়া পাপের ফলভোগ করিতে হয়। তৎপরে পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য স্বর্গলোকে গমন করেন। সেথানে পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে তখন কর্ম্মক্ষয়

হইয়া তাঁহার যে সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারকে অদৃষ্ট বলে; সেই অদৃষ্ট লইয়া জীব আবার ঐ পথে জগতে আসিয়া গর্ভ কটাহে প্রবিষ্ট হইয়া স্থূলদেহ ধারণ করে।

শিষ্য। কতদিন বা প্রেতলোকে এবং কতদিন বা স্বর্গলোকে বাস হয়?

গুরু। তাহার কি কোন প্রকার স্থির আছে? যাহার যেমন কর্ম্ম—সে তত সময় বাস করে। মনে কর, গোপীনাথ অধিক পাতক ও অল্প পুণ্য করিয়াছে, সে প্রেতলোকে অধিক দিন বাস করিয়া অল্পদিনের জন্য স্বর্গলোকে বাস করতঃ কর্ম্মভোগ করিল। আর রাখাল অধিক পুণ্য ও অল্প পাপ করিয়াছে, সে আগে অল্প পাপকর্ম্মের ফলভোগ জন্য প্রেত-লোকে বসতি করিয়া দীর্ঘকাল স্বর্গবাস করিয়া কর্ম্মভোগ করিল। তৎপরে এই মরজগতে আবার ঘুরিয়া আসিল।

শিষ্য। এমন যদি কেহ থাকে যে, সে আদৌ পুণ্যকর্ম্ম করে নাই; সে তবে কি প্রকারে স্বর্গে যাইবে? সে স্বর্গে না গিয়াই কি মরজগতে ফিরিয়া আসিবে?

গুরু। না, তাহা হইতে পারে না। স্বর্গে গিয়া তবে অদৃষ্ট গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু এমন লোক নাই যে, একটুকুও পুণ্যকর্ম্ম না করিয়াছে,—যে জাল জুয়াচুরি করে, সে তাহার পরিবারবর্গকেও খাইতে দেয়। সেও একটু পুণ্য।

শিষ্য। যে পাপ না করিয়াছে—সে ব্যক্তিও কি ভুবর্লোক দিয়া স্বর্গে যায়?

গুরু। হাঁ,—যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা যোগী, তাঁহারা সেই পথে যায় বটে,—কিন্তু স্বর্গাদি তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নহে, তাঁহারা দ্রুত গতিতে স্বর্গ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া যায়।

শিষ্য। মোক্ষ হইলে বুঝি আর তাঁহার কিছুই থাকে না।

গুরু। কিছুই থাকে না, অর্থ কি ?

শিষ্য। ভগবানে মিশিয়া যায়।

গুরু। না, মোক্ষ হইলে আর পৃথিবীতে আসা যাওয়া করিতে হয় না। কিন্তু তখনও জীবাত্মার কার্য্য শেষ হয় না। তবে গুণের অতীত হয়েন।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮শ অঃ, ৪০ শ্লোঃ।

পৃথিবী বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয় বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বর্গলোকের উপর জনলোকে মোক্ষবাসিগণ বাস করিয়া থাকেন, সুতরাং সেখানে গুণাদি নাই।

শিষ্য। জীবের স্বর্গ-নরকাদি কি প্রকারে ভোগ হইয়া থাকে ?

গুরু। বাসন-মত ফললাভ হয়, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম ভোগ—যে যেমন কার্য্য করিয়াছে, যেমন বাসনা করিয়াছে—তদনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হয়। পাপের সূক্ষ্মাংশে জ্বালা, পুণ্যের সূক্ষ্মাংশে সুখ,—এ সকল বিষয় যাহারা এই জড়জগৎ পরিত্যাগ করিয়া সেই দেশে গিয়াছে, পরে তাহারা যে সকল সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাই শুনিও।

শিষ্য। কর্ম্মফল-ভোগান্তে জীব কেমন করিয়া আবার গর্ভ কটাহে আসিয়া অধ্যাসিত হয় ?

গুরু। সে বিচিত্র লীলা,—অদ্ভুত কাণ্ড। সংস্কার সূত্রে গ্রথিত হইয়া সেই সকল বাসনা-বিদগ্ধ জীবাত্মা চন্দ্রমণ্ডল হইতে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে।

শিষ্য। তখন কি তবে তাহারা জড়শক্তি হয় ?

গুরু। শক্তি কি কখনও জড় হয়? ইন্দ্রিয় বিকাশ না হইলেই তাহার পক্ষে শক্তি জড়। নচেৎ বিশ্বই চৈতন্য-শক্তিপরিপূর্ণ। তখন জীবাত্মার ইন্দ্রিয় থাকে না বটে, তবুও মনের সাহায্যে চৈতন্যময় থাকে। আত্মজ্ঞানই জড়-শক্তি-চৈতন্যের প্রতিপাদক। সেই অবস্থায় যে যেমন কার্য্য করিয়া, ফলভোগান্তে অদৃষ্ট বা সংস্কার সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে সেইপ্রকারে দ্বাদশরাশি এবং গ্রহগণ বিশেষতঃ চক্রাধিষ্ঠিত সোম শক্তিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া—সেই সংস্কার অনুসারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাতৃ-গর্ভে মিশায়।

শিষ্য। কি ভাবে কি হয় তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত যে পঞ্চাগ্নিরূপ যজ্ঞ হয়, তাহা হইতে দিবা রাত্রি হয়। নীহারিকাময়ী প্রকৃতি যখন বিপরীত শক্তি বশতঃ (সংস্কার) গাঢ় হইয়া সৌরজগতে রূপ ধারণ করিয়াছিল, তখন হইতেই দ্যুলোকে অগ্নিক্রিয়া আরম্ভ হয়। দ্যুলোকস্থ অগ্নি আদিত্য-নিহিত পরমাণু-পুঞ্জরূপী সমিধকে দাহমান করিয়া, ধূমরূপিণী রশ্মিকণার সৃষ্টি করে। দিবা তাহার স্পন্দন। সেই স্পন্দন হইতে চতুর্দ্দিকের চৈতন্য উদ্ভূত হয় এবং সেই চারিদিকের উপরিভাগ তাহার স্ফুলিঙ্গ। এক এক-দিকের অধিষ্ঠিত চৈতন্য দিক্‌পাল দেবতা। এইরূপে মহাকালের চৈতন্য হইতে কালের চৈতন্য হয়, এবং তাহা হইতে দেশ কাল পাত্রাপাত্রের জ্ঞান হয়। সেই দেবতাগণ যজ্ঞে ভক্তির আহুতি দিয়া থাকেন, তাহাই সৃষ্টির মূল। অগ্নি শীতল হইয়া সোমরূপে দেখা দেয়।

"এই পঞ্চাগ্নির কথা উপনিষদে আছে। কাল এবং গতির বিভাগ হইয়া, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং দ্বাদশরাশি সংক্রমণের প্রণালী সৃষ্টি হয়। স্বর্লোকে পর্জ্জন্য দেবতাই অগ্নি এবং অগ্নি ও সোমের প্রক্রিয়ায় ঋতুর সৃষ্টি হয়। সংবৎসর সমিধ। মেঘ তাহার ধূম এবং চপলা তাহার স্পন্দন। পর্জ্জন্য দেবতা বৎসরটিকে পুড়াইতে চাহেন, কিন্তু দেবগণ সেই যজ্ঞে

স্নিগ্ধ সোমরাজকে আহুতি দিয়া, বারির সৃষ্টি করেন। পুনরায় সেই জ্ঞানাগ্নিতে ভক্তির আহুতি। ভক্তি আত্ম বলিদান দেয়, জ্ঞান তাহা খাইয়া সন্তুষ্ট হয়। এই আনন্দই সৃষ্টির মূল।

পিতৃলোকে (ভুবর্লোকে) মানবাত্মা অগ্নি। যে প্রাণ স্বর্লোকে পর্জ্জন্যরূপী তাহাই ভুবর্লোকে আত্মরূপী। মানবের কামদেহ তাহার সমিধ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বায়ু তাহার ধূম, বাক্ তাহার স্পন্দন, চক্ষুর্দ্বয় তাহার জ্বলন্ত অঙ্গার এবং শব্দ তাহার স্ফুলিঙ্গ। এই মহাহোমে দেবগণ আনন্দ সংস্কাররূপী অন্ন আহুতি দিয়া থাকেন।

ভূর্লোকে নারী অগ্নিস্বরূপা। প্রকৃতিই নারী, এবং প্রকৃতিগত-শক্তি তাহার অগ্নি। নিম্নভাগ সমিধ। ইন্দ্রিয়গণ (মন প্রভৃতি) তাহার স্পন্দন। কামোপভোগ (বিষয়োপভোগ জনিত স্পৃহা) তাহার স্ফুলিঙ্গ। দেবগণ সেই হোমে সংস্কার বর্ষণ করেন। ইহা হইতে মানবের সৃষ্টি হয়।

সেই মানবের দেহ পুনরায় জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সংস্কৃত হইলে জীবাত্মা নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধগামী হয়।

শিষ্য। ইহা একটা সুমহান প্রহেলিকা।

গুরু। যাহার রূপ জড়চক্ষে দৃষ্ট হয়, তাহাই সত্য, এবং মনশ্চক্ষে অনুমিত হইলেই প্রহেলিকা বা রূপক। জড়-জগতে ঋতু প্রভৃতির অনুভূতির ও অতীন্দ্রিয় জগতে স্নেহ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির অনুভূতি পদার্থটি একই; কিন্তু ক্ষেত্রের তারতম্যে উহাদিগের রূপ এবং নাম স্বতন্ত্র। জ্ঞান-সূর্য্যের উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন ও মনোরূপী-চন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঠিক জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবদ্ধ। উহাদিগের প্রভেদ এই যে, আত্মা (সূর্য্য) স্বক্রিয়, এবং যদিও সংস্কারাবদ্ধ আত্মা কেন্দ্রস্থ জড়-সূর্য্যের ন্যায় আকর্ষণের দাস, কিন্তু আবার কোন মহাসূর্য্য তাহাকে টানিতেছে এবং তাহা হইতেই ব্রহ্মলোকের গতি।

শিষ্য। শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি, জীবাত্মা দেবযান ও পিতৃযানের পথে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু কি করিয়া যায়,—তাহা বুঝি না। অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন।

গুরু। অয়নাংশে গতিবিশিষ্ট। জড়-সৌর-জগতে জীব (পৃথিবী প্রভৃতি) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ; চন্দ্রও তাহার সহিত ঘুরে। কিন্তু সূর্য্যের সহিত এই সৌর-মণ্ডল যে মহাসূর্য্যের অয়নে ভ্রাম্যমাণ তাহাই উপনিষদের উক্তি—এক একটি সৌরজগৎ; তবে বুঝাইতে গেলে উল্‌টা বুঝিতে হয়। যাহারা মোটামুটি গৃহস্থ, তাহারা ন্যূনকল্পে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিজ কর্ম্মানুসারে সংস্কার গঠিত পূর্ণ ও সবল একটি সূক্ষ্ম দেহের সৃষ্টি করিয়া ক্রমে বার্দ্ধক্যের আমলে ধূম প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধারণ মানবের পক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাসই ধূম, তাই ধরিয়া তাহারা মৃত্যুনিশা অতিক্রম করে,—এবং তৎপরে চন্দ্রের কৃষ্ণভাগে যায়।

“তরণি কিরণ-সঙ্গাদেব-পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালা-কুন্তল-শ্যামল-শ্রী-
র্ঘট ইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ॥”

—গোলাধ্যায়।

“অমৃতকিরণবর্ষী চন্দ্র স্বয়ং তেজোময় নহে। সূর্য্যের সম্মুখ দিক্‌স্থিত চন্দ্র, সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা প্রতিভাত হইয়া আলোকিত হইয়া থাকে। পরন্তু রৌদ্রস্থিত ঘটের (বিপরীতাংশ) যেমন সেই ঘটের নিজের ছায়া দ্বারা আবৃত হয়, তদ্রূপ চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যের পশ্চাদ্দিকে (সর্ব্বদাই) স্থিত হয়, সেই অংশ বালা স্ত্রীর কেশের ন্যায়। চন্দ্রের এই অপর পৃষ্ঠে পিতৃগণ বাস করেন। পিতৃগণের মধ্যাহ্নকাল আমাদিগের অমাবস্যা। আমাদিগের এক চান্দ্রমাসে তাঁহাদিগের এক অহোরাত্র।”

যে জীবের মন সূর্য্যপ্রভা (প্রজ্ঞাপ্রভা) দ্বারা আলোকিত হয় নাই, তাহারা কাজেই দক্ষিণায়ন বিশিষ্ট, এবং তাহাদিগের সংস্কার চন্দ্রলোকের কৃষ্ণভাগ হইতে গলিত হয়। ফলকথা তাহাদিগের আত্ম-চৈতন্য হয় নাই। তাহারা তমসাবৃত এবং চন্দ্রে থাকিলেও দেবগণের ভক্ষ্য। ইহা-দিগকে জড় প্রকৃতির সংস্কার বলিতে পারা যায় এবং তাহাই দেবগণে খাইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সংস্কারগুলি পিতৃরূপে আকাশে আসে, সেখান হইতে হোমে প্রদত্ত হইয়া বায়ু ও উষ্ণতার সংস্পর্শে মেঘোৎপত্তি করে এবং সেখান হইতে পৃথিবীর গর্ভে রোপিত হয়। দেহই পৃথিবী, সেখানে এক সংস্কার-রূপী অন্ন ভক্ষিত হয়, এবং জ্ঞানাগ্নিতে পুনরায় তাহা নারী (ইন্দ্রিয়) হইতে সন্তান-স্বরূপে দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ করে।

শিষ্য। সংস্কারের এত ঘুরিবার কারণ কি ?

গুরু। শক্তির একটা সংক্রমণ প্রণালী আছে। মানবদেহরূপী ইন্দ্রিয়াধারে পূর্ব্ব-সংস্কাররূপী পর্জ্জন্য দেবতার যজ্ঞ কৌশলে বৃষ্টি না হইলে, জীবের আত্মজ্ঞান লাভ জন্য আনন্দ হয় না।

শিষ্য। দেবযান ও পিতৃযানের পথ কাহাকে বলে ? এবং জীব সে পথে কি প্রকারে গমন করে ?

গুরু। এই দেবযানের পথ যোগান্তর্গত। যখন জীবদেহ আভ্যন্ত-রিক প্রাণরূপী শক্তি হইতে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ জীব, ইহলোকের কথায় যখন মরে, তখন বদ্ধাত্মা ধূম অবলোকন করে। আর যোগিগণ জ্যোতিঃ অবলম্বন করেন। ধূম গুণবিশিষ্ট,—জ্যোতিঃ গুণের অতীত। প্রথমে স্থূলদেহে যোগিগণ বায়ু-সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, জ্যোতির স্পন্দন স্থির করেন। ধূম কিম্বা মায়া উৎপন্ন হইতে দেন না। কোন প্রজ্বলিত দীপে বহির্বায়ু সংযোগে ধূমের উৎপত্তি হয়, কিন্তু আবার যদি আভ্যন্তরিক অন্য একটি শক্তি সংযোগে সেই ধূমের কারণটাকে সংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ

প্রদাহ উৎপন্ন করা যায়, তবে নির্ধূম জ্যোতিঃ স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই জ্যোতিঃই জ্ঞান। ইহা অন্তর্নিহিত শক্তি ;—জ্বলন্ত অগ্নি। ইহার পথে প্রথমে 'দিবা' তৎপরে চন্দ্রের শুক্লদিক ; অর্থাৎ স্থির, নিশ্চল, সূর্য্য প্রভাসিত মন। তৎপরে উত্তরায়ণ, শীত হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত ও গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত। যোগিগণ এই পথকে 'পিঙ্গল' কহিয়া থাকেন। শীত (বিশুদ্ধ) হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীষ্ম (অগ্নি) পর্য্যন্ত যে সংক্রমণ তাহা উত্তরায়ণ। আত্মসংযম, দান, পুণ্যাদি, নিয়ম, ধীর, আসন, প্রাণসংযম ও গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাধনা করিলে জীব সুষুম্নাবর্ত্মে (আজ্ঞাচক্রে) আসে, এবং সেই স্থান হইতে জ্যোতিকে টানিয়া লয়। এই জ্যোতির নাম কুণ্ডলিনী ; অন্তর্নিহিতা-শক্তি। যাহা দ্বারা আত্মসংবরণ (প্রাকৃতিক বাহ্যাকর্ষণ সংবরণ) করা যায়। তুমি বোধ হয়, জান যে পৃথিবীর মধ্যশক্তিটাকে প্রবুদ্ধ করিয়া যদি কোন প্রকারে সূর্য্যলোকে লওয়া যাইত, তবে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হইয়া পিণ্ডের ন্যায় লীন হইয়া যাইত ; চন্দ্রও আকর্ষণ-বিচ্যুত হইয়া সূর্য্যে গিয়া মিশিত। এরূপ ঘটনা জড় সৌরজগতে এখনও হয় নাই! অতীন্দ্রিয় সৌর জগতে হইয়াছে। উত্তরায়ণের শেষে এরূপ একটা আকর্ষণ উপস্থিত করিতে পারিলেই প্রাণ কুণ্ডলিনী-শক্তির সহযোগে অর্চ্চিপথ প্রাপ্ত হয়। কুণ্ডলিনীর দুইটী স্পন্দন আছে ; তাহাই জীবের দুইটী নিশ্বাস ; কিম্বা চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণ এইটাকে না নামাইলে কুণ্ডলিনী শক্তি নিশ্চয়ই দুই পথে হেলিতে দুলিতে থাকে। ইহার ফলে পিতৃযানের পথ সৃষ্টি হয়। কিন্তু উদ্বোধিতা শক্তি স্পন্দন মুক্ত হইলে, জ্যোতির্বর্ত্মে সূর্য্যলোকে যাইবে। প্রথমে এই প্রক্রিয়া দ্বারা যোগিগণ দ্বাদশ রাশি, অর্থাৎ চন্দ্র প্রভৃতির আকর্ষণ এড়াইয়া, কিম্বা কাল, দেশ প্রভৃতি চৈতন্য এড়াইয়া শীর্ষস্থানীয় সূর্য্যমণ্ডল বা সহস্রারে আসেন। সেখানে উদ্বোধিতা শক্তি

চপলার ন্যায় শোভা পায়। নেত্র প্রস্ফুটিত হয়। সেখানে যোগিগণ ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রাপ্ত হন, এবং সেখান হইতে গুরু-রূপী মহাপুরুষ জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।

শিষ্য। যে প্রকার যোগাবলম্বন করিলে, এই সকল সাধন সিদ্ধ হয়, তাহা আমাকে শিক্ষা দিন।

গুরু। যোগ-শিক্ষা নিতান্ত কঠিন বিষয় নহে। উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা-প্রণালী জানিতে পারিলে, সহজেই যোগানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মাকে মুক্ত করিতে পারিবে। এই পৃথিবীতে থাকিয়া যোগাশ্রয়ে সমস্ত লোকের সংবাদ অবগত হইতে পারিবে, যোগাবলম্বনে দূরদূরান্তরের সংবাদ লইতে পারিবে। কিন্তু এখনও আমাদের বক্তব্য বিষয়ের শেষ হয় নাই, এখন এই বিষয়েই আলোচনা হউক। জীবাত্মা, জন্মান্তর, পরলোকের সংবাদ এই সমুদয়ে দৃঢ় জ্ঞানবিশিষ্ট হও,—তৎপরে সময়ান্তরে যোগের বিষয় অবগত করাইব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

উদ্ভিদাদির আত্মা আছে কি না?

শিষ্য। বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্ব্বত প্রভৃতির কি আত্মা আছে?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন? ইউরোপীয় উদ্ভিদ-বিদ্যার সমধিক চর্চ্চার ফলে এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রাণিগণের যেরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হইয়া সন্তান উৎপত্তি হয়, উদ্ভিদেরও সেইরূপ স্ত্রী-কেশরে পুং-রেণু (পরাগ) পতিত হইয়া বীজ জন্মে, এবং উহাদেরও মরা বাঁচা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই বর্ত্তমান আছে।

গুরু। মনু বলিয়াছেন,—

"উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ড প্ররোহিণঃ"

"উদ্ভিজ্জ ও স্থাবর পদার্থসমূহ বীজ ও কাণ্ড দ্বারা উৎপন্ন হয়।" স্ত্রী-কেশরে যে পুং-পরাগ অন্বিত হওয়ার কথা শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ,—উহা বীজোৎপাদন হেতু-সাফল্য ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ ক্রিয়াই জীবন-ধাতুর * উৎপাদন করিয়া থাকে। জীবন-ধাতুই উদ্ভিদ জীবনের মূলীভূত; এবং সেই জীবন-ধাতুতে জড়শক্তি ব্যতীত অপর কোনও সক্রিয় শক্তিপদার্থ নাই। বিশেষতঃ প্রত্যেক উদ্ভিজ্জে অসংখ্য জীবন ধাতুপুঞ্জ আছে। কোন বৃক্ষের কোন শাখা ছেদন করিলে, কতিপয় পুঞ্জ পৃথক্ হইয়া পড়ে; তাহাতে মূল বৃক্ষের কোন ক্ষতি হয় না বরং সেই ছিন্ন শাখা ভূমিতে রোপণ করিলে, তাহা হইতে এক নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব প্রত্যেক উদ্ভিজ্জের জীবন-ধাতু-পুঞ্জ সমস্ত স্বতন্ত্র রূপে ক্রিয়াশীল এবং উহারা পরস্পর কোন সাধারণ-সূত্রে সংবদ্ধ নহে। সুতরাং উহাদের সমষ্টিরূপে একত্ব নাই এবং উহাদের কোন অবস্থায় একত্ব জ্ঞান জন্মিয়া আত্ম-প্রত্যয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি উদ্ভিজ্জ মধ্যে কোনরূপ একত্ব থাকিত, তবে শাখা ছেদন দ্বারা তাহার ব্যাঘাত হইত এবং তাহাতে মূল-বৃক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি না হইলেও কোন ছিন্ন শাখায় নূতন একত্ব জন্মিতে পারিত না। অধিকন্তু উদ্ভিজ্জের আত্মা থাকিলে, প্রত্যেক বৃক্ষে অবশ্যই একটি মাত্র আত্মা থাকিত। কিন্তু আমরা কোন কোন বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া, তাহা হইতে

* জীবন শব্দে জীবনবিশিষ্ট জীবনপ্রদ, ও ধাতু শব্দে বৈদ্যক গ্রন্থ মতে শরীর ধারক বস্তু এবং শারীরিক ভাষ্য (বৌদ্ধ মত, ভামতী টীকা) অনুসারে শরীরান্তর্গত এমন এক পদার্থ, যাহা শরীরে নাম-রূপের অঙ্কুর স্থাপন করে, এবং যাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও ক্লেশবোধের কারণ যথা—যস্ত নামরূপাঙ্কুরমভিনিবর্ত্তয়তি, পঞ্চবিজ্ঞান-কায়সংযুক্তং সংশ্রবঞ্চ মনোবিজ্ঞানং সোঽয়মুচ্যতে বিজ্ঞানধাতুঃ।

অসংখ্য বৃক্ষ উৎপাদন করিতে পারি ;—অতএব উদ্ভিজ্জ সজীব পদার্থ হইলেও আত্মার আশ্রয় নহে।

শিষ্য। ওয়াট্ সাহেব বলেন যে, "কোন কোন উদ্ভিদ্ মধ্যে অনুভব শক্তির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ স্বরূপে তিনি কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—লজ্জাবতী-লতা, তেঁতুল, আমরুল এবং দার্জ্জিলিং, বেহার ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে মাংসাশী বৃক্ষ।"

গুরু। আমি মাংসাশী বৃক্ষ কখনও দেখি নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মিকা অভিজ্ঞতা আমার নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে তাহা অনন্ত ক্ষমতাশালিনী প্রকৃতিরই একটি ভৌতিক ক্রিয়া। ওয়াট্ সাহেবের "উদ্ভিদ্ বিদ্যার প্রথম সোপান" নামক পুস্তকের ৩৩০ পৃষ্ঠায় ঐ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে ; তাহা পাঠ করিয়া উহা ভ্রান্তমত বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। তিনি লিখিয়াছেন যে,—"দুইটি চারা পরস্পরের নিকট রোপণ করতঃ একটিকে পতঙ্গাদি প্রাণী পদার্থ দিয়া, অপরটিকে না দিয়া দেখিতে হয় যে, প্রথমটী দ্বিতীয়টীর অপেক্ষা অধিক বাড়ে কি না। এই প্রকার পরীক্ষা অনায়াসেই করা যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, যে চারা প্রাণি-পদার্থ বা পোকা পায়, তাহা অবশ্যই বাড়ে। অতএব অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হয় যে, সে জ্ঞান-পূর্ব্বক পোকাগুলি ধরিয়া ভক্ষণ করে।"

ঐরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে, নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটীও যুক্তিসংঙ্গত হয়। রাম পীড়া নিবন্ধন সংজ্ঞাহীন হইয়া প্রলাপ বকিতেছে। ঔষধ পথ্য ঐ অবস্থায় উদরস্থ হইয়া রোগের উপশম ও শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে।—"অতএব অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হয় যে, সে জ্ঞানপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য ভক্ষণ করিয়াছে।" ঐ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস,—সেই আবদ্ধ কীট, বৃক্ষাদির পাচকরসপ্রভাবে জীর্ণ হইয়া লীন হয়। ডাক্তার স্কালিঞ্জেনী একটা কাককে কিয়ৎ পরিমাণ মাংস ভক্ষণ করাইয়াই বধ

করেন। তাহার মৃত্যু-দেহ জীবিত পক্ষীর উষ্ণতায় ছয় ঘণ্টা রাখিয়া উদর খুলিলে দৃষ্ট হইয়াছিল যে, ভুক্তমাংস সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এস্থলে আত্মা ও জীবন বিহীন কাক-দেহ মাংস জীর্ণ করিতে পারিয়াছে। অতএব উদ্ভিজ্জ, আত্মাবিহীন হইলেও কেবল জীবন-ধাতুর প্রভাবে মাংস জীর্ণ করিতে পারে।

আর লজ্জাবতী প্রভৃতির অনুভব শক্তির কথা বলিতে ওয়াট্ সাহেব বলিয়াছেন,—"যদি তুমি তাহার (লজ্জাবতীর) কেবল একটী ক্ষুদ্র পত্র স্পর্শ কর, তবে তাহার সকল পত্র সঙ্কুচিত ও পরে সমস্ত ম্লান হইয়া পড়ে।" এই বাক্যটি যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা তুমি নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। লজ্জাবতীর কোনও পত্র ঈষৎ স্পৃষ্ট হইলে কখনই সঙ্কুচিত হয় না। অপেক্ষাকৃত কিছু বলের সহিত স্পৃষ্ট হইলে, পরস্পর সম্মুখীন দুইটি পত্রমাত্র মুদ্রিত হয়, এবং আরও অধিক বলে স্পৃষ্ট হইলে বৃন্তস্থ পত্রশ্রেণীদ্বয় সম্যক্ মুদ্রিত হয়, এবং বৃন্তটিও ঢলিয়া পড়ে। আমার ধারণা,—এই ঘটনার প্রকৃত কারণ পত্র ও বৃন্তের সঞ্চার নিবন্ধন জীবন-ধাতু প্রবাহের কথঞ্চিৎ স্থিরতা বা মন্দগতি। তেঁতুল আদির পত্র সন্ধ্যা সমাগমে মুদ্রিত হয়। ওয়াট্ সাহেবের মতে ইহাই উহাদিগের নিদ্রার লক্ষণ। কিন্তু তাহা আলোক ও তাপের ন্যূনতা নিবন্ধন জীবন ধাতুর জৈবনিক গতির শিথিলতা। বাস্তবিক এই সমস্ত ঘটনা হইতে উদ্ভিজ্জের জ্ঞান ও চিন্তা অনুমান করিলে, আমাদের আমাশয় এবং মাংসপেশীরও জ্ঞান এবং চিন্তা আছে, বলিতে হইবে। কারণ ভুক্তবস্তু পুষ্টিকর হইলে, আমাশয় তাহাকে সমুচিতকাল রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করে, কিন্তু পুষ্টিকর না হইলে, তাহা অগৌণে বহির্গত করিয়া দেয়, এবং মাংসপেশী কখন কখন এরূপ কম্পিত ও স্পন্দিত হয় যে, তাহা আমরা বিশেষ যত্ন করিয়াও নিবারণ করিতে পারি না।

অতএব উদ্ভিজ্জ ও স্থাবরাদির জ্ঞান, চিন্তা বা আত্মা নাই, ইহাই স্থির জানিও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

পশু-পক্ষীর আত্মা আছে কি না?

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, মানুষও পাপকার্য্য করিয়া পশুযোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়, (সপ্ত-ব্রাহ্মণ গো-বধ করিয়া ব্যাধ, চক্রবাক, মৃগ, হংস প্রভৃতি হইয়াছিল) কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানব ভিন্ন ইতর প্রাণীর আত্মা নাই। ডাক্তার ফ্রেচার, ডাক্তার ডিসড্রেল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনুষ্য ভিন্ন ইতর জন্তুর আত্মা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন,—"ইতর প্রাণীর আত্মা নাই, কেবল মন আছে।" ডাক্তার ফ্রেচারের মতে চিন্তা করিবার শক্তির নাম মন। তাহা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মন দৈহিক উত্তেজনীয় পদার্থের (স্নায়ু ও মস্তিষ্কের) সমুচিত উত্তেজন-প্রভাবে প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইহারা মনোবৃত্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, জ্ঞান এবং সংস্কার। তাঁহাদের মতে ইতর জন্তুর জ্ঞান নাই, কেবল সংস্কার আছে। সংস্কার একটি এমন স্বাভাবিক শক্তি, যাহা জগদীশ্বর হইতে সংস্কাররূপে উৎপন্ন হয়, এবং যাহার ক্রিয়া চিন্তা ব্যতীতই প্রকাশিত ও শিক্ষা ব্যতীতই নিশ্চিন্ত ও অভ্রান্তরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অথচ যাহা অভিজ্ঞতা বা পুনঃ সাধন দ্বারা কিছুমাত্র উন্নত বা পরিবর্ত্তিত হয় না। অতএব সংস্কারের মূলে কোনও স্বাধীন ও স্বক্রিয় পুরুষ নাই। তাহা বাস্তবিক এরূপ পরিবর্ত্তিতার শক্তি, যাহা চিরকাল প্রাকৃতিক ঘটনার অধীন থাকিয়া নির্জীব যন্ত্র

পুত্তলিকার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এক্ষণে এ সম্বন্ধে আপনার মত কি জানিতে চাই।

গুরু। কেবল আমার মত নহে,—আমাদের শাস্ত্রেরই মত যে, ইতর প্রাণীরও আত্মা আছে। মনুষ্যের যে সকল গুণ বা ক্রিয়া আছে, ইতর প্রাণীতেও তাহা বিদ্যমান। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথা যাহা বলিলে, এবং তাঁহাদের যে মত শুনিয়াছ তাহা যে ভ্রমসঙ্কুল নহে, তাহা বলিতে পারি না। তুমি যে সংস্কারের কথা বলিলে, শিক্ষার দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, সুতরাং তাহাকে জ্ঞান বলা যাইতে পারে। হস্তী বন্য-জন্তু। তাহারা বনে থাকিলে কোনও কালে মনুষ্যের কথা বুঝিতে পারে না; কিন্তু কতিপয় দিবস মনুষ্যের সংস্রবে থাকিলে মানব-কথা বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে। কাশ্মীরের মহারাজা, রাজপুত্র প্রিন্স অব-ওয়েলস্‌কে লইয়া নিজরাজ্যে হস্তিশিকারে গমন করিয়াছিলেন। তখন বিজলী-নামক হস্তীকে কোন বন্যহস্তীর দেহোপরি সম্মুখের দুই পদ উঠাইয়া ও তাহার ঘাড়ে কামড় দিয়া যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছিল। ঐরূপ যুদ্ধ-কৌশল কেবল শিক্ষারই ফল। কুকুর-বানর প্রভৃতিও সংস্কার ও শিক্ষ দ্বারা উন্নত হইতে পারে।

শিষ্য। তাঁহাদের মতে কোনও ইতর জন্তু আপনা হইতে নিজ সংস্কারে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য তাহা করিতে পারে। অতএব ইতর জন্তুর আত্মা মনুষ্যের আত্মার ন্যায় কোনও স্বাধীন ও সক্রিয় পুরুষ নহে। সুতরাং তাহাকে আত্মাই বলা যাইতে পারে না।

গুরু। আত্মোৎকর্ষসাধিনী শক্তি একটী অমিশ্র বৃত্তি নহে,—উহা অনুচিকীর্ষা, কল্পনা ও কৌতূহল প্রভৃতি সমবেত এবং সমঞ্জস কার্য্যের ফল। যদি কোন মনুষ্যকে এমন ভাবে রাখা যায় যে, সে মানব-সমাজের কার্য্যাদি অনুকরণ করিতে কিছুমাত্র সুযোগ না পায়, তবে তাহার

আত্মোৎকর্ষসাধিনী শক্তি প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। এই হেতু জন্মান্ধ ও জন্মবধিরকে এককালে নির্ব্বোধ দেখা যায়। অতএব অনুচিকীর্ষাই আত্মোৎকর্ষ সাধনের মূল। ইহা অনেক ইতর জন্তুরও আছে। বানর ও ময়না তজ্জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাদের অনুচিকীর্ষাও মনুষ্যের অনুচিকীর্ষার ন্যায় স্বাধীন ও সক্রিয়। কারণ, অনুচিকীর্ষাবৃত্তি নিজে অনুকরণীয় বিষয়ের জ্ঞান গ্রহণ না করিলে, তাহা আপনা হইতে যাইয়া উহার আয়ত্ত হইতে পারে না। অনুচিকীর্ষার ক্রিয়া আরম্ভ করিলে, কল্পনা কৌতূহল প্রভৃতি আরও কতিপয় বৃত্তি তাহার সহকারী হইয়া জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করে। সেই কল্পনা এবং কৌতূহল কোন কোন ইতর জন্তুরও আছে। শিকারী কুকুর যে কল্পনা প্রভাবে স্বপ্নে স্বীকার করিয়া থাকে তাহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। ইতর জন্তুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ আপাততঃ আহারান্বেষণার্থই বোধ হয়। কিন্তু পুষিয়া যথেষ্ট আহার দিলেও উহাকে পর্য্যটন করিতে দেখা যায়। কপোত-শাবক খোপের মধ্যে প্রচুর খাদ্য পাইলেও আপনা হইতে সময় ক্রমে বাহিরে আইসে। কুকুর আপন প্রভুর পর্য্যটন বেশ দেখিলে নিজে তাঁহার সঙ্গে বিচরণ করিতে পারিবে মনে করিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হয়। ঐ সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য, নূতন নূতন বিষয় দেখিবার ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শিষ্য। যদি মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুরও মনোবৃত্তি থাকে, তবে উহারা মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হয় না কেন?

গুরু। পরীক্ষা ও পরিদর্শনে জানা গিয়াছে যে, কোন কোন ইতর জন্তুর বহিরিন্দ্রিয় যে মনুষ্যের অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যথা—কুকুর ও পিপীলিকার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শকুনির দর্শনেন্দ্রিয়, কুকুর ও বিড়ালের শ্রবণেন্দ্রিয় ইত্যাদি। কোন কোন বিশেষ মনোবৃত্তি ধরিলেও কোন কোন ইতর জন্তুকে মনুষ্য অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। আমেরিকার কৌতুকীপক্ষীর (mecking bird) ন্যায় অনুকরণশীল মনুষ্য আছে কি না, সন্দেহ স্থল। কিন্তু ইতর জন্তুর অধিকাংশ মনোবৃত্তিই অপরিস্ফুট এবং কোন কোনটি সমুচিতরূপে বিকশিত হইলেও অন্যান্য সহকারী বৃত্তির সাহায্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উহাদের ক্রিয়া সমুচিতরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। সতীত্ব,কৃতজ্ঞতা, যুক্তি, বিবেক, ভক্তি, দয়া, মায়া, ন্যায়পরতা ও বাক্‌শক্তি প্রভৃতি দেবভাব বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ঐ সমস্ত গুণ একত্রে না হউক্‌, দুই একটী করিয়া অনেক ইতর জন্তুতেও দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ এরূপ অনেক মনুষ্য আছে, যাহাদের ইহার মধ্যে কোন একটি গুণও আছে কি না সন্দেহ। কপোতী ও মধুমক্ষিকা রাণী প্রকৃত সতী। তন্মধ্যে মধুমক্ষিকা-রাণী সতীধর্ম্ম পালন করিয়া থাকে। কুকুরের যে কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, যুক্তি প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। মিষ্টার লার্ডনারকৃত "মিউজিয়ম্ অব সায়েন্স এণ্ড আর্ট" নামক গ্রন্থের একটি ঘটনা এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। কোন প্রহরী কুকুর সর্ব্বদা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিত, কিন্তু উহার গলাসী এরূপ বৃহৎ ছিল যে, তাহা হইতে নিজেই মস্তক বহিষ্কৃত ও তাহাতে প্রবিষ্ট করিতে পারিত। কিন্তু দিবসে ঐরূপ করিলে পাছে রক্ষক গলাসী আটিয়া বাঁধে, এই ভয়ে তাহাকে কখনও শৃঙ্খলবিমুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখা যাইত না। পক্ষান্তরে সে, রাত্রিতে শৃঙ্খল খুলিয়া নিকটবর্ত্তী মাঠে পর্য্যটন করিত এবং তথাকার খোয়াড়স্থিত মেষপালের উপর ভয়ানক দৌরাত্ম্য করিয়া, তাহাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিত এবং দুই একটাকে বধও করিয়া ফেলিত। পাছে মুখে রক্তের চিহ্ন থাকিলে ধরা পড়িতে হয়, ইহা ভাবিয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে তাহা ধৌত করিয়া ফেলিত এবং রাত্রিশেষ হইতে না হইতেই পুনরায় গলাসীতে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া শান্তভাবে শয়ন করিয়া থাকিত। হস্তী ও বানর

প্রভৃতি জন্তুর অনেক কার্য্য আছে, যাহা পরিদর্শন করিলে, তাহাদিগকে ন্যায়পরায়ণ ও বিচারশক্তি-বিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়।

অনেকের বিশ্বাস, বাক্‌শক্তি একটি মাত্র বৃত্তি এবং তাহা কেবল মনুষ্যেরই আছে। কিন্তু বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলে তাহা যে কতিপয় মূলবৃত্তির সমঞ্জস ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতে সংশয় থাকিবে না। বাক্য-কথন স্বভাবজাত নহে,—উপার্জ্জিত মাত্র। মানুষ মানব-সমাজে থাকিয়া ইন্দ্রিয় চালনা, চিন্তা ও অনুকরণ করে বলিয়া, সে কথা কহিতে পারে। এজন্য জন্ম-বধিরের বাক্‌যন্ত্রে কোন দোষ না থাকিলেও সে কথা কহিতে পারে না। অতএব নিজের ও অন্যের মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত শব্দের শিক্ষা ও সমুচিত যোজনা এবং তাহা পরিস্কাররূপে উচ্চারণজন্য বাক্‌যন্ত্র ও কর্ণের * যথোচিত চালনা আবশ্যক। বনের হস্তী ও কুকুর প্রভৃতি জন্তু মনুষ্যের কথা বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিতে পারে না। অন্যপক্ষে শুক ও ময়না প্রভৃতি পক্ষী মানব-কথা উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু বোধ হয়, তাহা এক কালেই বুঝিতে পারে না। বাক্‌শক্তির এক অংশ বানর প্রভৃতির আছে, এবং আর এক অংশ শুক প্রভৃতির আছে। আবার মানব-কথা বুঝাও একটি বৃত্তির কার্য্য নহে। তাহাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) বিষয়-ভাবনা ও শব্দ জ্ঞান, এবং (২) বিষয় ভাবের সহিত শব্দ ও বাক্যের সংস্কার, এবং প্রয়োজনমতে শব্দোচ্চারণ। মণ্টোপোলিয়ারের চিকিৎসাধ্যাপক লর্ডেট একদা জ্বরের পর হঠাৎ বাক্-শক্তি হীন হইয়াছিলেন; শব্দের স্মৃতি এতদূর বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি কাহারও কোন কথা বুঝিতে পারিতেন না; কিন্তু নিজের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভাল

* কর্ণের সমুচিত চালনা না হইলে কত জোরে শব্দ উচ্চারণ করা আবশ্যক, বক্তা তাহা বুঝিতে পারে না।

রূপে চিন্তা করিতে পারিতেন। এমন কি বিদ্যালয়ে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, মনে মনে তাহার পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে পারিতেন। এস্থলে শব্দ-জ্ঞান রহিত হইলেও বিষয়-ভাবনা অব্যাহত ছিল। তদ্রূপে শব্দ উচ্চারণ করিয়া, মনের ভাব প্রকাশ করাও একটী শক্তি নহে। ডাক্তার কস্‌মোল, অধ্যাপক জিম্‌সনের "সাইক্লোপিডিয়ার" ১৪ ভলুমে এই তথ্যের অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কোন কোন রোগী কথা কহিতে ও লিখিতে পারে না, কিন্তু পুস্তক পাঠ করিতে পারে, কেহ বা আপনা হইতে শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু সকল শব্দ বলিতে পারে না; কিম্বা এক কথার পরিবর্ত্তে অন্যার্থবোধক পদ, কিম্বা দুই তিন পদ দ্বারা তাহার ভাব বলিতে পারে, অথবা অন্য কেহ কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া শুনাইলে, কেবল তাহাই বলিতে পারে, অতিরিক্ত একটি শব্দও বলিতে পারে না। কিন্তু অন্যে কোন শব্দ বলিলে তাহাতে নিজের মনোগতভাব প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারে। অতএব বাক্য-কথন অতি জটিল কার্য্য। তাহা বহুবৃত্তির সামঞ্জস্য ক্রিয়া হইতে সংসাধিত হইয়া থাকে। বাক্য বলিতে না পারিলে, যদি জীবাত্মা না থাকে, তাহা হইলে বোবা মানুষের এবং রোগ কর্ত্তৃক বাক্য কথনে অপারগ ব্যক্তিগণেরও আত্মা থাকা প্রতিপন্ন হয় না।

পদার্থ মাত্রেই জড়। তাহা সাধারণতঃ নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য—কিন্তু বিশেষ অবস্থান্বিত হইলে, এমন এক স্বতন্ত্র পদার্থের আশ্রয় বলিয়া প্রতীত হয়, যাহা আপনাকে বিশেষ কোন ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বদা নিঃসংশয়ে পরিচয় করিতে পারে। ঐ আত্মপরিচায়ক চৈতন্যই জড়াতীত পদার্থ, এবং আত্মা নামে অভিহিত। এই শক্তি ইতর জন্তুরও আছে। কারণ উহারা অপরিবর্ত্তনীয়তা অনুভব করিয়া পরিচিত স্থান ও সহচরকে চিনিতে

পারে। পরন্তু যদি আত্ম-পরিচায়ক চৈতন্য আত্মা না হয়,—তাহা জড়-দেহের গুণ হইলে, মানব-অহংজ্ঞানও জড়দেহের গুণ। কারণ ইতর জন্তু বিনা আত্মায় কেবল শারীরিক প্রকৃতি দ্বারা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি ভাবিয়া, চিন্তা ও ইচ্ছা করিতে পারিলে, মনুষ্য যে বিনা আত্মায় তাহা করিতে পারিবে না, এমন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অতএব যদি ইতর প্রাণি-দেহেও আত্মার আশ্রয় না হয়, তবে মানবদেহও আত্মার আশ্রয় নহে।. পক্ষান্তরে যদি মানবদেহ আত্মার আশ্রয় হয়, তবে ইতর প্রাণি-দেহেও আত্মা আছে। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলাম যে, সমস্ত প্রাণিরাজ্যেই আত্মার আশ্রয়।

তবে মানব-দেহ-সাধন-ক্ষেত্রেও সর্ব্বোচ্চ বৃত্তির সমষ্টিপুঞ্জ,—এতদবস্থায় মানবের সমস্ত বৃত্তিরই স্ফুরণ;—কিন্তু বৃত্তি সমুদয়ই অনুশীলন-সাপেক্ষ। ডাক্তার মড্সিলি বলেন যে,—"এরূপ মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে, নীতি ধর্ম্মের সংস্কার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীর ভাষাতে ঐরূপ কোন শব্দ নাই, যাহাতে বিচার, ধর্ম্মপ্রীতি বা করুণার ভাব প্রকাশ হইতে পারে;"—আমি বিবেচনা করি, বৃত্তি সমুদয় যথাযথ অনুশীলন না করাই প্রাগুক্ত ঘটনা সকলের কারণ মাত্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নিদ্রা-তত্ত্ব

শিষ্য। নিদ্রা কি;—এবং নিদ্রার সময়ে জীবাত্মা কোথায় থাকেন? পাশ্চাত্য প্রদেশের অনেক অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে নিদ্রা জড়দেহের বিশ্রাম এবং ঐ সময়ে আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া যান, এবং একটি

সূক্ষ্ম সম্বন্ধ-সূত্র ঐ আত্মার সহিত সংলগ্ন থাকে—কোনরূপ শব্দাদি হইলেই আত্মা ফিরিয়া আসিয়া দেহে প্রবিষ্ট হন, এবং তখন ঐ দেহের চৈতন্য হয়। ইহা বাস্তবিক কি না তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। না, আত্মা জীবদেহ হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করিতেন, এরূপ সূত্র লইয়া আত্মা যদি দেহ হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করিতেন, তাহা হইলে রাত্রিকালে সূত্র সংলগ্ন ড়র মত পৃথিবীর, যত আত্মা সকলেই আকাশ মার্গে উড়িয়া বেড়াইতেন; আর আত্মা-পরিত্যক্ত মৃত দেহগুলি মর-গৃহে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইত।

শিষ্য। তবে এতৎ সম্বন্ধীয় যথার্থ তত্ত্ব আমাকে বলুন।

গুরু। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—জীবের এই তিনটি অবস্থা; স্বপ্নটা কিছুই নহে—মায়া। জীবের সকর্ম্মক অবস্থাকে জাগ্রত ও অকর্ম্মক অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া থাকে, সেই ক্লেশকে নাশ করিবার জন্য স্বভাবতঃ একটা চেষ্টা আসিয়া জীবকে আচ্ছন্ন করে। সেই সময়ে কর্ম্মময় জ্ঞান একেবারে আবৃত হওয়ায়, জীব চেষ্টাহীন হইয়া থাকে। তদবস্থাকারিণী শক্তিকে নিদ্রা কহে। এরূপ আচ্ছন্নময় আবেশকে পুনরায় জ্ঞান সংস্কারে চালিত না করিলে জীবে একপ্রকার আবরণ প্রাপ্ত হয়, যাহা একেবারে বুদ্ধি প্রভৃতিকে জড় করিয়া ফেলে,—তাহাকে উন্মাদ বা ভ্রম বলে। জ্ঞানাবরোধকারী বলিয়া ভ্রম হইলে জীব সূক্ষ্মভাব বোধ করিতে পারে না।

ক্ষুদ্র ঘটিকা যন্ত্রের চাকা হইতে মহাগ্রহ উপগ্রহ পর্য্যন্ত জগতে সকল পদার্থ ই দুইটি বিভিন্নশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। একটির নাম উপসর্পিণী শক্তি, অপরটির নাম অপসর্পিণী। প্রথমটি একটি পদার্থকে আপনার কক্ষের কেন্দ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, অপরটীর গুণে ঐ পদার্থ কেন্দ্র হইতে দূরে ছুটিয়া আইসে। জগতে সর্ব্বত্রই এক নিয়ম বটে।

যে নিয়মে সমুদ্র জলের হ্রাস-বৃদ্ধি, গতি, প্রসারণ প্রভৃতি হইয়া থাকে, সেই নিয়মে মনুষ্যধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হয়। সংসারে কার্য্য বলিলেই প্রতিকার্য্যটি আপনাআপনি বুঝাইয়া যায়। একটু রজ্জু পাকাইতে হইলেও যত পাক লাগে, এলাইতেও ঠিক ততই পাক লাগিয়া থাকে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরিশ্রম বা কোনরূপ মানসিক কার্য্য করিলে নিদ্রা আইসে। জাগ্রত অবস্থায় আধ্যাত্মিক মানসতত্ত্ব মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া ছুটিতে থাকে। পেশী, ধমনী, স্নায়ুমণ্ডল প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্র সকল তখন সেই আধ্যাত্মিক বা জীবনী শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকে, জাগ্রত অবস্থায় ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া ঘন ঘন হইতে থাকে, রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বিশেষ বলবতী হয় এবং স্নায়ুমণ্ডলীর নিদ্রাবস্থা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে অধিক অনুভব শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় এই চৈতন্যশক্তি, মস্তিষ্ক হইতে মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার ভিতর দিয়া অধঃশরীরে নামিতে থাকে, এবং সেই স্থান হইতে শরীরের ক্ষুদ্রতম অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে শরীরের সর্ব্বাংশের ভিতর একটা চৈতন্যশক্তির সামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রম কালে আত্মার প্রয়োজন বলিয়া মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল প্রভৃতিতে অধিক শক্তি পরিচালিত হয়।

সাধারণ লোকের মত আত্মার নিদ্রা না হইলে শারীরিক নিদ্রা অসম্ভব। কিন্তু আত্মা জড়পদার্থ নহে। জড় বা দেহের ক্লান্তি প্রভৃতি গুণ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে নিদ্রা হয় কেন? অনেক চেষ্টা অনেক যত্ন করিয়াও কেন বা সময়ে সময়ে নিদ্রারোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে?

তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, দেহ ও আত্মার ভিতর পরস্পর কার্য্য বিনিময় আছে। দেহ আত্মাকে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে দেয়, তাহার বিনিময়ে জাগ্রত অবস্থায় আত্মা চৈতন্যশক্তি দিয়া

দেহকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখে। শারীরিক যন্ত্র সকল শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়ে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। কেন না যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকিবেন, ততক্ষণ শরীর যন্ত্র সকলকে কখনও শক্তির জন্য লালায়িত হইতে হয় না। আত্মার বিশ্রাম প্রয়োজন হইলে, তিনি বাহ্যিক শরীর যন্ত্র ছাড়িয়া আপনার ক্লান্তি দূর করিবার জন্য দেহের নিম্ন বা গভীরতম পুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আত্মার উপর যখন ঘুম চাপিয়া আইসে, আত্মা তখন বাহ্য শরীর হইতে ধীরে ধীরে আপনার শক্তি অপসৃত করিয়া, বাহ্য জগৎ হইতে মুখ লুকাইতে চাহেন। ইন্দ্রিয় হইতে আত্মার শক্তি অপসৃত হইলেও আত্মা দেহত্যাগ করেন না বলিয়া তাহাদের ক্ষণিক ও আংশিক ক্রিয়া ধ্বংস হয় মাত্র। মৃত্যু ও নিদ্রার প্রভেদ এই; নিদ্রাগমে আত্মা, বাহ্যদেহ হইতে আপনাকে উপসংহৃত করিয়া, ঊর্দ্ধ মস্তিষ্কপিণ্ডে (Cerebrum) আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঊর্দ্ধ পিণ্ড আবার তাহাকে অধঃপিণ্ডে (Cereclum) পাঠাইয়া দেয়।

অধঃপিণ্ড হইতে ক্রমে নামিয়া পড়িয়া, আত্মা মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা-রজ্জু মধ্যে সুখ-শয়ন রচনা করিয়া থাকেন। জাগ্রত অবস্থায় মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধপিণ্ডের (Cerebrum) কার্য্য হইয়া থাকে। জীব ঘুমাইলে বুদ্ধি-কার্য্য মস্তিষ্কের অধঃপিণ্ড দ্বারা সম্পন্ন হয়।

আত্মা এইরূপে নিদ্রাচ্ছন্ন হইলে, শারীরিক ক্ষয় বা শারীরিক যন্ত্রের দুর্ব্বল অংশসকল পূর্ণ ও সবল হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় মানবের আধ্যাত্মিক-সত্তা দেহের গূঢ়তম উপাদান সমূহে আশ্রয় লইয়া স্বকীয় চৈতন্য-শক্তি সংযোগে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে থাকে। এইরূপে অনেক শারীরিক তত্ত্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিণত হয়। রুগ্ন অঙ্গ ও রুগ্ন যন্ত্রসকল নিদ্রার কল্যাণময় সংস্পর্শে পুনরায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে।

কিন্তু কয়জন লোকের এইরূপ নিদ্রা হয়? জগতে যে মদ্যপায়ী, ব্যসিনী, রাত্রি-জাগরণশীল তাহার নিদ্রা কেবল দুঃস্বপ্নপূর্ণ। সংসারে সুনিদ্রার অধিকারী কয় জন? যাহার স্বপ্ন-হীন, বিভীষিকা-হীন সুনিদ্রা হয়, জাতিতে অধম্ চণ্ডাল হইলেও সে দেবতার সমতুল্য।

নিদ্রিত অবস্থায়, আত্মা শরীরের গূঢ়তম স্তরে বিচরণ করেন বলিয়া স্নায়ু-মণ্ডলীর (Nerves Gangalion) উপর আধ্যাত্মিক ষট্‌চক্র প্রতিষ্ঠিত। নিদ্রাবস্থায় সেই সকল স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে; সুতরাং গভীরতম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল যে নিদ্রাবস্থায় প্রকাশ পাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? স্বপ্নাবস্থায় যে লোক ঔষধ পায়, দুরূহ গণিতের প্রশ্নের মীমাংসা করে, ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারে, তাহার কারণ এই যে, নিদ্রাবস্থায় জড়তত্ত্ব আপেক্ষিকভাবে তিরোহিত হইয়া আধ্যাত্মিক বা বিশুদ্ধ চৈতন্য অথবা জ্ঞান-শক্তির অধিকতর বিকাশ হয়।

নিদ্রায় আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকিলেও, জীবনী বা জৈবিক তড়িৎ এবং চৌম্বকিক (Animal Electricity & Magnetism) শক্তির বিরাম হয় বা হওয়া উচিত। এই কারণে উদরস্থ খাদ্য-বস্তু সম্পূর্ণ জীর্ণ না হইলে ঘুমান উচিত নহে। কারণ খাদ্য-বস্তু জীর্ণ করিতে হইলে আত্মাকে যে পরিমাণে পাকস্থলীর উপরে তাড়িত বা চৌম্বকিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, নিদ্রাবস্থায় আত্মা সে শক্তি দ্বারা কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকেন, সুতরাং তখন আহার্য্যে উদর পরিপূর্ণ থাকিলে, নিদ্রা ও পরিপাক ক্রিয়া উভয়েরই ব্যাঘাত · থাকে। গুরু আহারের অব্যবহিত পরেই ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেই, প্রথমতঃ নিদ্রা লঘু ও স্বপ্নপূর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ ভুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে গলিত পিণ্ডে (Chyle) পরিণত হয় না। আহার ও নিদ্রার নিয়ম সকলের পক্ষে এক হইতে পারে না। কারণ জগতে দুইজন এক প্রকৃতির লোক নাই। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে

হইবে যে, ঠিক আহারের পর ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইতে ঘুমাইলে নিদ্রা ভাল হয় না। এক্ষণে দেখা গেল ;—

১। বাহ্য শরীর বা বাহ্যিক শরীর-যন্ত্র সকল ছাড়িয়া দেহের গভীরতমস্তরে (মেরুদণ্ডস্থিত মজ্জানাড়ী ও মস্তিষ্কের অধঃপিণ্ড) আত্মার অবস্থিতির নাম নিদ্রা।

২। জাগ্রত অবস্থায় জড়ীয় ধর্ম্মাশ্রিত আত্মার যে পরিশ্রম হয়, সেই শ্রম-ক্লান্তি নিবারণ জন্য নিদ্রার আবশ্যক। নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মতম শারীরিক ও আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব-সংযোগে দেহ ও আত্মা পুনরায় সবল ও কর্ম্মক্ষম হয়।

৩। নিদ্রা উপস্থিত হইলে, মন ও শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ এবং স্বচ্ছন্দ থাকা প্রয়োজন। গুরুতর আহার বা অধিকতর মানসিক চিন্তায় নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

নিদ্রাবস্থায় অনেক গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল আমাদের বর্ত্তমান-প্রসঙ্গাধীন নহে। তবে শয়নের পূর্ব্বে একথা যেন তোমার বিশেষ স্মরণ থাকে, জগতের সঙ্গে ও আপনার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ঘুচাইয়া মানুষের ঘুমাইতে যাওয়া চাই। শান্তিময়, সত্য-ময়, কল্যাণময় স্বর্গরাজ্য তোমার আপনার ভিতরেই লুক্কায়িত আছে। বিবেক সে রাজ্যের শাসনকর্ত্তা,—সে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা; তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা হইল। নিদ্রাবস্থায় আত্মা যখন অন্তর্মুখ হইয়া সেই অনন্ত অন্তর রাজ্যের দিকে চাহিয়া থাকিতে যাইবে—যখন সেই অনন্ত পুণ্যময় জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের অক্ষয় আলোক তাহার উৎসুক আকাঙ্ক্ষিত সুখের হৃদয়ে পড়িতে আসিবে, তখন তুমি যেন তোমার ক্ষুদ্র লালসার জীর্ণ-বস্ত্র লইয়া তাহার মধ্যে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইও না।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু কি?

শিষ্য। মৃত্যু কি, মৃত্যুর পর জীবাত্মা কোন্ পথ দিয়া এবং কেমন করিয়া পরলোক গমন করিয়া থাকেন,—তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। মৃত্যু শব্দের প্রকৃত অর্থ স্বভাবের পরিবর্ত্তন। জীব যে স্বভাবাপন্ন হইয়া অদৃষ্টবশে প্রকাশ হয়, সেই অদৃষ্টনাশে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এবং তৎসহযোগে প্রকাশ-স্বরূপ দেহেরও নাশ হইয়া থাকে;—এই পরিবর্ত্তনাবস্থাকে মৃত্যু কহে।

শিষ্য। লোকে বলে, অমুকের আয়ু ফুরাইয়াছে তাই মরিয়াছে; সে আয়ু কি?

গুরু। ভোগ্য-তেজকে আয়ু কহে, অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীরের সত্ত্বাকে আয়ু নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতির সংযোগে জীবের যে অনুভব অবস্থা, তাহাকেই আয়ু বলে।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন অদৃষ্ট নাশে জীবের জড়দেহবিচ্যুতি

ঘটিয়া থাকে। আর একবার কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন। অদৃষ্ট কি, এবং তাহার নাশই বা কি প্রকারে হয়?

গুরু। অদৃষ্ট বলিতে গতি বা কর্ম্ম। অদৃষ্ট-বশে স্বভাব পাইয়া জীবের বাসনা-স্বভাব অদৃষ্ট-স্বভাবকে যে ভাবে ক্রিয়াপর করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ করিবে, বর্ত্তমান অদৃষ্টের শেষে সেই শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনায় ঐ বাসনাই স্বভাবাপন্ন হইয়া অদৃষ্ট লাভ করিয়া থাকে। তাহাতেই নানা ভাবাপন্ন জীব ইহজগতে প্রকাশ হয়।

শিষ্য। এই বাসনা কোথা হইতে জীবে প্রকাশিত হয়?

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ; আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি,—পরব্রহ্মের বাসনা হইতেই জীব-সৃষ্টি,—বাসনা লইয়া জগৎ; ঐ অদৃষ্টই ঈশ্বরের জীব-লীলার বাসনা। "আমি বহু হইব" এই যে ব্রহ্মের বাসনাগত ভাব, তাহা হইতেই অদৃষ্ট প্রকাশ। ইহজন্মে অদৃষ্ট বশতঃ বাসনার ক্রিয়াযুক্ত শুদ্ধিতে যে স্বভাব লাভ হয়, পরজন্মে অদৃষ্ট সেই ভাবাপন্ন হইয়া বাসনা মতে জন্ম গ্রহণ করে। যেমন তৈলপায়ী কীটকে কাচপক্ষ ধারণ করিলে, তৈলপায়ী কীটের বাসনা নিধন ভয়ে কাচপক্ষত্ব প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ বাসনা কর্ম্মানুযায়ী স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মের "বহু হওন" নামক অদৃষ্টকে লইয়া রূপান্তরে প্রতিফলিত হয়।

শিষ্য। কল্পক্ষয়-কালে জীবত্বের ধ্বংস হইয়া ঈশ্বরে লীন হয় না কেন? তখন ত বাসনার বন্ধন এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়?

গুরু। তাহা যায় না। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে জড় অণু পর্য্যন্ত সকলেরই সকর্ম্ম-সূক্ষ্মাংশে ঈশ্বরে লীন থাকে মাত্র। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একথা ভক্ত অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥" গীতা—৯। ৭।৮

"হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়কালে ভূতগণ আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয় এবং কল্প-প্রারম্ভে আমি পুনরায় উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি; আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া, জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে প্রলয়কাল-বিলীন কর্ম্মাদি-পরবশ ভূতসমুদয় বারংবার সৃষ্টি করিতেছি।"

প্রতি কল্পক্ষয়কালে বা ভগবানের নিদ্রা সময়ে, জড় মাত্রই ধ্বংস হয়, জীবাত্মা সমুদয় তাহাদের কর্ম্মাদি লইয়া ঈশ্বরে অন্বিত হইয়া থাকে, আবার কল্পারম্ভে বা নিদ্রান্তে তাহারা আপন আপন কর্ম্মানুসারে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া থাকে। ইহাতে কর্ম্মের নাশ হয় না। জগতের সূক্ষ্ম কারণ যখন অবিনাশী এবং তাহারা যখন ঈশ্বরের শক্তি স্বরূপে থাকে, তখনই তাহারা অপরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ অমৃত; অপরের সাহায্যে চালিত বা বশীভূত নহে, এই জন্য অভীত। এই অমৃত ও অভয় শক্তিতে ঈশ্বর জগৎরূপী কার্য্য হইতে পৃথক্ হইয়াছেন। অমৃত ও অভয় শক্তিদ্বয়ই তাঁহার প্রকৃত রূপ, আর প্রাণিগণের অদৃষ্ট তাঁহার বাসনা মাত্র, প্রকৃত অবস্থা নহে।—এ সকল কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আর যে প্রকারে জীবের অন্ত্য-গতি হইয়া থাকে,—মৃত্যুর পরে জীব যে প্রকারে পরলোকে গমন করিয়া থাকে, তাহাও তোমাকে বলিয়াছি। কথাটার পরিষ্কার জন্য এস্থলে ধ্রুবের পরলোক গমনের উপাখ্যান যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে, তাহা তোমাকে শ্রবণ করাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সুনন্দ ও নন্দ নামক দেবতাদ্বয় ধ্রুবকে লইতে আসিয়া বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক; এক্ষণে আমাদের কথা আপনি শ্রবণ করুন,—আপনি পঞ্চমবর্ষকালীন শিশু বয়সে তপস্যা

করিয়া যে ভগবানকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, আমরা সেই অখিলব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ও সকলদেবতার দেবতা ভগবান্ হরির কিঙ্কর, এক্ষণে সেই ভগবৎ-পদ প্রদান করিবার জন্য আপনাকে লইতে আসিয়াছি। হে রাজন্! যে বিষ্ণু-পদ সপ্তর্ষিগণও প্রাপ্ত না হইয়া তাহার নিম্নে থাকিয়া সতত আক্ষেপ করেন; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণ যাহা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সতত প্রদক্ষিণ করেন; সেই দুর্জ্জয় বিষ্ণু-পদ আপনি জয় করিয়াছেন। এক্ষণে তাহাতে অধিষ্ঠিত হউন। হে অঙ্গ! হে সাধু! আপনার পিতা কি, জগতে কেহই যে পদে কোন কালে আরোহণ করিতে পারেন নাই, জগতের বন্দিত বিষ্ণুর সেই পরম পদে আপনি আরোহণ করুন। হে রাজন্! ভগবান্ উত্তম-শ্লোকের এই শ্রেষ্ঠরথে আপনি উঠিবার যোগ্য হইয়াছেন, অতএব আয়ুর সহিত আরোহণ করুন।* সেই উরুবিক্রম ধ্রুব যিনি নিত্য শুভকর্ম্ম দ্বারা আপনার অন্তরকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তিনি ভগবান্ বৈকুণ্ঠেশ্বরের প্রেরিত দেবতাশ্রেষ্ঠদ্বয়ের মুখনিঃসৃত মধুমাখা ভগবদাদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের পূজা ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা নৃপতি, সেই বিমানের অগ্রভাগ পূজা করিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের প্রেরিত পার্ষদদ্বয়কে বন্দনা করিলেন। অবশেষে যেমন তিনি রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি তাঁহার হিরণ্ময় রূপ হইল। অকস্মাৎ স্বর্গ হইতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল, প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলসঙ্গীত গান করিল, ধীরে ধীরে কুসুম বর্ষিত হইল। ধ্রুব এই রূপে যখন রথারোহণে স্বর্গে

* জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সংযোগে যে জীবের অনুভব অবস্থা, সেই অবস্থাকে এস্থলে আয়ু বলা হইয়াছে। সেই অবস্থার সহিত ধ্রুবের ন্যায় মুক্তজনে চির ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে পারেন।

উঠিলেন, তখন দীনা জননী সুনীতিকে ত্যাগ করিয়া তিনি যে স্বর্গে উঠিয়াছেন, এই ভাবনা তাঁহার স্মৃতিতে উদিত হইল। পারিষদগণ সেই সময়ে ধ্রুবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, জননী সুনীতি যে তাঁহার অগ্রে অগ্রে বিমানারোহণে স্বর্গে যাইতেছেন, ইহা তাঁহাকে দেখাইলেন। হে বিদুর! মহাত্মা যতই আরোহণ করিতে লাগিলেন, ততই দেবতাগণদ্বারা প্রশংসিত ও তাঁহাদের প্রক্ষিপ্ত কুসুমে ভূষিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে চন্দ্রাদি দেখিতে দেখিতে উচ্চে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ভূমি হইতে ভুবঃ, ভুব হইতে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া সেই দেবগণের সাহায্যে উঠিতে উঠিতে ক্রমান্বয়ে মহাত্মা ধ্রুব সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া সেই ধ্রুব নামক বিষ্ণুপদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। হে বিদুর! যে স্থল আপনি ভ্রমণ করিলে তাহার তেজেই ত্রিভুবনের সমস্ত লোক পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করে,যে সকল প্রাণী ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা যে স্থলে ভ্রমণ করিতে পারে না, যে সকল প্রাণী মঙ্গলভাব ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই সে স্থলে দিবা রাত্রি ভ্রমণ করিতেছেন; যাঁহারা শান্ত, যাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতের মঙ্গল সাধন করিয়া অন্তরকে বিশুদ্ধ করিয়াছেন, ভগবানের সেই প্রিয় ভক্তগণ যে অচ্যুতপদে সর্ব্বদা গমন করেন, সেই পরম-ধ্রুব পদে কৃষ্ণ-পরায়ণ উত্তান-পাদ-কুমার ধ্রুব অমল চূড়ামণির ন্যায় ত্রিলোক চূড়ায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আরোহণ করিলেন।" *

ধ্রুবের এই আধ্যাত্মিক গমনে তাঁহার মৃত্যু কথাই বর্ণিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বে আমি তোমাকে বলিয়াছি তাহা হইতে আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তাহাও বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দেবতাদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে ধ্রুব ইহলোক হইতে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত

* শ্রীমদ্ভাগবত, চতুর্থ স্কন্ধ—১৪ হইতে ৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত।

হইলেন। কোন স্থানান্তরে বহুদিবসের জন্য কেহ গমন করিতে ইচ্ছা করিলে আত্মীয়-স্বজন যেমন তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদিতে সাজাইয়া দেয় এবং সেই বস্ত্রালঙ্কার সজ্জিত ব্যক্তি তখন পূজ্য ব্যক্তিদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণানন্তর যাত্রা করেন,—এস্থলে ধ্রুব পরলোক যাইতেছেন, কিন্তু সেই পরলোকে বান্ধব কে? সাত্ত্বিক আচারযুক্ত কর্ম্ম। সেই অপূর্ব্বপরিচরিত সাধু কর্ম্মাদি এক্ষণে পরলোকের মঙ্গল কামনা করিয়া, আপনাদের শুভফল ধ্রুবের অঙ্গে বস্ত্রালঙ্কারাদি রূপে পরিধান করাইয়া দিল। মুনি প্রভৃতি মহাজনেরাই এ অবস্থায় গুরু, এই জন্য মহাত্মা ধ্রুব তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা দেখাইলেন। আনন্দ প্রাপ্ত প্রেম-ভক্তি সহকারে সুন্দর ও নন্দ নামক ভগবানের পারিষদদ্বয় সহযোগে আনন্দ-রথে ধ্রুব আরোহণ করিতে যাইতেছেন। "যেমন তিনি রথে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন, অমনি তাঁহার হিরণ্ময় রূপ হইল" এস্থলে বুঝিতে হইবে,—স্থূলদেহ ত্যাগ সূক্ষ্ম দেহটি কেবল দেহের কারণাবস্থা মাত্র। ঐ কারণাবস্থাকে হিরণ্ময়ীবস্থা কহে,—অর্থাৎ ধ্রুব স্থূল দেহ হইতে কারণ দেহ লাভ করিলেন।

এখন দেখ, ধ্রুবের সূক্ষ্মদেহ কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতকার মহামুনি ব্যাসদেব বলিতেছেন,—ভূমি হইতে ভুবঃ, ভুবঃ হইতে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া সেই "দেবযানের সাহায্যে উঠিতে উঠিতে মহাত্মা সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, ধ্রুবনামক বিষ্ণু-পদের সমীপে উপস্থিত হইলেন।" তবেই দেখ, আমি তোমাকে পূর্ব্বে যে সপ্তলোকের কথা বলিয়াছিলাম, এবং যে প্রকারে জীবের অন্ত্যগতি হইয়া থাকে বুঝাইয়াছিলাম—ধ্রুবেরও ঠিক সেই পথে গমন হইয়াছে কি না। সকলকেই ঐ পথ দিয়া যাইতে হইবে। তবে যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তাদৃশ লোকে গিয়া ফলভোগ করিয়া অদৃষ্ট সঞ্চয় করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু-তত্ত্ব।

গুরু। তোমাকে মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এখনকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইংরাজগণও এই মত স্থির ও প্রকাশ করিতেছেন। আগে তাঁহারা এ সকল মানিতেন না, কিন্তু এক্ষণে, বহু তত্ত্বের আলোচনা ও কঠোর পরীক্ষাদ্বারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অধ্যাত্মবাদী এবং আত্মিক তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা বিদেহী আত্মার সহিত সাক্ষাতাদি করিয়াও এই তত্ত্বের সীমাদেশেই উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন। ফল কথা, মৃত্যু সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা অজ্ঞেয় অলৌকিক নহে। মৃত্যু, কালের করাল দৃশ্য নহে। মৃত্যু, বিস্মৃতি ও পরিণতি।

মৃত্যু বলিলেই আমরা একরূপ পরিবর্ত্তনের কথা বুঝিয়া থাকি। সে পরিবর্ত্তন দেহগত বা ব্যক্তিগত নহে, সে পরিবর্ত্তন আধ্যাত্মিক মনুষ্যের স্থূল শরীরের ভিতর যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত আছে, মৃত্যুর পর তাহারই অবস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। স্থূলকথা মনুষ্যদেহের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর, মনুষ্য-জীবনের বন্ধু-বান্ধবের নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া আত্মা আপনার বিদেহী আধ্যাত্মিক কুটুম্বের ভিতরে বসবাস করিতে চান। ইহজীবনের সমস্ত সম্বন্ধ স্থূল ইন্দ্রিয় সুখ-জন্য, সুতরাং তাহার আত্মীয় কুটুম্বও স্থূল শরীর-বিশিষ্ট। মৃত্যুর পরে যে লোকে আত্মা বসবাস করেন, সে দেশের অধিবাসিগণের স্থূল শরীর নাই, ইন্দ্রিয়জন্য সুখ-দুঃখ সে রাজ্যে কখন প্রবেশ করিতে পারে না।

সংসারে যিনি চির-রুগ্ন, যিনি উৎপীড়িত, যিনি প্রবলের অত্যাচারে সর্ব্বদাই শঙ্কিত, দুঃখ-দারিদ্র্য বা শোক সন্তাপে পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে

শত অপমান, শত মৃত্যু সহ্য করিয়াও যিনি বালকের ন্যায় কাল্পনিক বিভীষিকার ভয়ে মৃত্যুর দিকে চাহিয়া দেখিতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে বলি—সত্য অবলম্বন করুন, সত্যের অনুসরণ করুন। মৃত্যু রহস্যময় হইলেও পূর্ণতম কারুণিক বিধান। এই পূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ প্রাণে অবলম্বন করুন, দেখিবেন, মরণের কারুণিক কল্যাণময় আলোকে অন্তর্জ্জগতের প্রচ্ছন্নতম তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইবে। দেখিবেন, জগতে কেবল সাম্য আছে, বৈষম্য নাই,—রীতি আছে, তাহার বৈপরীত্য নাই। দেখিবেন, পূর্ব্বে যাহা বিয়োগ বলিয়া মনে হইত তাহা সংযোগের সূক্ষ্মবর্ত্ম। পূর্ব্বে যাহা মরণ ছিল, এই নব সত্যের আলোকে তাহা নব জীবনের সূতিকাগারে পরিণত হইয়াছে।

মনে করিও না মৃত্যু ইহজীবনের চরম সীমা। মরিলেই সব ফুরাইয়া যায় না। মৃত্যু অর্থে পরিবর্ত্তন হইলেও সে পরিবর্ত্তন এত সম্পূর্ণভাবে আমূল নহে, যাহাতে জীবের ব্যক্তিগত চরিত্র একবারে বিনষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বেশ জানিও গোলাপের কুঁড়ি ফুটিলে, গোলাপ-ফুলের অবস্থা ও অবস্থিতিগত যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, মানুষ মরিলে তাহার আত্মগত পরিবর্ত্তন তদপেক্ষা অধিক নহে। সেইজন্য, আমি মৃত্যুকে শুদ্ধ মানুষ-জীবনের চরম-ঘটনা বলিয়া বিবেচনা না করিয়া, আত্মার অনন্ত জীবন লাভ ও অনন্ত অনুভূতির উপায় স্বরূপ বলিয়া পর্য্যালোচনা করিব।

মনুষ্যইতিহাসের নিম্নস্তর পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই মৃত্যুর মুখে অকারণ কতকগুলা চূণ-কালি মাখাইয়া মানুষে তাহাকে ভূত সাজাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, যে জাতি যত অসভ্য, সে জাতি তত ভয়ঙ্কর ভাবে মরণের ছবি আঁকিতে চেষ্টা করে। এমন কি, উন্নত খ্রীষ্টীয় ব্রহ্মবিদ্যায় মৃত্যু অর্থে—"অন্ধকারময় অধিত্যকা।" কিন্তু তাই বলিয়াই সত্য লুকাইয়া থাকিবার পদার্থ নহে। সকল দেশেই কেহ না কেহ এমন

একজন জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহার অমর উজ্জ্বল-দৃষ্টিতে প্রকৃতির গূঢ়তম সত্য নিমেষের জন্য উদ্ভাসিত হয়। যোগবলই হউক আর আধ্যাত্মিক শক্তিই হউক, এমন কোন শক্তি লইয়া তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন, যাহাতে সাময়িক সঙ্কীর্ণতা বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের আবর্জ্জনা সরাইয়া ফেলিয়া, জন্ম মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন,—জীবনের মানমন্দিরে নিমেষের জন্যও অনাবৃত সত্যের মুখামুখি করিয়া সম্বোধন করিতে পারেন।

এক্ষণে অনুসন্ধেয় বিষয় পুনরায় পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, মৃত্যু আমাদের অনন্ত জীবনের একটী ঘটনা মাত্র। মরণ বলিলেই আমরা ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থা ও আবাসস্থানেরই একটী পরিবর্ত্তন বুঝিয়া থাকি। অপর পক্ষে, জড় প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, সকল স্বতঃপ্রবৃত্ত ও অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত সত্তার উপাদান ও অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্যুরূপ পরিবর্ত্তনে জীবাত্মার যে অবস্থা ও আবাসগত উন্নতি সংসাধিত হইবে, ইহা সহজে অনুমেয়। সুতরাং মৃত্যুকে নবজীবনের দ্বার ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। জগতে সর্ব্বত্রই নবজীবনের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল জিনিষই জন্মাইতেছে ও মরিতেছে, আবার জন্মাইতেছে, আবার মরিতেছে। এ বিশ্বসংসার পর্য্যায়ক্রমে জীবন-মরণের লীলাভূমি। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন, মৃত্যুর পর মনুষ্য-আত্মা কবরের ভিতর প্রোথিত থাকে, তাহার পর কল্পান্তে বিচারের দিন উপস্থিত হইলে ভগবানের দরবারে উপস্থিত হয়। বিচারের পূর্ব্বে এরূপ হাজত-বাস বর্ত্তমান বিচারালয়ের অবশ্যম্ভাবী বিধান হইলেও জীবাত্মার পক্ষে তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। বিশ্বসংসারে শক্তির অক্রিয়ত্ব কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ, বিশ্বাসবিরুদ্ধ,—মনুষ্যকল্পনার অতীত।

অন্য পক্ষে, বাহ্য জগৎ হইতে একটি উদাহরণ না দিয়া আমি এ

মন্তব্যের উপসংহার করিতে পারিব না। মনে কর, একটি ক্ষুদ্র বীজাঙ্কুর ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, সূর্য্যরশ্মি ও পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপের সমবেত আক্রমণে আপনার জাতীয় প্রণবতা লইয়া ক্ষুদ্র অঙ্কুর বিকশিত হইল। অঙ্কুরোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাই, বীজের সে আকার সে অবস্থা নাই,—নূতন জীবনের সন্তান কোলে লইয়া জীবাণু মরিয়া গিয়াছে। অথবা বীজ মরিয়া অঙ্কুর হইয়াছে,—জন্মিয়াছে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে মৃত্যু বা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, আমরা দেখিতে পাই, জগতে বিচিত্র ফল-পুষ্প সকল নব সৌন্দর্য্য, নূতন আনন্দের সূর্য্যরশ্মি সৃষ্টি করিয়া রূপে রসে ফাটিয়া পড়িতে থাকে। তুমি কখন মরণের রূপ দেখ নাই? কাল, কাল বা ভয়ঙ্কর কে বলিয়াছে। মৃত্যুর অনূঢ়া কুমারী ঐ সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমকলিকাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

পরিবর্ত্তন বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম। চলিত কথায় বলিতে হইলে "মৃত্যু" পরিবর্ত্তনের বা'শ নাম। সংসারে যাহার গতি আছে, জীবন আছে, অনুভূতি আছে, অথচ মনুষ্য-দেহ নাই, পরিবর্ত্তনই তাহার ললাট লিপি। তাহারই শরীরগত, জীবনগত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তন কিরূপে সংঘটিত হয়, এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইলে, বলিতে পারা যায় যে, এই সকল সত্তার জীবন্ত শরীরের আংশিক বা আপেক্ষিক মৃত্যু হইলে, ইহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বীজাণুর উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু অন্য পক্ষে মনুষ্য-জীবনের ধ্বংস নাই, এই অসীম বিশ্ব সংসারে জীবাত্মার ব্যক্তিগত চরিত্রের অত্যন্ত বা এককালীন তিরোভাব অসম্ভব। মরণে মনুষ্যের অস্তিত্বের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। জীবাত্মা উন্নত উচ্চগতি লাভ করিয়া স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করেন।

যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য-দেহ পূর্ণায়ত—পূর্ণ পরিপুষ্ট হয়, যে মুহূর্ত্তে যৌবনের

পূর্ণ জোয়ার বৃদ্ধির চরম সীমার তরঙ্গে-বক্ষে আস্ফালন করিতে থাকে, যে মুহূর্ত্তে জীবাত্মার পূর্ণ অধিকার মনুষ্যের শরীর ও মানস-রাজ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতে এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতে থাকে। প্রতিদিন প্রতিপলে মরিয়া মরিয়া মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকল আপন আপন অধিকার-ভূমি হইতে অপসৃত হইতে থাকে। হইতে পারে, প্রথমে অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, অতি সংগোপনে ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন ইস্তফার দরখাস্ত লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। হইতে পারে, এই পরিবর্ত্তন লালসার এই অধিকার-চ্যুতি প্রথমে অতি অলক্ষিত ভাবে চলিতে থাকে, কিন্তু তাহা যে নিত্য নিরন্তর বর্দ্ধিষ্ণু, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মনোবৃত্তি ধ্বংস হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আপনার গরীয়ান্ পরিণামের দিকে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে অগ্রসর হইতে থাকেন।

বাল্যকাল—কত অর্থহীন আমোদ, কত বিহ্বল ছুটাছুটি, কত অজ্ঞেয় উল্লাসপূর্ণ। বালকের বালকত্বের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কোথায় পাওয়া যাইবে? বাল্যকাল যখনই যৌবনে মিলাইয়া যায়, তখনই কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর একটি শৃঙ্খলা আইসে, দৈহিক ও মানসিক ব্যাপার সকল একটি হেতু-যুক্তির বৃত্তের ভিতর বন্দীকৃত হইয়া পড়ে। তাহার পর, যৌবন পূর্ণায়ত্ত মনুষ্যত্বে পর্য্যবসিত হইলে, সেই বৃত্তের পরিধি-ভূমি দিন দিন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। অদম্য লালসা, সর্ব্বতোমুখী উচ্ছ্বাস ও নিয়ম-সংযমের গতি অতিক্রম করিতে বীতশ্রদ্ধ হয়। নরত্বের পূর্ণ বিকাশে দেবত্ব প্রতিফলিত হইতে থাকে। ঠিক এই সময়েই মৃত্যু বা পরিবর্ত্তন আসিয়া পলে পলে জীবাত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল খুলিতে আরম্ভ করে। দিন দিন মনোবৃত্তি সকল আপন আপন পুরাতন সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়িয়া অনন্তের প্রশস্ত রাজপথে ছুটিয়া যাইতে থাকে। পলে পলে মনুষ্যের আত্মা আপনার অক্ষয় অনন্ত অমরত্বের পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিতে

অগ্রসর হয়। দেবত্ব আসিয়া নরত্বের হাত ধরিয়া লয়। অমৃত আসিয়া মর্ত্ত্যকে বরণ করে। মানুষ দেবতা হইতে থাকে।

তাহার পর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। তখন দেহ উন্নতিশীল আত্মার সহিত সমানে দৌড়াইতে অসমর্থ হয়। তাই মনোবৃত্তি সকল অপ্রয়োজনীয় আসবাবের মত দেহের ধ্বংসাবশেষের নিম্নে চাপা পড়িতে থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহ আপন আপন ইষ্টপদার্থ হইতে মুখ লুকাইয়া অন্তর্মুখ হয়। দেহ স্থূলজগতে পড়িয়া থাকে, আত্মা আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতে যান। তাহার পর, মৃত্যুলগ্ন উপস্থিত হইলে, জীবাত্মা স্থূলদেহটি আপনার ভিতর উপসংহরণ করিয়া তাহার সূক্ষ্ম উপাদানে একটি সূক্ষ্ম শরীর গঠিয়া লইয়া থাকেন। স্থূলদেহ প্রাণপণ যত্নে আত্মাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। মৃত্যুকালে শরীরের যে আক্ষেপ-সঙ্কোচের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেহাত্মার এইরূপ ধরাধরির চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মৃত্যুকালে মনুষ্যশরীরে এইরূপ যাতনার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও তাহা বাস্তবিক কষ্টের লক্ষণ নহে। সে সময়ে ভিতরকার মানুষের যে আনন্দ হয়, সেই কারামুক্তির উচ্ছ্বাস কে বর্ণনা করিতে পারে? আমরা বাহিরে দেখি, রোগীর মৃত্যুযন্ত্রণা হইতেছে,—নিশ্বাসের ক্লেশ, শরীরের সঙ্কোচ, নয়নে জল,—কিন্তু তাহা যন্ত্রণার লক্ষণ না হইয়া, অন্তরাত্মার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের পরিচালক। কে না জানে, অত্যন্ত সুখ ও অত্যন্ত দুঃখের বহির্ব্বিকাশ প্রায় একরূপ! অধিক সুখে মানুষের চোখে জল পড়ে! কে না দেখিয়াছে, মরিলে অনেকের মুখে একরূপ হাসিহাসি ভাব থাকে! সে হাসি এত সুন্দর—এত শান্তি-পূর্ণ—এত অপার্থিব যে, দেখিলেই মনে হয়, মরণের মত সুখ নাই,—সুখের মরণের মত সুখের বরণ জীবনের বাসরে আর কখন হইতে পারে না।

জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে, জীবাত্মার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অনুভূতি বর্দ্ধিত

হয়, এবং ভবিষ্যৎ আবাস ভূমির অনন্ত, ভাস্বর, বৈভব তাহার নয়নে প্রতিফলিত হইতে থাকে।

কোন অজ্ঞেয় শক্তির বলে, আমার দৈনন্দিন জীবনে আমি এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমন কি, বহির্জ্জগৎ হইতে অন্তর-রাজ্যে বা আপনার অন্তরাত্মার ভিতরে প্রতিদিন যে সকল আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহার আলোকে এই সকল তথ্যের ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হই নাই। আমি সাংখ্যের পুরুষের মত শুদ্ধ, দ্রষ্টা, কূটস্থ, উদাসীন ভাবে এই সকল পরিবর্ত্তনকে ধীরে ধীরে, জীবনের নিম্নস্তর হইতে ঊর্দ্ধতন চৈতন্যের রাজ্যে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছি। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গগুলি দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক জীবনে প্রত্যক্ষানুভূত। অন্তর্জ্জগতে প্রতিদিন যে সকল আধ্যাত্মিক ঘটনায় নব সত্যের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহার সকলগুলিই একবাক্যে এই তত্ত্বের পোষকতা করে।

গুটিকাবদ্ধ প্রজাপতি আপনার স্বেচ্ছাকৃত কারাগার ভেদ করিয়া, স্বকীয় স্থূল শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন নবসৌন্দর্য্যে স্বর্ণরঞ্জিত পাখা কাঁপাইতে কাঁপাইতে কোন কুসুমিত, সূর্য্যরশ্মিফলিত নিকুঞ্জে উড়িয়া বেড়ায়, তুমি মনে কর, সে তখন তাহার সুখের কথা, সৌন্দর্য্যের কথা, সুখের জীবনের কথা ভুলিয়া যায়? তুমি কি মনে কর, সেই আকাশের রূপসী কন্যার কি এমন মনে হয় না, আমি কীট ছিলাম, এখন অপ্সরা হইয়াছি। ফুল ফুটে, পাখী গায়, বায়ু বহে, নদী ছুটে, রৌদ্র ফুটে,—গতি কোথায় নাই? বিকাশের মত মধুর কি আছে, মুক্তির মত সুখ কি? তেমন সাধের মরণে যদি সাধের মরণ হয়, তাহা অপেক্ষা অক্ষয় জীবন কোথায় পাওয়া যাইবে? ছি! ছি! দেখ, মূর্খ-মানুষ, ইট কাঠ দিয়া কত ঘর, কত কারাগার দিন রাত প্রস্তুত করিতেছে! ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু, দুই

দণ্ডের জন্য দুনিয়ার সবুজ মখমলের মসনদে বসিয়া, সূর্য্যরশ্মির সস্নেহ আমন্ত্রণে আকাশে চলিয়া যায়,—সহস্র কল্যাণ, অসংখ্য আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া দিয়া, দিবস-রজনীর শ্যাম, স্নিগ্ধ, কান্তিময় কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। দিনের পর রাত্রি আইসে, রাত্রির পর দিন, রাত্রির গর্ভ হইতে নবসূর্য্য-সহ দিবালোক ফুটিয়া উঠে,—রাত্রি দিবসের প্রসূতি। দিবালোক প্রথমে দিগন্তে বিকশিত হয়, তাহার পর মধ্যাহ্নে, জীবনে জ্যোতিতে সৌন্দর্য্য বিস্ফুর্য্যে ফুটিয়া উঠে। ক্ষুদ্র মুকুল আপনার জাতীয় ধর্ম্মে, সূর্য্যতাপে বিকশিত হয়। কত বিভিন্ন রকমের বর্ণ, কত বিভিন্ন রকমের গঠন-মাধুর্য্য! আলোক-কুমারী ক্ষুদ্র কুসুম যখনই পূর্ণযৌবন লাভ করে, যখনই পূর্ণ রূপ, পূর্ণ পরিমল দলে দলে স্তবকে স্তবকে উছলিয়া পড়িতে থাকে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মরণ আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লয়। ফুল মরিয়া যায়। মরিয়া যায় কে বলিল? তদীয় সৌরভ, জগৎ মাতাইয়া ছুটিতে থাকে; যাহারই চক্ষু আছে তাহারই হৃদয়ে সেই রূপ, সেই সৌন্দর্য্য নাচিয়া বেড়ায়! রূপ শুকাইয়া গেল, সেই সোহাগসৌন্দর্য্যের দলগুলি না হয় মলিন হইয়া ঢলিয়া পড়িল, কে না বুঝিতে পারে যে সেই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ফুলের একটি বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যে রূপ দেহগত ছিল; যে পরিমল পরাগের ভিতর বন্দীকৃত ছিল; সেই রূপসত্তা সেই সুরভিতত্ত্ব, সূক্ষ্ম অশরীরী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যই বল, সৌরভই বল, যাহা আত্মার ধর্ম্ম, তাহা ধ্বংস হয় না। সেই একই সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব, যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে, দিনে দিনে অবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করে; কেবল উপযোগী অবসরে আপন আপন প্রয়োজন মত জড়শরীর সংগ্রহ করিয়া লয়। তাই বসন্তে আবার ফুল ফুটে, আবার নবীন যৌবন, নূতন প্রাণ, তাহার অঙ্গে অঙ্গে উছলিয়া পড়িতে থাকে। ফুলের জীবনও যেরূপ, আত্মার অবস্থিতি ঠিক সেইরূপ, জীবন-রাজ্যে

এক ভিন্ন দ্বিতীয় নিয়ম নাই। ফুলের মত মানুষের দেহও ঝরিয়া মরিয়া যায়, কেবল সুরভিসৌন্দর্য্যের মত, জীবাত্মার অশরীরী উন্নতির জন্য।

"মৃত্যু" আমাদের পক্ষে নূতন ও উন্নত জীবনের প্রবেশদ্বার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের বিদেহী আত্মা যখন সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করিয়া উন্নত মহিয়ান্ গরীয়ান্ রাজ্যে প্রবেশ করিতে চাহে, তখন তাহার স্বর্গপ্রবেশের জন্য বিশ্বনিয়ন্তা এই মরণের বিজয়তোরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। স্বাভাবিক মরণে কোন ক্লেশ নাই। কোন ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু না হইলে, মরণ একটি ভঙ্গহীন, জাগরণহীন সুষুপ্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমেরিকার বোষ্টন-নিবাসী, ডাক্তার এণ্ড্রু ডেভিস্ জ্যাকসন্ সাহেব অধ্যাত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া, নিত্যানুসন্ধানে মৃত্যু সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এস্থলে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।—

"আমি জনৈক ভদ্রমহিলার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলাম। রমণীর বয়স ষাইট বৎসরের অধিক হইবে। মৃত্যুর আট মাস পূর্ব্বে, চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমি তাঁহার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করি। একটু দৌর্ব্বল্য ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ ব্যাধির লক্ষণ আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। আমাশয়ের উর্দ্ধতন ব্যবধান অস্থির (Hnodenum) ও বক্কাস্থির দুর্ব্বলতা এবং রসনেন্দ্রিয়ের একটু সামান্য স্থানভ্রংশতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার কিন্তু মনে হইল, আমাশয়ে দুষ্ট ক্ষত (Cancer) হইয়া ভদ্র মহিলার মৃত্যু হইবে। যখন স্থির বুঝিলাম, স্ত্রীলোকটীকে অনেক দিন আর এ পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না, তখন তাহার মৃত্যুর দিনে উপস্থিত থাকিতে আমার একটু ঔৎসুক্য হইল। যোগবলে কাল-ব্যাপ্তির পরিমাণ করিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া, আমি মনে মনে তাহার মৃত্যুর "সন-তারিখ" স্থির করিতে

পারিলাম না। কিছুদিন পরে, আমি তাহার বাটীতে আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম, এবং তাহার দৈনন্দিন চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইলাম।

তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দেহে উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা আবির্ভাব করিবার উপযুক্ত অবস্থা আমার ছিল। আর কেহ না বুঝিতে পারে, এমন ভাবে একস্থানে দাঁড়াইলাম,—যেখান হইতে নিরুদ্বেগে আমি তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শ্রেষ্ঠ বা উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থার অর্থ কি? আপনি তাহাতে কি বুঝাইতে চাহেন? উত্তরে আমি বলিব, যে অবস্থায় মানুষের শারীরিক বৃত্তির ধ্বংস হয়, যে অবস্থায় জীবাত্মা উচ্চতর সত্য প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিতে পারে, ফল কথা, যে অবস্থায় মায়ামোহ ঘুচিয়া, এ বিশ্ব-বিকাশ যথার্থ যে কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, তাহারই নাম উন্নত বা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অবস্থা। মৃত্যুকালে প্রত্যেক জীবের যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, শরীর ধ্বংস কালে কিরূপে সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, মৃত্যুর চির অন্ধকার, চির রহস্যপূর্ণ যবনিকা অপসৃত করিয়া আমি সেই সকল বিরাট সত্যকে সম্মুখীন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, ভদ্রমহিলার যত বয়স বাড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মাও চৈতন্যের রাজ্যের অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে; শরীরে কামনা-বাসনার খাদ কাটাইয়া, আত্মা ততই তরল, উজ্জ্বলে পাকা সোণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সূক্ষ্ম, সর্ব্বত্রগামী অণু হইতে অণীয়ান্, গুরু হইতে গরীয়ান্ আত্মার কাছে, লালসাময় মূত্রবিষ্ঠাপূর্ণ অশুচি শরীর বড় স্থূল, বড় গতিহীন, নিতান্ত জড়স্বভাব বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে। সেই স্থূল শরীরে এখন আর সূক্ষ্ম আত্মার কোন কাজই চলিতে পারে না। কিন্তু

হৃদয়, ধমনী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্র সকল তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। আমার সহিত তুমি আজন্ম সুখে দুঃখে কাটাইলে, আজ তুমি বড় মানুষ হইয়াছ বলিয়া আমায় ছাড়িয়া যাইতে চাও? তুমি যাইতে চাহিলে আমি যাইতে দিব কেন? পেশীমণ্ডলী আপনার সঙ্কোচ-প্রসারিণী-শক্তি, আপনার গতি, আদান, প্রদান প্রভৃতি কার্য্য তখনও করিতে চাহে,—ধমনী, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি রক্তসঞ্চালন যন্ত্র তখনও জীবনী-শক্তির জন্য লালায়িত, স্নায়ুমণ্ডলীও তখন অনুভব ও অনুভূতি ধরিয়া রাখিতে চাহে, মস্তিষ্ক তখনও বুদ্ধি-বৃত্তি ছাড়িতে চাহে না। সেই দুইজন আজন্মের বন্ধু,—সেই দেহ, আত্মা—তাহাদের পরস্পরের আসন্ন অবশ্যম্ভাবী চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদকে নিবারণ করিতে চাহে। এই ধরাধরিতে বৃদ্ধার শরীরে অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমরা সে সকলকে বিশিষ্ট কষ্টের লক্ষণ বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচনা করিয়া থাকি। কিন্তু আমি দেখিলাম, তাহাতে কষ্ট বা আয়াসের কোন কথাই নাই; আত্মা যে চিরদিনের জন্য দেহের সঙ্গ ত্যাগ করিতেছে, সে গুলি তাহারই নিদর্শন।

দেখিলাম, বৃদ্ধার মস্তকের চারিধারে এইরূপ অতি সূক্ষ্ম কোমল জ্যোতিষ্মান্ মণ্ডল প্রকাশ পাইল। মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধাধঃপিণ্ডের (cerebrum and cerebellum) গভীরতম অংশ বিকশিত হইল। দেখিলাম, জীবন্ত অবস্থায় যে জীবনী তাড়িৎ ও চৌম্বকিক শক্তি (Vital Electricity & Magnetism) শরীরের অধস্তন বৃত্তি সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া ছুটিত, তাহা এখন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া কেবল মস্তিষ্কে আশ্রয় লইয়াছে। অর্থাৎ সুস্থ ও জীবন্ত অবস্থা অপেক্ষা অন্যান্য শারীরিক বৃত্তি হইতে বুদ্ধিবৃত্তি শতগুণ বর্দ্ধিত। শরীর ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্ব্বে, এইরূপ বুদ্ধি সকল জীবেই পরিলক্ষিত হয়।

এইবার যথার্থ মৃত্যু ঘটনা বা আত্মার সর্ব্বতোভাবে দেহত্যাগ প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইল। মস্তিষ্ক শরীরের সর্ব্বাঙ্গ ও সকল ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি হইতে, তাড়িৎ চৌম্বকিক গতি, জীবনী অনুভূতি প্রভৃতি শক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার ফলে, শিরোমণ্ডলের বহির্ভাগে সেই জ্যোতিষ্মান্ ছটার বিকাশ। আমি দেখিলাম, শরীরের অধোভাগে যে পরিমাণে শীতল ও কালিমাচ্ছন্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে সেই জ্যোতি-ষ্মান্ ছটার দীপ্তিও বর্দ্ধিত হইতেছে।

তাহার পর দেখিলাম, সেই জ্যোতিষ্মান্মণ্ডলে মস্তকের চারিপার্শ্বে সেই দীপ্তিমান অতি সূক্ষ্ম ব্যোমে, আর একটি মস্তকের একটি অস্পষ্ট রেখাকে যেন আঁকিয়া দিতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাঁহার যোগ বা আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে উত্তমরূপে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি একেবারেই অসম্ভব। স্থূল বা চর্ম্মচক্ষে এ সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম,—ইহার প্রতিপ্রসব বা ব্যভিচার অসম্ভব।

ক্রমে ক্রমে মস্তকের সেই অস্পষ্ট রেখাটি বেশ স্পষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই জ্যোতিষ্মদ্ব্যোম ঘনীভূত হইয়া তাহাকে একটি ঘনীভূত আলোকের মস্তকে পরিণত করিল। পূর্ব্বে সেই মস্তকের ক্ষীণরেখা বিশিষ্ট দীপ্তিশীল সূক্ষ্ম ব্যোম ভেদ করিয়া, আমার দৃষ্টি চলিতেছিল। এক্ষণে দেখিলাম, তাহা আর চলিতেছে না। যখন এই দীপ্তিশীল মস্তকটির গঠনকার্য্য চলিতেছিল—তখন দেখিতেছিলাম, মৃতদেহের মস্তক-নিঃসৃত আলোক-ছটার পরমাণুমণ্ডলীর ভিতর খুব একটি কম্পন-সঞ্চরণ চলিতেছে। জ্যোতিষ্মান্ মস্তকটি যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই সেই কম্পন নিস্তব্ধ হইতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, এই আলোক-ছটার উপাদানসমূহ, যাহা মৃত্যু ঘটনার প্রথম অবস্থায় শরীরের অন্যান্য

অংশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া মস্তিষ্কে সমবেত হইয়াছিল, এবং যে সকল সূক্ষ্ম উপাদান হইতে এই আলোকছটার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সার্ব্বভৌম সংমিশ্রণ শক্তির বলে ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত অবিযোজ্যভাবে সংমিলিত, এবং সেই শক্তির বলে, বিশ্বসংসারের সমস্ত পরমাণু পরিচালিত ও সেই শক্তির বশবর্ত্তী হইয়াছে, সেই সূক্ষ্ম শারীরিক তত্ত্ব বা উপাদানপুঞ্জ সেই ছায়ামণ্ডল গঠিয়াছিল।

অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে, ভক্তি-নত মস্তকে, আমি এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলাম। দেখিলাম. একই ভাবে শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, ঠিক সেই একইরূপ জ্যোতিষ্মান্ উপাদানে, মৃত শরীরের স্কন্ধ, গ্রীবা অনুকরণ করিয়া, এক একটি ছায়া গ্রীবা প্রভৃতি লইয়া, একটি সর্ব্বাঙ্গহীন ছায়া বা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইল।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, যে মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা যে উপাদানে গঠিত, তাহার পরমাণু সমষ্টির ভিতর এমনি একটি অন্তরঙ্গতা আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এমনি অভেদ্য মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান আছে, যাহার বলে আধ্যাত্মিক পরমাণু ঠিক জড় পরমাণুপুঞ্জের মত ধর্ম্ম বিশিষ্ট না হইলেও, মৃত্যুর পর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া একটি আতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ গঠন করিতে সমর্থ হয়। আমি দেখিলাম, বৃদ্ধার স্থূল শরীরে যে সকল গঠন ও প্রকৃতি-গত দোষ ছিল তাহার আতিবাহিক দেহে সে সকল দোষ একেবারেই নাই। যে সকল দোষ জীবিতাবস্থায় আত্মার পূর্ণবিকাশের অন্তরায় ছিল, এখন তাহা নাই বলিয়া সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে, আত্মা অবাধে অসঙ্কোচে নিয়ত উন্নতির পথে ধাবমান।

এইরূপে যখন বৃদ্ধার আতিবাহিক দেহের সংগঠন হইতেছিল, আমি দেখিলাম, গৃহস্থিত অপরাপর ব্যক্তি তাহার স্থূল শরীরের দিকে স্থির

দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ও নানারূপ শারীরিক লক্ষণকে মৃত্যু যন্ত্রনার চিহ্ন ভাবিয়া নীরব অশ্রুপাত করিতেছে। বলা বাহুল্য, এ সকল লক্ষণ কোন আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার পরিচায়ক নহে। মৃত্যুকালে সমস্তজীবনী বা আধ্যাত্মিকশক্তি নিম্নদেহ হইতে মস্তিষ্কে আকৃষ্ট হয় বলিয়াই, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দেখিলাম, বৃদ্ধার আত্মা উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া তাহার মৃত শরীরের মস্তকের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। দেহ ও আত্মার এতদিনের ভালবাসাবাসি, এতদিনের একত্রবাস, এতদিনের স্নেহ অনুরাগ যেন ছিঁড়িয়াও ছিঁড়িতে চাহে না। স্বামীগৃহ গামিনী যুবতী বধূর মত আপনার পূর্ণ কৃতার্থতা, পূর্ণ প্রণয়ের দেশে যাইতেও যেন একটি করুণাশৃঙ্খল তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরে, যেন দশবার অগ্রসর হইতে গিয়া বিশবার সেই পুরাতন ত্যক্ত গৃহখানি, সেই প্রাণতম আবাল্যের স্নেহ-নীড়ের দিকে ফিরিয়া চাহিতে হয়।

দেখিলাম, আতিবাহিক দেহের শূন্যস্থ-চরণ ও বৃদ্ধার সেই ভূমিশায়িত মৃতদেহের মস্তকের মধ্যে একটি জীবনী তাড়িতের সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল বন্ধন-রজ্জু পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, মানুষে যাহাকে মৃত্যু কহে, তাহা একটি নব জন্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংসারে নাভিরজ্জু গলায় করিয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, মরণের পর অতীন্দ্রিয় রাজ্যে এইরূপ সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় জীবনী-রজ্জু লইয়া আতিবাহিক দেহের জন্ম হয়। এই জীবনী-রজ্জু বা সূক্ষ্ম তাড়িৎ-তন্তু ক্ষণকালের জন্য মৃতদেহ ও আতিবাহিক দেহকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখিয়া দেয়। সেই জন্যই মৃত্যুর পর এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেও, একটু জীবনী-তাড়িৎ মৃতদেহে ফিরিয়া আইসে। তাই মরিলেই মনুষ্যশরীর পচিয়া যায় না, তাই মরণের পরও মৃতদেহ স্পর্শ

করিলে, একটু উত্তাপ অনুভূত হয়। এ জ্ঞান আমার পূর্ব্বে ছিল না। সেই দিন প্রথম জন্মে।

সেইজন্য মরিলেই দেহের অগ্নিসৎকার বা কবরাদির ব্যবস্থা করা অনুচিত। সূক্ষ্ম শরীরের এই অশরীরী নাভিরজ্জু অনেক সময় বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং তাহাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ভিতর পরস্পরের অনুভূতি অভিজ্ঞানের আদান প্রদান চলিতে থাকে। সেইজন্য সমাধি (Catalepsy) যোগ-নিদ্রা (Clairvoyance) প্রভৃতি যোগাত্মিক ব্যাপারে, মানুষ অপরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় বিষয় সকল প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিতে পারে। এই জন্যই মর্ত্ত্য-ভূমিতে বসিয়া ভারতের পুণ্য ঋষিরা, সপ্তর্ষিমণ্ডলের ভিতরকার কথা বলিতে পারিতেন। এই জন্যেই চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, উপগ্রহে লোকলোকান্তরে বিচরণ করিয়া, অনেক অজ্ঞেয় তত্ত্ব অনেক কল্পনাতীত সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কাহিনী, তাঁহারা এদেশের সাহিত্য অক্ষরে অক্ষরে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সূক্ষ্ম আতিবাহিক নাভিরজ্জু দিয়া, মানবে বিশ্বজননীর অমৃতময়ী জীবনীধারা পান করিতে সমর্থ। এই সূক্ষ্ম নাড়ীর ক্ষুদ্র বিবরের ভিতর দিয়া, মানবে প্রকৃতির রহস্য-কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিতে পারে।

আমরা একথা প্রায় শুনিতে পাই, "যোগনিদ্রার অবসানে মানুষের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। দৈহিক ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে আত্মা এবং তাহার ক্রিয়া (স্মৃতি) ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকিলে, তাহা শরীরের গুণ বা দেহ যন্ত্রের আবিষ্কৃত কার্য্যের ফল। দেহের ধ্বংস আছে, সুতরাং আত্মা দৈহিক কার্য্যের ফল বলিয়া তাহাও মৃত্যুশীল। কাহাকেও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতে শুনিলে, আমাদের ভূতোন্মাদ বা অন্য কোন অপস্মার ব্যাধির নিদান খুলিয়া বসা উচিত, এমন কি উপস্থিত মুষ্টিযোগ হিসাবে মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করিলেও চলিতে পারে।

আমরা বলি, যোগনিদ্রায় যখন আত্মা স্থূলদেহ ছাড়িয়া, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, যখন পার্থিব লালসার জন্য সে রাজ্যের দ্বারে বড় বড় হরপের "প্রবেশ নিষেধ" দেখিয়া বেচারী ত্রিশঙ্কু বা যযাতির মত স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মাঝামাঝি স্থলে ঝুলিতে থাকে, তখনই তাহার কোন স্মৃতি থাকে না এবং তাহাও থাকিতেও পারে না: কোন জিনিষ মনে করিয়া রাখিতে হইলে, তাহা দেখিতে হইবে। যাহা কখনই দেখি নাই, তাহার ছবি মনে উঠিবে কেমন করিয়া? আত্মা যখন এই সূক্ষ্মজ্যোতির্ম্ময়ী বৈদ্যুতী নাড়ীর ভিতর দিয়া স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া যান যখন সে দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেও সূক্ষ্মদেহের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ স্বত্ব দখল বজায় থাকে, কেবল সেই অবস্থায়ই পুনর্ব্বার দেহে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের পূর্ব্বস্মৃতি স্পষ্ট জাগরূক থাকে।

দ্বাদশবর্ষ ক্রমান্বয় সমাধির পর, নৈমিষারণ্যে যে সকল স্বর্গবাণিজ্য বাজাইয়া দেখান হইত, আজকালের পাট, তুলার ব্যবসার দিনে অবশ্য তাহা আষাঢ়ের উপকথা। পাট তুলায় কাপড় হয়, কামিজ হয়, সেমিজ হয়। পাট তুলার মত মানুষকে আর কিসে এত সভ্য করিতে পারে? পাট-তুলা বর্ত্তমান আলোকের প্রকাণ্ড বাতিঘর! জাতীয় কৌলীন্যের বল্লালসেন! আর তোমারা যাহাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে এক এক জন বড় বড় চাঁদ সদাগর বল, তোমাদের সত্যের ভাস্কোডিগামার নব জীবনের অমর কলম্বস সেই সকল ঋষিরা নগ্নদেহে, ক্ষুণ্ণ উদরে, আজন্ম উপবাসে উপকথার উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। তোমাদের যোগনিদ্রা সমাধি সাধনায় মানুষকে একেবারে উলঙ্গ-অনাবৃত করিয়া তুলে। এমন ন্যাংটার ব্যবসায়ে লাভ কি? আইন অনুসারে তাহা দণ্ডনীয়, পাটের পাতঞ্জল সূত্রের কাছে তোমার যোগনিদ্রা?

"বৃদ্ধার আত্মা, তাহার মৃতদেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে,

আমি সেই পলায়িত আত্মার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধার আত্মা নিশ্বাসের জন্য আমাদিগের এই স্থূল বায়ু ব্যবহার না করিয়া এই বায়ুমণ্ডলের আভ্যন্তরীণ বায়ু ব্যবহার করিতেছে। আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন, আভ্যন্তরীণ বায়ুর অর্থ কি?—এবং কি কারণে আতিবাহিক বা সূক্ষ্মদেহীর, তাহা না হইলে নিশ্বাস-ক্রিয়া চলিতে পারে না? কথাটা বুঝিতে পারিলে, প্রথমে বুঝা যায়, যাহার যেরূপ দেহ, অর্থাৎ যাহার দেহ যেরূপ উপাদানে গঠিত, তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ না হইলে, তাহার নিশ্বাস-ক্রিয়া চলিতে পারে না। মোট কথা মাটির দেহে বায়ুর নিশ্বাস না হইলে প্রাণ থাকিতে পারে না। এখন বিবেচনা করুন, আতিবাহিক দেহ কি উপাদানে গঠিত? আমরা দেখিয়াছি, সূক্ষ্ম জীবনী তাড়িৎ প্রভৃতি লইয়া মৃত্যুকালে আত্মা আপন কর্ম্মপোযোগী সূক্ষ্ম শরীর গঠিয়া লয়েন। সুতরাং আতিবাহিক দেহ সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত বলিয়া তাহার নিশ্বাস ক্রিয়ার জন্য আমাদের বায়ুর অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বায়ুর প্রয়োজন। তাহার পর এই বায়ুমণ্ডলের গঠন বুঝা আমাদিগের আবশ্যক। জড়জগতে সকল পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণুসমষ্টি লইয়া এক একটি পদার্থ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। একটি জিনিষকে ভাগ করিয়া যখন আমরা এমন অবস্থায় উপস্থিত হই, যাহাকে আর ভাগ করা যায় না; তখন পদার্থের সেই অংশকেই আমরা পরমাণু বলিয়া থাকি। বায়ুর পরমাণু অন্য জড়পরমাণুর মত গোলাকার। এইরূপ একটি গোলাকার পরমাণু পরস্পর পাশাপাশি বসান আছে। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবকাশ বা ফাঁক থাকা অনিবার্য্য। বায়ুমণ্ডলের এইরূপ পরমাণুর অবসরের মধ্য দিয়া, পরমাত্মার নিশ্বাস বায়ু সর্ব্বদাই ঝরিয়া পড়িতেছে। সুতরাং আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করিবার কালে, জীবাত্মার সেইরূপ বায়ু না হইলে আদৌ চলিতে পারে না।

দেখিলাম, এই আধ্যাত্মিক বায়ুতে, নিশ্বাস লইতে বৃদ্ধার আত্মার প্রথমে একটু ক্লেশ হইতে লাগিল। দুই এক মুহূর্ত্ত পরেই সেই অসুবিধা-টুকু কাটিয়া গেল। বৃদ্ধার আত্মা বেশ স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস লইতে লাগিলেন। এমন কি, তাহার আতিবাহিক দেহটী সম্পূর্ণরূপে তাহার মৃত স্থূল শরীরের সদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল অধিকতর সৌন্দর্য্য, অধিকতর প্রীতি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া উছলিয়া পড়িতেছে। স্থূল-শরীরে হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি যেমন শারীরিক যন্ত্রাদি ছিল, আতিবাহিক দেহেও ঠিক তাহাদের অনুরূপ যন্ত্রাদি হইয়াছে। দেখিলাম, এই আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনে তাহার আমিত্বের এককালীন ধ্বংস বা বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাস্তবিক, তাহার আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম শরীর ও তাহার স্থূল শরীরের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য যে, আমার মত তাহার অন্য কোন বন্ধু-বান্ধব তাহাকে সে অবস্থায় দেখিলে, নিশ্চয় চেঁচাইয়া উঠিত—বলিত, "এমন কোন্ দেশে গিয়াছিলে, যেখানে গেলে মানুষ এমন সুন্দর হয়।"

আমি দেখিলাম, উন্নত জীবনের উন্নত অনুভূতি, উন্নত বাহ্যপ্রকৃতি প্রভৃতিতে আমাকে অভ্যস্ত করিতে বৃদ্ধার আত্মা বড়ই ব্যতিব্যস্ত। নূতন দেশ, নূতন আনন্দ, নূতন উচ্ছ্বাসের সহিত নূতন রকমের চিন্তা পরিচয় করিয়া লইতে হইতেছে। নূতন জীবনের নূতন ঘরকন্না গুছাইয়া লওয়া বড় সহজ সুখের ব্যাপার নহে। দেহ-আত্মার বিয়োগকালে পার্শ্বে বসিয়া কত আত্মীয় স্বজন কাঁদিতেছিল;—দেখিলাম, বৃদ্ধা তাহাদের শোকে একবারেই সন্তপ্ত হইতেছে না, বরং তাহার এই তত্ত্ব-জ্ঞান, এই স্থৈর্য্য, এই চির প্রশান্তি, অনন্তের রাজ্যে অনন্তপ্রীতিপূর্ণ ভাবে জ্ঞানে পরিণত হইতেছে। বৃদ্ধা বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিল, মরণ বাস্তবিক কি ব্যাপার তাহা জানে না বলিয়াই, মৃতের মর্ত্ত্য কুটুম্বেরা কাঁদিয়া থাকে। এ দোষ

সমাজগত শিক্ষাজন্য। মরণে স্থূল শরীরের ধ্বংস হয় বলিয়া জীবাত্মার ধ্বংস হয় না।

জীবনে যাঁহারা সত্য অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকে বারংবার বলিয়াও আমাদের তৃপ্তি হয় না যে, মরণে ক্লেশ নাই, মৃত্যুকালে দেহে যে সকল কষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা শারীরিক ক্লেশের জন্য নহে—সে সঙ্কোচ আক্ষেপ কেবল আত্মার পলাইবার পরিচায়ক। মরিলে মানুষের আমিত্বের বা আমি জ্ঞানের কোন ক্ষুণ্ণতা হয় না। মরিলেও মানুষ ঠিক বুঝিতে পারে যে, আমি স্থূল শরীরে পৃথিবীতে ছিলাম, সেই আমিই সূক্ষ্ম শরীরে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, কাহারও যদি তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন—যাঁহার মৃত্যুর জন্য তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল, তিনিই উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় শরীরে তাঁহাদেরই মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবন লইয়া মনুষ্য-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে যদি এত মঙ্গল শব্দ, এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতে থাকে, তবে সেই সন্তানের মৃত্যুর দিন—যে দিন সে অনন্ত জীবনের রাজ্যে ভূমিষ্ঠ হইতেছে, সে দিন তাহার মৃত্যুগৃহে কত উৎসব হওয়া প্রয়োজন।

স্থূল.শরীর ছাড়িয়া সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিতে বৃদ্ধার প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল লাগিয়াছিল। কিন্তু সকলের পক্ষে এক নিয়ম হইতে পারে না। যেই মাত্র সেই নূতন সূক্ষ্মদেহের গঠন কার্য্যটি সম্পূর্ণ হইল, দেখিলাম, অমনি বৃদ্ধা আপন ইচ্ছাশক্তির বলে, শূন্য হইতে নীচে নামিলেন; এবং নূতন, উজ্জ্বল, মঙ্গল বসনে, নব বধূর মত, ধীরে ধীরে দ্বার দিয়া, গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিবামাত্র বৃদ্ধার দুই চারিজন সেইরূপ আতিবাহিক বা স্পিরিট্ সঙ্গী মিলিল। তখন আমাদিগের কোন পরিচিত পর্ব্বতারোহণের মত, তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া,

ধীরপদ সঞ্চালনে আকাশের ঊর্দ্ধস্তরে উঠিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা যায়, আমি চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে কুয়াসার যবনিকার মত যেন একটা আবরণ আসিয়া আমার চক্ষের উপর পড়িল। তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।

মানুষের শরীরের ভিতর প্রতিদিন, অহর্নিশ যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার সমষ্টি বা চরমসীমার নাম মৃত্যু। বীজের মৃত্যু না হইলে যেমন ফুলের জন্ম হয় না; দেহের মৃত্যু না হইলে সেইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ অসম্ভব। আত্মার জন্মের নাম শরীরের মৃত্যু। মর্ত্ত্য-জীবনে, নিদ্রা একরূপ মরণের কনিষ্ঠা সহোদরা। রাত্রি, নিদ্রা, অন্ধকার শারীরিক মৃত্যুর দৃষ্টান্ত। দিবস, আলোক, জাগরণ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উন্নতির বা আত্মার জন্মের উদাহরণ স্থল। জন্ম-মৃত্যু ভাবিয়া, মানুষের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। মরণের স্বরূপ মরণের নিয়ম বুঝিয়া জীবনে তাহার সাধন প্রতিপালন করিলে, মৃত্যু মধুর শান্তিময় নিদ্রা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সে ঘুম ভাঙ্গিলে জীবাত্মা যখন চাহিয়া উঠিবেন, তখনই অনন্ত রাজ্যের অনন্ত আলোকে, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়নে প্রতিফলিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরলোকের সংবাদ।

গুরু। পরলোক হইতে অনেক সময় আমরা অনেক সংবাদ পাইয়া থাকি। যে সকল আত্মা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অনেক সময় আমাদিগকে দর্শন দান করিয়া থাকেন। আমি এক্ষণে যে ঘটনাটি

উল্লেখ করিব, সেটি যথার্থ ঘটনা. ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মে তারিখে আমেরিকায় বোষ্টন নগরে ঘটিয়াছিল। জেমস্ ভিক্টর উইলসন ও ডক্টর ডেভিস্ নামক দুই ব্যক্তির ভিতর অত্যন্ত প্রীতি—ভালবাসা ছিল। ডক্টর ডেভিস্ একজন প্রেত-তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। প্রকৃতির দৈবীশিক্ষা বা উপদেশ নামক তাঁহার একখানি গ্রন্থে আমেরিকার ধর্ম্মজগতে তখন একটি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া উইলসন প্রথমে ডক্টর ডেভিসের, পরিচিত হয়েন। কালক্রমে ডক্টরের সংসর্গগুণে সে পরিচয় বিশেষ বন্ধুত্বে পরিণত হয়, এমন কি কতকটা গুরুশিষ্যের মত সম্বন্ধ তাঁহাদের মধ্যে শেষ জন্মিয়া যায়।

উইলসনের কিন্তু সকল সংশয় তখনও মিটে নাই। মৃত্যুর পর মানুষের আমিত্বের ধ্বংস হয় কি না ইত্যাদি অনেক দুরূহ সমস্যা তখনও তাঁহার বড় জটিল ও দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হইত। এক একবার সিদ্ধান্ত হইত, সাগরে বৃষ্টিকণার মত মরণের পরক্ষণেই জীবাত্মা ঈশ্বরতত্ত্বে লীন হইয়া যায়। যাহাই হউক, স্থির হইল তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যাঁহার অগ্রে মৃত্যু হইবে, তিনি আসিয়া যিনি বাঁচিয়া থাকিবেন, তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই পরলোকের রহস্যকাহিনী বলিয়া দিবেন। এইরূপ স্থির হইবার কিছুদিন পরেই অকস্মাৎ একদিন উইলসনের মৃত্যু হইল এবং ডক্টর ডেভিস্ও তাঁহার অপর বন্ধুর নিকট হইতে সেই মর্ম্মে একখান পত্র পাইলেন।

অনেক দিন চলিয়া গেল, উইলসনের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পালনের কোন সম্ভাবনা নাই। তাহার পর, ডক্টরের খুব সঙ্কট পীড়া হইল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পীড়ার উপশম হইলে তিনি একদিন গৃহে বসিয়া আছেন, তাঁহার মনে হইল, কে যেন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। ডক্টর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। দৈববাণীর মত অতি

ধীর, অতি স্পষ্ট, অতি স্নিগ্ধভাবে কে যেন আসিয়া তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত কথা কহিতেছে। উইলসনের কণ্ঠস্বর?—হাঁ, সেই প্রাণপূর্ণ, পুরাতন প্রীতিপূর্ণ বাণী,—তাহাতে সন্দেহ চলিতে পারে না।

উইলসনের আত্মা বলিতেছে, "আমি তোমায় তিনবার খুঁজিয়া গিয়াছি,—তিনবার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছি। তুমি পার্থিব পদার্থের অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত ছিলে। তোমার অন্তরাত্মা, পরলোক-তত্ত্ব বুঝাইবার উপযুক্ত অবস্থায় ছিল না। বর্ত্তমানে তোমার শরীর ভাল নহে। এ সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিবার শক্তি তোমার নাই। এক্ষণে আমি চলিলাম, উপযুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত অবসরে আবার তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হইবে।"

তাহার পর কত সপ্তাহ কত মাস চলিয়া গেল। ডক্টর ক্রমে ক্রমে সুস্থ ও সবল হইলেন। তারপর আর একদিন উইলসন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনুষ্য-জীবনে তাঁহার যেরূপ আকৃতি ছিল, ঠিক সেইরূপই আছে, কেবল লাবণ্য ঘুচিয়া জ্যোতিঃ হইয়াছে। তেমন সুন্দর, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির কাছে, আমাদের চিত্রকরগণের পৌরাণিক পুত্তলি নিতান্ত কুৎসিত, নিতান্ত কুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুঠাম, সুস্থ, সবল, ভাস্বর মূর্ত্তিতে উইলসন উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই উজ্জ্বল স্বচ্ছ পরিচ্ছদ অনেকটা গুরু ও শিষ্যের পরিচ্ছদ একত্র করিয়া যেন নির্ম্মিত। উইলসন বলিতেছেন,—

"সত্য সত্যকে সাড়া দেয়—ভালবাসা প্রতি-ভালবাসা খুঁজে। আত্মা আত্মাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটে। তুমি আমায় খুঁজ বলিয়া, আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। তুমি আমায় প্রথমে শিখাইয়াছিলে বলিয়া, আমি তোমায় শিক্ষা দিতে আসিয়াছি।"

"সত্য কত সত্যময়—ভালবাসা কত ভালবাসা পূর্ণ—সত্যতা কত

সাধু—ইচ্ছাশক্তি কত সর্ব্ব শক্তিমতী—শুদ্ধ জ্ঞান কত জ্ঞানময়—মহত্ত্ব কত মহীয়ান্—দেবত্ব কত ঐশ্বরিক—এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কত অসীম, কত বিশ্বব্যাপী !”

“এমন অসংখ্য পৃথিবী,—অগণ্য ভূর্লোক আমার চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত ; আমার প্রতি পবিত্র বাসনা পূর্ণ পবিত্র ভাবে চরিতার্থ করিতেছে। এখানে কামনার দাহ নাই, লালসার যন্ত্রণা নাই, আলোকে ছায়া নাই, কর্ত্তব্যে ক্লেশ নাই।”

“পৃথিবীর সাগর বা জলরাশি যেমন বিভিন্ন দেশকে বিমুক্ত করিলেও তাহাদের প্রত্যেকের উপকূল বিধৌত করিয়া ছুটে, এ জগতেও তেমনি সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় পদার্থের স্রোত, এক গ্রহ বা আত্মলোক হইতে অপর গ্রহে বা আত্মলোকে নিরন্তর প্রধাবিত হইতেছে। এখানে ওখানে, সর্ব্বত্রই সংযোগ বিয়োগ, বিয়োগে সংযোগ।”

“এই সকল গ্রহ বা আত্মলোক আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেশ। এ জগতে প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা এক শ্রেণীর জীব হইলেও একরূপ জীব নহে। চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশের তারতম্য অনুসারে, অনন্তের রাজ্যে ইহাদের অবস্থিতির ভেদ হইয়া থাকে। যাহার চৈতন্য যেমন পরিস্ফুট, তেমনি স্থানে তেমনি লোকে তাহার বসবাস। সুতরাং তাহাদের বিধি বিধানের ব্যক্তিগত বা সমাজগত ভেদ থাকিলেও তাহাদের কোন মৌলিক ভেদ নাই। সকলেই আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রমিক উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতেছে। কেহ অধিক অগ্রসর, কেহ বা তাহা অপেক্ষা একটু পশ্চাতে উঠিতেছে।”

“এখানে বিরোধ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, কেবল ঈশ্বরত্বের প্রতিযোগিতা আছে। ঈর্ষাধীন হইয়া নহে, শুধু পরস্পরের অসীম অগাধ ভালবাসায়, পরস্পরের পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ ঈশ্বরত্বে পরিণত হইতে

ছুটিতেছে। এখানে একজন আত্মা, অনন্ত-শান্তি-সপ্তকের এক একটি মৌলিক স্বর"। *

"তোমরা যেমন তোমাদের পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, আমরা তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আত্মলোকে বেড়াইতে যাই।"

"আমাদের এ রাজ্য বিশাল, বহু বিস্তীর্ণ। আধ্যাত্মিক শাসনই এখানকার রাজধর্ম্ম। ভালবাসা আমাদের দেশের আইন। সে আইন পালনের ফল, জ্ঞান ও সুখ।"

"যাহারা এক প্রকৃতির বা একরূপ আকর্ষণের বশীভূত, কেবল সেই সকল আত্মাই একত্রে বিচরণ করে।"

"এখানে অনূঢ় কেহ নাই। এখানকার বিবাহ শরীরগত নহে, এ বিবাহের নাম সত্যে সত্য, আত্মায় আত্মায় নিবিড় সূচীভেদ্য মিলন। এ রাজ্যের সকলেই জানে, কোথায় তাহার আধ্যাত্মিক স্বামী বা আধ্যাত্মিক বধূটির দেখা পাওয়া যাইবে, কোথায় তাহার বাস,—এই অক্ষয় অতীন্দ্রিয় মিলনের জন্য কোথায় সে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এ রাজ্যে প্রবেশ মাত্রেই এই মঙ্গলগ্রন্থি বদ্ধ হইয়া যায়। সূর্য্যরশ্মিকে যদি তাহার আমোদিনী কুলবধূকে চুম্বন করিতে দেখিয়া থাক, আপন ক্ষুদ্র শরীর ভাঙ্গিয়া গলাইয়া, দুইটি শিশির বিন্দুর প্রাণ মিলান যদি কখনও প্রত্যক্ষ করিয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই স্বর্গীয় বিবাহ কত নিমিষে বাঁধিয়া যায়,—তাহা কত সুন্দর। এ মিলনের নাম সংযোগ নহে, পরিপুষ্টি—বন্ধন নহে, একীভাব। স্বর্গীয় বিবাহ বলিলে যে সঙ্কেত

* সা, ঋ, গ, ম, প্রভৃতি এক একটি স্বর লইয়া, একটি স্বর বা সুরসপ্তক হয়। সা, ঋ, প্রভৃতি স্বরগুলি বিভিন্ন হইলেও যেমন লালিত্যের বিরোধী না হইয়া স্বপক্ষ হয়, সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থায় উন্নতিশীল আত্মা সমূহও বিশ্বব্যাপী সাম্যের প্রতিপোষক।

তোমাদের মনে উদয় হইবে, তাহা ছবিতে সম্পূর্ণ কাল ব্যাপ্তিতে নহে। কারণ আমাদের বিবাহ, পবিত্র সুন্দর, মধুর অনন্তকালস্থায়ী। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার সৌন্দর্য্য, মাধুরী—পুণ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার শেষ নাই, সীমা নাই,—কারণ তাহা অনন্তে সম্পূর্ণ।”

“যে আত্মার বিকাশ বৈধরূপে হইয়াছে, তাহার উদ্বেগ নাই। আমরা সত্য কি তাহা জানি তাই আমাদের বন্ধন নাই। এই মুক্তি, সত্যের সংখ্যাজন্য নহে, তাহার গুণজন্য। আমরা বহু আকারের সত্য জানি বলিয়া মুক্ত নহি, যাহা জানি তাহার পূর্ণ স্বরূপ জানি বলিয়া আমরা বন্ধনহীন।”

“আমাদের অন্তরাত্মার বৃদ্ধি অনুসারে, বিশ্বের মহত্ত্ব ক্ষুদ্রত্ব প্রতীয়মান হয়। আত্মা যতটা সত্য ধারণা ও অনুভব করিতে পারে, ততটা সত্য যদি কেহ আমাদের মধ্যে (আমাদের বলিলে মর্ত্ত্যের লোককেও বুঝাইযা থাকে) তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে, প্রসঙ্গে, পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিও আপেক্ষিক ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।”

“যাঁহার অল্প সত্য আছে, জীবনে তিনি সর্ব্বদাই সন্দেহযুক্ত। সত্যই একমাত্র অনুসন্দেহ হইলে, মনুষ্য-জীবনেও তাহা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়, কয়জন তাহা খুঁজিয়া থাকে? স্বকীয় মত স্বকৃত গ্রন্থ প্রচলিত করাইতে সকলে ব্যস্ত। সংসারে প্রতিপত্তি হইবে, স্বনামে জগতে ধন্য মান্য হইবে, বিধান শাসনের রাজ্যে আমি একজন বৈবস্বত মনু হইব, এই বিকৃত লালসার জন্যই জগতে লোক সত্যের সন্ধান করে। আমাদের দেশে এরূপ বিকৃত বুদ্ধি নাই।”

আত্মার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও অধিক মহীয়ান্, অধিক গরীয়ান্ রূপে প্রতীয়মান হয়। তোমার জীবনে যত পল যত

মুহূর্ত্ত আছে, অনন্ত মনুষ্য-কল্পিত অনন্ত অপেক্ষা ততগুণ অধিক, ততগুণ মহত্তর।"

"এ বিশ্ব বাস্তবিকই অধিক বিশ্বব্যাপী হয় না, অনন্তর যথার্থ ই অধিকতর অনন্ত হইয়া দাঁড়ায় না। আত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্ব ও অনন্ত অধিক বিকশিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক জীবাত্মারই স্বীকার বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে, জড়াত্মিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

"সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এক মহাভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হয়। অতি সামান্য সংখ্যা ব্যতীত প্রায় সকল মনুষ্যই সত্য কি তাহা ধারণা করিতে পারে না, সত্য কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানে না, কিম্বা কেমন করিয়া সত্যকে অসত্য হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ করিয়া লইতে হয়, তাহাও তাহাদের বোধাতীত। অনেকেই ঘটনাশৃঙ্খলা বা কার্য্য পরম্পরাকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন। ঘটনা বা কার্য্য, পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, পদার্থের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের নাম সত্য।"

"ক্ষুদ্র জীবাণুর চক্ষে, এক বিন্দু জল, জীবনী-ক্রিয়াপূর্ণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মানবের বা জীবাত্মার আধ্যাত্মিক গঠন শিক্ষা ও বিকাশের তারতম্য অনুসারে এ বিশ্ব-বিকাশ মহান্, সুন্দর, ঐশিক, গরীয়ান্ বা ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খল ও কুৎসিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।"

"বালক যুবা পূর্ণবয়স্কে যেমন একই ভাবে অবিসম্বাদে এক পথ দিয়া জীবনের পরিণত স্থলে উপনীত হয়, আমাদের ইচ্ছা, সত্যানুসন্ধান কল্পে সকল মানবই যেন সেইরূপ এক পথে বিচরণ করেন।"

"সত্যের পথ, তাই কত সুন্দর!—কি অসীম কল্যাণ, কি বৈফল্যহীন আশীর্ব্বাদ, আমাদের তোমাদের জগতের সর্ব্বত্র, সকলের জীবনে দিন রাত ঝরিয়া পড়িতেছে।"

তোমাদের মনে উদয় হইবে, তাহা ছবিতে সম্পূর্ণ কাল ব্যাপ্তিতে নহে। কারণ আমাদের বিবাহ, পবিত্র সুন্দর, মধুর অনন্তকালস্থায়ী। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার সৌন্দর্য্য, মাধুরী—পুণ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার শেষ নাই, সীমা নাই,—কারণ তাহা অনন্তে সম্পূর্ণ।"

"যে আত্মার বিকাশ বৈধরূপে হইয়াছে, তাহার উদ্বেগ নাই। আমরা সত্য কি তাহা জানি তাই আমাদের বন্ধন নাই। এই মুক্তি, সত্যের সংখ্যাজন্য নহে, তাহার গুণজন্য। আমরা বহু আকারের সত্য জানি বলিয়া মুক্ত নহি, যাহা জানি তাহার পূর্ণ স্বরূপ জানি বলিয়া আমরা বন্ধনহীন।"

"আমাদের অন্তরাত্মার বৃদ্ধি অনুসারে, বিশ্বের মহত্ত্ব ক্ষুদ্রত্ব প্রতীয়মান হয়। আত্মা যতটা সত্য ধারণা ও অনুভব করিতে পারে, ততটা সত্য যদি কেহ আমাদের মধ্যে (আমাদের বলিলে মর্ত্ত্যের লোককেও বুঝাইয়া থাকে) তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে, প্রসঙ্গে, পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিও আপেক্ষিক ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।"

"যাঁহার অল্প সত্য আছে, জীবনে তিনি সর্ব্বদাই সন্দেহযুক্ত। সত্যই একমাত্র অনুসন্দেহ হইলে, মনুষ্য-জীবনেও তাহা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়, কয়জন তাহা খুঁজিয়া থাকে? স্বকীয় মত স্বকৃত গ্রন্থ প্রচলিত করাইতে সকলে ব্যস্ত। সংসারে প্রতিপত্তি হইবে, স্বনামে জগতে ধন্য মান্য হইবে, বিধান শাসনের রাজ্যে আমি একজন বৈবস্বত মনু হইব, এই বিকৃত লালসার জন্যই জগতে লোক সত্যের সন্ধান করে। আমাদের দেশে এরূপ বিকৃত বুদ্ধি নাই।"

আত্মার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও অধিক মহীয়ান্, অধিক গরীয়ান রূপে প্রতীয়মান হয়। তোমার জীবনে যত পল যত

মুহূর্ত্ত আছে, অনন্ত মনুষ্য-কল্পিত অনন্ত অপেক্ষা ততগুণ অধিক, ততগুণ মহত্তর।"

"এ বিশ্ব বাস্তবিকই অধিক বিশ্বব্যাপী হয় না, অনন্তর যথার্থই অধিকতর অনন্ত হইয়া দাঁড়ায় না। আত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্ব ও অনন্ত অধিক বিকশিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক জীবাত্মারই স্বীকার বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে, জড়াত্মিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

"সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এক মহাভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হয়। অতি সামান্য সংখ্যা ব্যতীত প্রায় সকল মনুষ্যই সত্য কি তাহা ধারণা করিতে পারে না, সত্য কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানে না, কিম্বা কেমন করিয়া সত্যকে অসত্য হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ করিয়া লইতে হয়, তাহাও তাহাদের বোধাতীত। অনেকেই ঘটনাশৃঙ্খলা বা কার্য্য পরম্পরাকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন। ঘটনা বা কার্য্য, পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, পদার্থের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের নাম সত্য।"

"ক্ষুদ্র জীবাণুর চক্ষে, এক বিন্দু জল, জীবনী-ক্রিয়াপূর্ণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মানবের বা জীবাত্মার আধ্যাত্মিক গঠন শিক্ষা ও বিকাশের তারতম্য অনুসারে এ বিশ্ব-বিকাশ মহান্, সুন্দর, ঐশিক, গরীয়ান্ বা ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খল ও কুৎসিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।"

"বালক যুবা পূর্ণবয়স্কে যেমন একই ভাবে অবিসম্বাদে এক পথ দিয়া জীবনের পরিণত স্থলে উপনীত হয়, আমাদের ইচ্ছা, সত্যানুসন্ধান কল্পে সকল মানবই যেন সেইরূপ এক পথে বিচরণ করেন।"

"সত্যের পথ, তাই কত সুন্দর!—কি অসীম কল্যাণ, কি বৈফল্যহীন আশীর্ব্বাদ, আমাদের তোমাদের জগতের সর্ব্বত্র, সকলের জীবনে দিন রাত ঝরিয়া পড়িতেছে।"

"আমার অকস্মাৎ মৃত্যুতে তুমি ও সমাজের সকলেই বড় বিস্মিত হইয়াছিলে। কিন্তু জগতে কোন জিনিষই হঠাৎ হয় না। আমার বর্ত্তমান সঙ্গীরা সকলেই তাহা জানিতেন ও বহুকাল হইতে এই ঘটনার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।"

"মর্ত্ত্যে আমি সত্য অনুসন্ধান করিতাম; লিখিতাম, বক্তৃতা করিতাম, সত্যের সাধনা করিতাম। কিন্তু সেই সকল কার্য্যব্যাপৃতির মাঝে আমি ধীরে ধীরে আমার আজন্মের সঙ্গ ও সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিতেছিলাম। আমার আত্মা, তোমার স্নেহ ভালবাসার তাপে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছিল, তোমার শিক্ষার বলে লোকান্তরীয় আলোক, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান তাহার উপরে পতিত হইতেছিল। আত্মলোকের ভৌগোলিক তত্ত্বসকল আমার উপর দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইতেছিল এবং আমার পরলোক প্রাপ্তির পূর্ব্ব সন্ধ্যায় আমার আত্মা, পারলৌকিক সুখ নিবাসের কথা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে বিস্ময়ে উন্নীত হইতেছিল। ক্রমে এ চিন্তা আমার দুর্ব্বল দেহের পক্ষে অত্যন্ত উন্নত, অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত বলবতী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতন প্রদেশ সকল যথাসম্ভব বিস্তৃত বিকশিত হইতে লাগিল; রক্তস্রোত ওতপ্রোত ভাবে আমার মস্তকে ছুটিতে লাগিল, নামিতে লাগিল। কি একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি আসিয়া আমার আত্মাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে আকর্ষণে আমি পরাজিত হইতে লাগিলাম। বুঝিতে পারিলাম, আমার ভিতরে যেমন একটা বিশেষ রকমের পরিবর্ত্তন চলিতেছে।"

"ভাগ্যক্রমে আমার মর্ত্ত্যগৃহে তখন কেহ ছিল না। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কাঁদিলে, আমার তাহাদের সহিত সহানুভূতি না হইয়া, বরং তাহাদের অজ্ঞতার প্রতি আমার একটু অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হইত।"

"আপনার কথা আমার মনে ছিল। মনে মনে আপনার অঙ্কিত সেই পরলোকের মানচিত্র, সেই আত্মার নিবাসভূমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। আপনি আধ্যাত্মিক শক্তির বলে আমার পূর্ব্বে সে রাজ্যে গিয়াছিলেন। আমার সে রাজ্যের পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। আমি সেই প্রতিনিবৃত্তিহীন সুখের যাত্রার জন্য আয়োজন করিতেছিলাম। সে পরিবর্ত্তন, সেই মরণের তীর্থসজ্জা কত প্রীতিপদ।"

"আমার মস্তিষ্কের উর্দ্ধতন প্রদেশ পূর্ণ বিকশিত হইল। তখন সহস্রারের সেই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র গহ্বর ভেদ করিয়া, আমার জীবাত্মা বহির্গত হইল। জীবাত্মাই যথার্থ "আমি" প্রকৃত মানব।"

"তখন শান্ত, নিস্তব্ধ, নিদ্রাগত কক্ষ, মর্ত্ত্যগৃহ, বাহ্য বা জড়জগৎ সবই বিলুপ্ত হইল। সকলই শূন্য, কিছুই না।"

"মৃত্যুকালে আমি চিৎ হইয়া শুইয়াছিলাম। আমি ঘুমাইতেছিলাম অথচ ঘুমাইতেছিলাম না। আমি যেন শরীরের ভিতর আছি, অথচ যেন দেহের বাহিরে। মনে হইতেছিল, যেন পৃথিবীতে আছি, অথচ পৃথিবীতে নাই।"

"তারপর নিদ্রা যেন আরও গাঢ় হইয়া আসিল,—এবং আমার আমিত্ব যেন গলিয়া গিয়া একটা অগাধ, অসীম সূক্ষ্ম ব্যোমের সাগরের ভিতর ডুবিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, আমি যেন একটা ঈশ্বরের বিশ্বাস, অনন্তের জীবনের পক্ষে বায়ুর মতন ঝরিয়া পড়িতেছিল। আমি যেন সর্ব্বত্র সকল দিকে পরিব্যাপ্ত। আর সীমা নাই,—অন্ত নাই—অস্তিত্ব আছে অথচ অস্তিত্বহীন। এ আনন্দের কথা বুঝাইব কি করিয়া!"

"সুখ বা প্রগাঢ় শান্তি আমার মনুষ্যজীবনের শেষ স্মৃতি। মনে হইতে লাগিল, কে যেন আমার আত্মাকে অনন্ত স্বর্গ-উৎসের ভিতর ঢালিয়া

দিয়াছে, আমি যেন ঈশ্বরের নিশ্বাস বায়ু, অগণ্য স্বর্গপুরুষগণ যেন আমায় হৃদয়ে পূরিয়াই বাঁচিয়া আছেন!"

"এইরূপ অমৃতীকরণ, পবিত্রীকরণের পর, আমার আমিত্ব যেন আবার ফিরাইয়া পাইলাম। আমার নরদেহ, যেন অন্যান্য ভুবনের সূক্ষ্মতর পুণ্যতর ব্যোমে নিশ্বাস লইতেছে। আমার স্থূল, মৃত শরীর, আমার নিম্নে বা পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে। আমার বন্ধু-বান্ধব চিকিৎসক প্রভৃতি তাহা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টারও কোন ক্রটী হইতেছে না। আপনাদের গণনা ধরিলে, আমি তখন সেই মৃতদেহের মস্তক হইতে দুই ফিটও দূরে ছিলাম না, তথাপি আমি অনন্তের জীব অনন্তে বাস করিতেছি।"

"এ পৃথিবীর কোন বিষয়ই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। অনেক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমার চারিধারে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা আমার আধ্যাত্মিক ভবনের নূতন সঙ্গী।"

"সেই নূতন সূক্ষ্ম ব্যোম আমার নূতন শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করিতে লাগিল; আমি নবজাত শিশুর মত, নূতন জীবনের আনন্দে অধীর হইয়া বাড়িতে লাগিলাম। আমার শোণিতের পরিবর্ত্তে দুগ্ধফেননিভ সূক্ষ্ম ব্যোম সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া, আমার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য আরম্ভ করিল। তখন মনে হইতে লাগিল, আমি আমার সঙ্গীদের অনুসরণ করিতে পারিব।"

"এ পৃথিবীর এক কেন্দ্রস্থিত আকাশ দিয়া, আমরা এ পৃথ্বীমণ্ডল ছাড়াইয়া চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে অনেক আত্মা, অনেক আতিবাহিক দেহীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

"দেখিলাম, সহস্র সহস্র যোজন অসীম ব্যাপ্তি বিস্তৃত রহিয়াছে। আর মনুষ্যজন্মের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ দৃষ্টি! দুই চারি ইঞ্চি ভিন্ন নজর হইত না।"

"অনিবার্য্য আকর্ষণের বলে আমরা একস্থানে আনীত হইলাম। বুঝিলাম আমরা দ্বিতীয় মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার শিক্ষা উপদেশ প্রমাণিত হইল।"

"অগণ্য ব্যক্তি লইয়া আমাদের সমাজ গঠিত। আত্মলোকের বিভিন্ন পল্লী, বিভিন্ন সমাজ দেখিয়া বেড়ান অপেক্ষা আমাদের অধিকতর আনন্দ কিছুই নাই।"

"মনুষ্য-জীবনে আমি গণিত বিদ্যার বড় পক্ষপাতী ছিলাম। গণিত শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব মীমাংসায় প্রায় দিন কাটিয়া যাইত। আমি এখন সে সকল চর্চ্চা ত্যাগ করিয়াছি। আধ্যাত্মিক কৌশিকত্বই আমার বর্ত্তমান অনুসন্ধেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি যাহা শিখিয়াছি, অনতিবিলম্বেই আপনি তাহা জানিতে পারিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পরলোকের পত্র।

গুরু। আর একখানি পরলোকের পত্র লইয়া, আমি এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। লোকান্তর হইতে যিনি এই সংবাদ প্রদান করেন তিনি জাতিতে গ্রীক বা যবন। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি গ্রীসে বর্ত্তমান ছিলেন। পত্রখানি এইরূপ। *

"বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আমিও একজন পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম। তোমাদের মত সুখে দুঃখে আমার দিন কাটিয়া যাইত। এখন সে সকল কথা মনে পড়িলে, আমার অর্থহীন স্বপ্ন-চ্ছায়া বলিয়া মনে হয়। গ্রীসে

* ডাক্তার এণ্ড্রু ডেভিসের "দি গ্রেট হারমোনিয়ম" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

আমার বাস ছিল। দেবতার মত, আমি আমার মাতৃভূমিকে পূজা করিতাম। গ্রীসের সন্তানকে আপনার পুত্র-কন্যার মত ভাল বাসিতাম। গ্রীসের সামাজিক বিধানকে শিক্ষা এবং সত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া আমার বিবেচনা হইত। কিন্তু বালক সমাজের মত, গ্রীসের সেই সন্তানমণ্ডলীর ভিতর বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজতন্ত্র ঘুচিয়া সাধারণ তন্ত্র হইল। আমি একটি সাধারণ তন্ত্রের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলাম। আমি এথেন্স নগরীতে শিক্ষক, শাসনকর্ত্তা ও ব্যবস্থাপকরূপে নিযুক্ত হইলাম। আমি যথাজ্ঞান যথাসাধ্য আমার কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ ছিলাম না। লোকে কিন্তু আমার সৎ উদ্দেশের বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। ক্রমে আমি পদচ্যুত ও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম। অতীত—ভগ্ন, ধ্বংসাবশেষপূর্ণ,—ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও দুজ্ঞের্য়। আমি জীবন-মরণের সমস্যা লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইলাম।”

“গ্রীসে তখন পৌরাণিক ধর্ম্ম খুব প্রবল। পৌরাণিকতায় অনেক সুন্দর সত্য থাকিলেও, আত্মার সকল সংশয় তাহাতে দূর হয় না। অন্ধকার রাত্রে, নিস্তব্ধ বনের ভিতর বসিয়া আমি জন্ম মৃত্যুর স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। দূর হইতে ইহুদী মেষপালকের সেই তামসী-গীতি “মৃত্যু—চিরনিদ্রা” “মরণের অন্ধ গিরিপথ” প্রভৃতির কল্লোল ধীরে ধীরে আসিয়া আমার আত্মায় আঘাত করিত। শুনিতাম, সেলামিসের বনের নৈশহৃদয়ের ভিতর স্পন্দিত হইতেছে “মৃত্যু—চিরনিদ্রা!” শুনিতাম গ্রীসীয় উপসাগরের তরঙ্গ-কল্লোল, কূলে তাল রাখিয়া গাহিতেছে “হু হু —মরণের অন্ধ-গিরিপথ।”

“আমার পদচ্যুত ও নির্ব্বাসনের তিন বৎসর পরে, আমার মনে হইতে লাগিল, এ সংসার-কারাগার হইতে আমার মুক্তির দিন আর দূরে নাই। দিন রাত কেমন নিরাপদে কাটিতে আরম্ভ করিল। মনে হইত প্রাণটার

উপর যেন স্তরে স্তরে অমাবস্যা চাপিয়া বসিতেছে। যখন মনে হইত, সাধু ব্যক্তিরা মরিয়া পুনর্ব্বার শ্রেষ্ঠ জগতে জন্ম গ্রহণ করেন, তখনই যেন সে অন্ধকার একটু ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যাইতে চাহিত। যেন কোন বহুদূরের বিপর্য্যস্ত চন্দ্রলোক, তাহার ভিতর একটু মুখ জাগাইয়া উঠিত। আমাদের দেশের দার্শনিক প্লেটোর নাম শুনিয়া থাকিবে। প্লেটো বলিতেছেন, সেলামিস ধ্বংস হইয়া আর একটি শ্রেষ্ঠ মহাদেশ উত্থিত হইবে, তাহার নাম য়্যাটল্যান্টিস, আমি লিখিয়া রাখিয়া গেলাম, আমার চিতাভস্ম যেন সেলামিস উপকূলে প্রক্ষিপ্ত হয়। শ্রেষ্ঠ দেশে পুণ্যতর মনুষ্য-সমাজে যেন পরজন্মে আমি আবার ভূমিষ্ঠ হইতে পারি।"

"তাহার পর আমার শেষ পীড়া হইল। দুই চারি সপ্তাহ কাটিয়া গেল —পীড়ার উপশম না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল যেন আমার ভয়ানক নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। আমি মরণে ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

"আমার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিতে, আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। যতই জাগিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই নিদ্রা গাঢ়তর হইতে লাগিল। শেষে, বাসগৃহ, বন্ধু-বান্ধব, বাহ্যজগৎ সকল যেন চিরদিনের মত মুখ লুকাইয়া নিবিড় অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া পড়িতে লাগিল।"

"সন্ধ্যাকালে আমার মৃত্যু হয়। তখন দুইটি ভিন্ন অন্য কোন আশা, অন্য কোন প্রার্থনা ছিল না। প্রথমটি য়্যাটল্যান্টিসে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ, দ্বিতীয়টি মৃত্যুকালে দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি।"

"অনেকক্ষণ পরে, আমার আমিত্বজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে, অনেক বর্দ্ধিত সুখ, অনেক বিশিষ্ট জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি আমার পার্থিব আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। তাহারা আমার কথা শুনিতে পায় না। যে স্থূল ইন্দ্রিয়ে

তাহারা শুনিতে পায়, যে স্থূল বায়ু অবলম্বনে মনুষ্যের বাক্‌শক্তি পরিস্ফুট হয়, আমার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। আমারও দেহ আছে, আমিও তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু তাহারা তাহা দেখিতে পাইতেছে না। আমি তাহাদের অন্তরাত্মা দেখিতে পাইতেছিলাম; তাহাদের কোন ভাব কোন চিন্তা আমার অগোচর ছিল না। দেখিতেছিলাম, মনুষ্যমাত্রেরই দেবতা হইবার অধিকার আছে। মৃত্যুর পর, সকল মানবেরই এ গরীয়ান্ অদৃষ্টফল পূর্ণ হইবে।"

"কাহার যেন সূক্ষ্ম সুরভি নিশ্বাসবায়ু আমার মুখে লাগিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, ঘনীভূত প্রীতি, ঘনীভূত ভালবাসা লইয়া অসংখ্য আধ্যাত্মিক পুরুষ আমার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। সূক্ষ্ম ব্যোমে আমার শ্বাস-যন্ত্র ফুলিতে লাগিল। জ্যোতিষ্মৎ বন্যা আমার ধমনীতে বিচরণ করিতে লাগিল। এই নব য়্যাটল্যান্টিস্! আমি আজ অমর জীবনের অমৃতময় সাধারণ-তন্ত্রে উপস্থিত হইয়াছি।"

"তার পর, আমার মনে হইল, আমার অন্তরাত্মা যেন বলিতেছে, জীবন্তে যাহা খুঁজিতে, যাহাদের খুঁজিতে, তাহাদের সঙ্গে গিয়া মিলিত হও। সে চিন্তার অনিবার্য্য আকর্ষণে আমি ছুটিলাম। মনুষ্য-জীবনে এথেন্স-নগরীতে আমার যে দুইজন প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সেই অভাবনীয় মিলনের সুখ! সেই দেহের ব্যবধান হীন প্রাণ আদান প্রদান! মৃত্যু কি, মরণে সুখ কি, স্বর্গ কি, স্বর্গ-সুখ কি, মনুষ্যজীবনে কে তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে? মরণ—স্মৃতিহীন অনন্ত নিদ্রা নহে, তাহা নব আলোক, নবীন—প্রবীণতম সত্যে নব জন্ম! মরণের পথ অন্ধকার গিরিসঙ্কট নহে, তাহা অক্ষয় অব্যয় সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত আনন্দ-বর্ত্ম।"

"মানুষের আত্মা অমর।" একথা শুনিলে তুমি বলিবে, তাহার

প্রত্যক্ষ, স্পর্শক্ষম প্রমাণ কোথায়? আমি তোমায় আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না। আমি বলিতেছি না, কৃষ্ণ বা খৃষ্ট, গর্গ বা পতঞ্জলি, ব্যাস বা বাদরায়ণ, প্লেটো বা পাইথাগোরাস বলিয়াছেন বলিয়াই, তোমাকে আত্মার অমরত্ব মানিয়া লইতে হইবে। বিশ্বপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে সর্ব্বত্রই এই সত্য অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা অমর কারণ—

১। বিশ্বপ্রকৃতি, আপনার বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্য-শরীরে বিকশিত হয়েন ;—

২। মনুষ্য-শরীর জীবাত্মার বিকাশ সাধন করিবার জন্যই বিকশিত হয়েন ;—

৩। প্রত্যেক জীবাত্মাই এরূপভাবে বিকশিত হয়, যাহাতে জগতের অন্য সমস্ত পদার্থ ও অন্য সমস্ত জীবাত্মার সহিত তাহার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং জীবাত্মার ব্যক্তিগত ভেদ অনন্তকাল ও অনন্ত-মণ্ডল (Sphere) ব্যাপী।

মনুষ্যাত্মার ভিতর এমন ক্ষমতা, এমন সম্মিলনী শক্তি আছে, এমনি একটা বন্ধনীতে জীবাত্মার আমিত্ব বাঁধা যে, বিশ্ব প্রলয়েও তাহার বিশ্লেষ হয় না। সুতরাং জীবাত্মা অমর।

তবে মানুষ কাঁদিবে কেন? মরণে রোদন কোথায় আছে? আমরা মুদিত চক্ষু, শীতল, আড়ষ্ট দেহ দেখিয়া কাঁদিয়া উঠি, পরলোকে আত্মার নব জন্মোৎসবের মঙ্গলধ্বনি শুনিতে পাই না বলিয়া আত্মলোক হইতে অনেক সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি ; অনেক কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ দিবা-রাত্রি এ পৃথিবীর চারিধারে হাসিয়া ফিরিতেছে। বর্ত্তমানে সাধারণ মনুষ্যের উহা অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। দিন দিন, পলে পলে, মনুষ্যসমাজ উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইতেছে। ভবিষ্যতে যে স্বর্গে মর্ত্ত্যে সাধারণের চিঠিপত্র চলিবে তাহা খুব নিকট।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবস্থা-জ্ঞাপন-মূর্ত্তি।

শিষ্য। পরলোকগত আত্মার অবিনশ্বর সূক্ষ্ম শরীরে স্থূল দেহের আকৃতি, সৌন্দর্য্য, বসন, ভূষণ এমন কি ক্ষত চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকার কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়;— ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? জড়দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সূক্ষ্মদেহে জীবাত্মা বহির্গত হইয়া যায়, তবে আবার কি প্রকারে ভৌতিক দেহ ধারণ করিতে পারে?

গুরু। সূক্ষ্মদেহে জড়শরীরের কোন ভাব বা আভাসই বর্ত্তমান থাকে না বা কোন ক্ষত কি যন্ত্রণার নিদর্শনও সে অধ্যাত্মশরীরে বিদ্যমান থাকে না। তবে প্রেত বা আত্মিকগণ অবস্থা বিশেষে নিজ নিজ পরিত্যক্ত জড়দেহের অবস্থা-জ্ঞাপক-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন। তাঁহারা জড়-জগতের মানুষের নিকটে নিজের পরিচয়দানার্থ, কিম্বা কোন বিশেষ অবস্থা জানাইবার জন্য এই প্রকার করিয়া থাকেন। আমাদের হিন্দু ঋষিগণ, এই প্রকার মূর্ত্তিকে কাম-রূপ অর্থাৎ কামনার অনুরূপ রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

শিষ্য। আত্মিক কি যখন ইচ্ছা তখনই, ঐরূপ রূপ ধারণ করিতে পারেন?

গুরু। না, সকল আত্মিকগণই যখন ইচ্ছা তখনই এইরূপ অবস্থা-জ্ঞাপক-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন না। যাঁহারা অধিকতর উচ্চে—তাঁহারাই পারেন। অন্যান্য সকলে, কেবল কোন কারণে আন্তরিক ইচ্ছাশক্তির বলে, এইরূপ মূর্ত্তি ধারণে সক্ষম হয়েন, নতুবা ইচ্ছা করিলেই যখন তখন পারেন না।

শিষ্য। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। এই পার্থিব জগতে থাকিয়া অনেক যোগাদির বলে জীবাত্মাকে পার্থিব দেহ হইতে বাহির করিয়া, যেখানে ইচ্ছা লইতে পারেন, সেখানকার ইচ্ছা সংবাদ পাইতে পারেন, যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে যাইতে পারেন, অথচ সাধারণে পারে কি? সেইরূপ যাঁহারা উচ্চস্থানের, তাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই অবস্থা-জ্ঞাপক-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন; আর যাঁহারা সেরূপ নহেন,—তাঁহারা, কোন বিশেষ কারণে ইচ্ছাশক্তির প্রবল উদ্যমেই, অবস্থা-জ্ঞাপক-পরিত্যক্ত-পার্থিব-মূর্ত্তি ধারণ করেন। অবশ্যই ইহা সর্ব্বদাই ঘটে না—বিশেষ বিশেষ কারণে ঘটিয়া থাকে। আমি তোমাকে এইরূপ কতকগুলি আত্মিক-কাহিনী শুনাইতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

প্রতিহিংসা।

প্রতিহিংসার বাসনাও একটী পার্থিব প্রবল আকর্ষণ। এই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, জীবাত্মা উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে না, প্রতিহিংসা সাধনে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকে। তাহারা এই প্রতিহিংসা-অনলে দিবারাত্রি জ্বলিতে থাকে। যাহারা সুখ-সুপ্ত-মানবের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তাহার প্রাণে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বালিয়া দেয়, তাহারাও

মহাপাপী। এই সম্বন্ধে কতকগুলি প্রামাণিক কাহিনী তোমাকে শুনাইব।

সুবিখ্যাত থিয়োসফিক্যাল রিভিউর মাননীয় সম্পাদক লিখিয়াছেন— মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহিংসাবৃত্তি যে মরিয়া যায় না, গত বিংশতি বৎসরে আমি তাহার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। *

১। উক্ত সম্পাদক ঐ কথারই প্রমাণ জন্য ঐ স্থলে লিখিয়াছেন,— "আমার একজন শিক্ষিত বন্ধু কোন উপায়ে একখানি ছুরিকা প্রাপ্ত হয়েন। ছুরিকাখানি হাতে করিলেই অদম্য স্ত্রীহত্যালালসা মনোমধ্যে জাগরূক হইত। তিনি কিছুতেই এই লালসাকে দমন করিতে পারিতেন না। যখন ছুরিকাখানি হাত হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইত, তখনই সে বাসনার নিবৃত্তি হইত। তখন তিনি বিশেষরূপে উহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, এই অনুসন্ধানের ফলে অবগত হইতে পারা যায় যে,—অন্ততঃ দুইটী স্ত্রীলোক এই ছুরিকাঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। বন্ধুর নিকটে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আমি একদিন ঐ ছুরিকা খানি হাতে করিয়া বসিলাম। প্রথমে আমার মনে বাস্তবিকই স্ত্রীহত্যার বাসনা উদিত হইল এবং তাহার অল্পক্ষণ পরেই আমার মনে হইতে লাগিল; কে যেন আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি জোর করিয়া বসিয়া রহিলাম,—শেষ ফল কি, জানিবার জন্য ছুরিকাও পরিত্যাগ করিলাম না এবং উঠিয়া গেলাম না। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

আরও কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, একজন পাঠান আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠানের মুখ ভ্রূভঙ্গিপূর্ণ, ক্রুদ্ধ ও বিকট— দেখিলে বোধ হয়, আমায় টলাইতে পারে নাই বলিয়া অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ।

* The Osophical Review. Vol. XXII P. 181

ছায়ামূর্ত্তি আমার আত্মায় প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, আমিও যথাসাধ্য শক্তিসঞ্চয় করিয়া, অটল হইয়া বসিয়া রহিলাম। চিৎ-শক্তির উর্দ্ধস্তরে অধিরোহণ করিয়া দেখিলাম, পাঠানের স্ত্রী অপর পুরুষের সহিত পলাইয়া যাইতেছে। কামিনী উপপতির গলদেশে বাহুলতা বেষ্টন করিয়া ঝুলিয়া পড়িল,—অমনি পশ্চাৎ হইতে সেই পাঠান আসিয়া, ছুরিকাঘাতে রমণীর প্রেমপ্রীতি ও জীবনী-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সেইদিন অবধি পাঠান জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা শপথ করিয়াছে। তৎপরে সে সেই ছুরিকাঘাতে আপন শ্যালিকা ও অন্য এক-জন স্ত্রীলোককে হত্যা করে। অবশেষে আপনিও অপরে হস্তে নিহত হয়। মৃত্যুর পরক্ষণ হইতেই পাঠানের আত্মা এই ছুরিকাগ্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সেইদিন হইতে এই ছুরিকা যাহার হস্তে আইসে, তাহারই নারী বধে অদম্য স্পৃহা জাগরূক হয়। আমাকে অটল দেখিয়া পাঠান এক্ষেত্রে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ছুরিকাখানি আমি আমার একজন ভারতবর্ষীয় বন্ধুর হস্তে অর্পণ করি। তিনি পাঠানের প্রেতাত্মাকে উর্দ্ধজীবন লাভের উপায় দেখাইয়া দেন। তৎপরে ভগ্ন ছুরিকা অবশ্যই ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়াছে।”

২। ১৭৪৯ অব্দে ২৮এ অক্টোবর, গাইডিস্ রেজিমেণ্টের সার্জ্জেণ্ট অর্থর ডেভিস্ নিহত হন। ইহার নিকট অনেক অর্থ ও বহুমূল্য চেন অঙ্গুরীয়কাদি ছিল। সাধারণের ধারণা, কোনও দস্যুদল ঐ অর্থলোভে ডেভিস্‌কে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ অনেক অনুসন্ধানেও হত্যাকারীকে ধৃত করিতে পারিল না। কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া গেল। পাঁচ বৎসর পরে স্কট্‌লণ্ডের অন্তর্গত ইন্‌ভার্ণা-নিবাসী ম্যাক্‌ফার্সন নামক একজন কৃষকযুবক, একদিন রাত্রে অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায়, তাহার শয়ন-কুটীর-দ্বারে একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। ঐ মূর্ত্তি তাহার বন্ধু ফার্গুসন জ্ঞানে সে

শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল,—এবং ঐ মূর্ত্তির নিকটে গমন করিল। ছায়ামূর্ত্তি বলিল, আমি সার্জ্জেণ্ট ডেভিসের প্রেতাত্মা। আমাকে দুরাত্মারা হত্যা করিয়াছে এবং আমার দেহ-কঙ্কাল এখনও হিল অব্ ক্রাইষ্ট নামক স্থানে আছে, তুমি উহা সমধিস্থ করিও। প্রতিহিংসা-বিষে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে, যদি সুবিধা বুঝ, তবে সেই হত্যাকারীদের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়া, যাহাতে তাহারা সাজা পাইতে পারে, তাহা করিও। ম্যাক্‌ফার্স´ন ছায়ামূর্ত্তির কথাতে ভীত হইয়াছিল, সুতরাং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে ম্যাক্‌ফার্স´ন তাহার বন্ধুর নিকট সমস্ত কথা বলিল,—তাহার বন্ধু ফার্গু´সন বলিলেন,—"তাহার হত্যাকারী কে, তাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?—ম্যাক্‌ফার্স´ন বলিলেন, "ভয়ে আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।" তখন উভয় বন্ধুতে প্রেত নির্দ্দেশিত স্থানে গমন করিয়া যথার্থই একটি নরকঙ্কাল দেখিতে পায়, এবং ঐ নরকঙ্কালকে সমাধিস্থ করে।

আর একদিন ডেভিসের ছায়ামূর্ত্তি ম্যাক্‌ফার্স´নের কুটীরদ্বারে আসিয়া দর্শন দেয়। সেদিন ম্যাক্‌ফার্স´ন অনেকটা সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনাকে কে হত্যা করিয়াছিল?" ডেভিসের ছায়ামূর্ত্তি বলিল "পর্ব্বতনিবাসী ডন্‌কান ও ম্যাক্‌ডোনাণ্ড আমাকে হত্যা করিয়াছে। তাহাদের উপর আমার দারুণ প্রতিহিংসা,—তুমি দয়া করিয়া তাহাদিগকে পুলিশে ধরাইয়া দাও।" ডেভিস্ তৎপরদিবস ঐ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করে—১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন, এডিনবরায় ডন্‌কান ম্যাক্‌ডোনাণ্ড ধৃত হইয়া প্রধান ফৌজদারী আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত হয়। পুলিশের অনুসন্ধানে ঐ আসামীগণের নিকটে ডেভিসের কোন কোন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। ম্যাক্‌ফার্স´ন ও ফার্গু´সন

ব্যতীত ঐ মোকদ্দমায় ইজাবল মেকার্ডাই সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তর্কনীতির মহীয়সী মহিমায় আইনের অসহনীয় আবর্ত্তে—“ডেভিস্ ইংরাজী কথা কহিত এবং ম্যাক্‌ফার্সন গলভাষায় কথা কহিতেছে ও ইংরাজীভাষা জানে না, ঐ সাক্ষ্য কি প্রকারে ডেভিসের প্রেতাত্মার কথা বুঝিতে পারিল,” এই হেতুবাদের উপর নির্ভর করিয়া বিচারকগণ আসামীদ্বয়কে খালাস দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেতাত্মার সর্ব্বভাষায় অভিজ্ঞতা ও বলিবার ক্ষমতার কথা আদালতে গ্রাহ্য না হইলেও কিন্তু অনেকেই এ বিচারে দোষারোপ করিয়াছিল।

৩। ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে ডারবিশায়র। চেষ্টার ডারবিশায়র একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। এই নগরে পুরাতন ও প্রসিদ্ধ হার্ডউইকহল অবস্থিত। ইহার অধিস্বামীগণ বিস্তৃত জমীদারীর জমীদার ও ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান ব্যারনেট।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, হাডউইকহলের তখনকার অধিস্বামীর নাম সার রাল্‌ফ হাডউইক। রাল্‌ফ সুস্থদেহী যুবক ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র। রাল্‌ফের গুণবতী স্ত্রী যেমন রূপসী, তেমনি নানা গুণে গুণবতী। সর্ব্বসুখে সুখী বুঝি মানুষ হইতে পারে না,—তাই একটি মাত্র শিশুপুত্র রাখিয়া রাল্‌ফের গুণবতী স্ত্রী ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন,—রাল্‌ফ সমুদয় জগৎ শূন্য দেখিলেন। পত্নীপ্রেমের স্মৃতিটুকু লইয়া অনেকদিন অতিবাহিত করিয়া শেষে রাল্‌ফ ইথেলমুর নাম্নী এক অপ্সরারূপের স্ফুরন্ত জ্যোতিৰ্ম্ময়ী যুবতী বিবাহ করিলেন। কিন্তু এ বিবাহে তিনি সুখী হইতে পারিলেন না। অল্পদিনের মধ্যে রাল্‌ফ বুঝিতে পারিলেন,—যেমন যায় তেমন বুঝি আর হয় না। ইথেলমুরের রূপ আছে, গুণ নাই—সে রূপের অহঙ্কারে ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করে। তাহার চিত্ত অত্যন্ত কুটিল-বুদ্ধি, হিংসা ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।

যাহা হউক, ইথেলমুরের গর্ভেও একটি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় একসঙ্গে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইতে লাগিল। রাল্‌ফ দাম্ভিকা পত্নীর প্রেমে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া, পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা বিষয়ে মনঃসংযোগী হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে দ্রষ্টব্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হইলেও, পরিবারস্থ দাসদাসীগণের সকলের মনো-মূলে এক গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত। জ্যেষ্ঠ চিরন্তন নিয়মানুসারে এই বিস্তৃত জমীদারী হার্ডউইকহলের অধিস্বামী হইবে এবং কনিষ্ঠ নিঃস্ব ও চাকুরী উপজীবী হইবে। ছায়ার মত এমনি একটা ভাব ভিতরে ভিতরে থাকিলেও, সুস্পষ্টরূপে কেহ বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। সর্ব্ব প্রথমে কনিষ্ঠ পুত্রের মাতার মনে এই ভাব সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইল,—তিনি অহোরাত্র এই বিষয়েই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কেন না.—তাঁহারই পুত্র কনিষ্ঠ, বংশপরম্পরাগত নিয়মানুসারে তাঁহারই পুত্র বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে না।

আরও কয়েক বৎসর কাল-সাগরে ডুবিয়া গেল। সার রাল্‌ফ হার্ড-উইক স্বর্গগত হইলেন। দুই এক মাস পরেই তাঁহার পূর্ব্বপত্নীর গর্ভ-জাত যুবক এস্ সিটন সার রাল্‌ফ এস্ সিটনরূপে হার্ডউইক সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। যুবক এস্ সিটন তাঁহার পিতৃনির্দ্দেশ মতে মিস্ ফিলিসিয়া উইনগ্রোভ নাম্নী এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে বিবাহার্থ নির্ব্বাচিত করিয়া, গৃহে আনিয়া রাখিয়াছেন,—তাঁহার পিতৃ আজ্ঞামতে বয়ঃপ্রাপ্তির উৎসব ও পরিণয়-উৎসব একত্রেই সম্পন্ন হইবে। সে উৎসবদিনের আর অধিক দিন সময় নাই,—সে জন্য কর্ম্মচারিবর্গ সকলেই ব্যস্ত। সেই মহাসমারোহ কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য সকলেই কার্য্যতৎপর।

যুবক এস্ সিটনের ভাবীপত্নী মিস্ ফিলিসিয়া সুন্দরী যুবতী, তাঁহার কমনীয় কান্তি প্রস্ফুট গোলাপের ন্যায় মনোহারিণী। স্বভাবও নম্র এবং বিনীত। সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া প্রীত ও মুগ্ধ হইল।

সার্ রাল্ফের বিধবা পত্নী লেডী হার্ডউইকের হৃদয়ে কিন্তু দারুণ বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পুত্র কিছুই পাইবে না, আর সপত্নী-পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল!

একদিন গ্রীষ্মকালে অপরাহ্ন সময়ে, যুবক এস্ সিটন ও তাঁহার ভাবীপত্নী সুন্দরী যুবতী ফিলিসিয়া উদ্যান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, এবং প্রণয়-মুগ্ধ হৃদয়ে উভয়ে বহু প্রকারের গল্প-গুজব করিতেছিলেন। এমন সময় গবাক্ষপার্শ্ব দিয়া, তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া লেডি হার্ড-উইক দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ইহাই দেখিতে হইল। আমার গর্ভ-জাত পুত্র ফিলিপ কিছুই পাইল না। এতকাণ্ড করিয়াও কেবল আমার পুত্রের অলসতায় কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে।"

এই সময় তাহার পুত্র ফিলিপ তদীয় পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"মা! তুমি কি বলিতেছিলে?"

পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জননী বলিলেন,—"গবাক্ষ পথ দিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া দেখ।"

ফিলিপ বলিল,—"দেখিতেছি মা; অনভ্রদিবার আলোক অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর প্রভা,—দেব-প্রভাময়ী উষা অপেক্ষাও অধিকতর মনোহারিণী ঐ যুবতীকে দেখিতেছি মা—কিন্তু উহাকে যদি হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারি, তবে আমি আর বাঁচিব না।"

জননী বলিলেন,—"তুমি আলস্য-পরায়ণ জড়প্রকৃতির যুবক! তোমার ভাগ্যে কখনই এই অতুল সম্পত্তির সহিত ঐ যুবতী লাভ সম্ভবে না।"

ফিলিপ উচ্চকণ্ঠে বলিল,—আমি এখন সব পারিব মা—সব পারিব।

জননী বলিলেন,—“বিশ্বাস হয় না। যদি পার, তবে শোন,”—এই কথা বলিয়া পুত্রের কাণের কাছে মুখ লইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথা বলিলেন। পুত্র দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া বলিল,—“পারিব, আমি এখনই চলিলাম।”

তৎপরদিবস কেহই আর রাল্‌ফ এস্ সিটনের সাক্ষাৎ পাইল না।—সঙ্গে সঙ্গে ইতালীদেশীয় দুইজন ভৃত্যও নিরুদ্দেশ। সহসা তিনি কোথায় গেলেন ভাবিয়া সকলেই বিস্মিত ও আকুলিত হইলেন। দিনের পর দিন গেল, চারিদিকে অনুসন্ধানেও যখন আর তাঁহার সন্ধান মিলিল না,—তখন ডিটেক্‌টিভের দলও চারিদিক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান নাই। তখন ফিলিপই হাডউইকহলের উত্তরাধিকারীরূপে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ফিলিসিয়ার ভাবী স্বামীরূপে গণ্য হইলেন।

যেদিন হইতে এস্ সিটন অদর্শন হইয়াছেন, সেইদিন হইতে হার্ডউইক হলে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে সকলেই জানিতে পারিল যে, হার্ডউইকহল কিছুকাল হইতে প্রেতমূর্ত্তির নৈশ বিচরণে একটু বেশী উৎপীড়িত হইতেছে। ইহা কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু দাস-দাসীগণ রাত্রিতে বাহির হইত না। তাহারা ভয়ে নিতান্ত সঙ্কোচিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিন ফিলিপ স্বীয় ভাবীপত্নী সুন্দরী ফিলিসিয়াকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। সঙ্গে দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধব, শিকারী কুকুর, অশ্ব প্রভৃতি বহুপরিমাণে গমন করিল।

সর্ব্বপ্রথমে একটি মৃগশাবককে দেখিতে পাইয়া, ফিলিপ ও ফিলিসিয়া তাহার পশ্চাৎ অশ্ব চালাইয়া দিলেন,—একটু দূরে গিয়া, পার্শ্বোপগতা ফিলিসিয়ার দিকে চাহিয়া, ফিলিপ কি একটা সুখ-সোহাগের কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একজন অশ্বারোহী

তাঁহাদের পাশে পাশে আসিতেছে। আরও স্পষ্টভাবে চাহিয়া দেখিলেন,—এ অশ্বারোহী ও অশ্ব, অন্য অশ্বারোহী বা অশ্বের মত নহে। এ অশ্বারোহী বা অশ্বের গতি আছে, শব্দ নাই,—অবয়ব আছে, সে অবয়বে জড় পরমাণু ঘন-সন্নিবেশ নাই। অশ্বারোহী ও অশ্ব উভয়েই যেন বাষ্পময় ছায়ামূর্ত্তি। ফিলিপ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, ফিলিপের বেগবান্ অশ্বও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ফিলিসিয়াও রোমাঞ্চিত কলেবরে স্তব্ধনেত্রে সেই ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিলেন। ছায়া-মূর্ত্তি যুবতীর মুখের দিকে তীব্র তিরস্কার ও ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিল,—সে মূর্ত্তি এস্ সিটনের। ফিলিপের অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া লাফাইতে লাগিল, ফিলিপ ভয়ে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন,—ফিলিসিয়া অশ্ব হইতে পড়িলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারও বদনে বিবর্ণ পাণ্ডুরেখা, বুকে ধড়ফড়ি এবং সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর কম্প। ভৃত্যগণ তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। সকলেই স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া পড়িল।

কুকুরগুলি অস্বাভাবিকরূপে ডাকিতে ডাকিতে একটা স্থান খুঁড়িতে লাগিল। তখন অপরাপর ভদ্রপারিষদগণ খনিত্র দ্বারা সেই স্থান খুঁড়িয়া দেখিলেন,—তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইল;—মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন—যুবক এস্ সিটনের মৃতদেহ ঐ স্থানে নিহিত রহিয়াছে—দেহের নানা স্থানে গভীর অস্ত্র-ক্ষত বিদ্যমান। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভগ্ন, কর্দ্দমাক্ত ও শোণিতসিক্ত। সকলেই বুঝিলেন, এস্ সিটন নিষ্ঠুরভাবে এই স্থানে নিহত হইয়াছেন। চারিদিকে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। হার্ডউইক-হলেও এই সংবাদ পৌঁছিল। মুরতনয়া লেডী হার্ডউইক, ইহা শুনিবামাত্র বজ্রাহতের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং ক্ষীপ্তার ন্যায় ছুটিয়া বারেণ্ডার দিকে গেলেন, এবং সেখানে সিঁড়ির নিকটবর্ত্তী গেলারিতে দাঁড়াইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই তাঁহার নিকটে

শুনিতে পাইল, তাঁহারা কেমন করিয়া মাতা পুত্রে এস্ সিটনকে নিহত করিয়াছিলেন। অধিকন্তু যে দুইজন ইটালীয় ভৃত্যের দ্বারা এস্ সিটনকে হত্যা করিয়াছিলেন, আবার পাছে তাহাদের দ্বারা কথা প্রকাশ হয় বলিয়া তাহাদিগকেও হত্যা করেন,—লেডী এখন তাহাদের কবরস্থান ও হত্যার কথা প্রকাশ করিলেন। সকলে সেই ন্যক্কারজনক কবর খুঁড়িয়া, তাহাদের ভয়ানক মৃতদেহ দেখিতে পাইল। লেডী আবিষ্ট হইয়াই, উন্মাদের ন্যায় সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহাপাতকে হার্ডউইকহলের অধঃপতন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সূক্ষ্মভাব ও ভাব-ব্যূহ।

Thought form.

গুরু। জীবনের প্রত্যেক স্বার্থ-সিদ্ধি চিন্তা বা যে চিন্তা স্বার্থপর ইষ্ট-ভাব-কলুষিত, সে চিন্তা মৃত্যুর পর ব্যূহরূপে প্রেতাত্মাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। সেইরূপ চিন্তা জীবনে যত বলবতী হয়, প্রেতাবস্থায় তজ্জনিত ভাব-ব্যূহও সেইরূপ প্রবল হয়। স্থূল বা মনুষ্য-জীবনেও সু বা কুচিন্তার ফলাফল একবারে অনতিক্রমনীয় না হইলেও মৃত্যুর পর তাহা বলিষ্ঠ সত্তারূপে পরিলক্ষিত হয়। মনের পাপ, পাপ নহে বলিয়া আমরা অনেক সময়ে অসচ্চিন্তাশীল মানুষকে মার্জ্জনা করিয়া থাকি, কিন্তু জগতে যদি কোন পাপ অনুপেক্ষা করিবার থাকে, তবে তাহা চিন্তাগত মহাপাতক।

মনুষ্যজীবনেও অপরের সদিচ্ছা—অসদিচ্ছা, অনুরাগ—অপ্রীতি, উপেক্ষা—ভালবাসা আমরা দূরে থাকিয়া অনুভব করিতে পারি। জীবনে

যে অনেককে কাঁদাইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার জীবনে সেই সকল সমবেত রোদন অশরীরী প্রেতাত্মার মত দিবা রাত্রি কাঁদিয়া বেড়ায়। সকল সুখের অধিপতি হইলেও সে ব্যক্তির অন্তঃকরণ রোদন-পূর্ণ শ্মশান-ভূমি। আমরা মনে করিলেই ইহ সংসারের প্রীতি ভালবাসা, মৃত্যুর পরপারে কোন পরলোকগত বন্ধুর উদ্দেশে পাঠাইয়া দিতে পারি। এমন কি, অন্তঃকরণের নিগূঢ় নিবিড় স্নেহ প্রীতি দিয়া, প্রেত জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার মাঝে, তাহাকে শান্তির অক্ষয় কবচে আবৃত করিয়া রাখিতে পারি। অন্যপক্ষে ইহজীবনে যাঁহারা কেবল রোদন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, অনেকের সুখের হৃদয়-তন্ত্রী যাহার জন্য চিরদিনের মত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তিনি দেখিবেন, মৃত্যুর পর, কেমন করিয়া যেন সেই সকল তন্ত্রীর ছিন্ন তার তাঁহার আত্মার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। দিন নাই রাত্রি নাই, কেমন সেই কর্কশ, ঘর্ঘর, আকুল-বিলাপ, সেই তালহীন, অন্তহীন বিলাপরাগিণী, আণবিক কম্পনের মত, তরঙ্গে তরঙ্গে, হিল্লোলে হিল্লোলে তাঁহার আত্মার চারিদিকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই চিন্তাবোধ বা ভাবব্যূহ, অন্ধশক্তির ন্যায়, আত্মার পথ আগুলিয়া ধরে। প্রেতাত্মা, ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে এ প্রাচীর অতিক্রম করিতে পারিলেও, অনেক সময় যে ইহা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, তাহার সন্দেহ নাই। তুমি বলিতে পার, চিন্তাব্যূহের ফল দুরতিক্রমণীয় হইলেও ক্ষণিক। কিন্তু ক্ষণিক হইলেও বন্ধুজনাগত অপ্রিয়-ভাবব্যূহ প্রেতাত্মার পক্ষে বড় সামান্য বিভীষিকা নহে।

শিষ্য। ঐরূপ ভাবের পরলোকগত বিদেহী আত্মার কয়েকটী প্রামাণিক কথা শুনিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইতেছে।

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর।

১। আমি একটি স্ত্রীলোকের কথা বলিতেছি। সভ্যজগতে সে জাতীয় রমণীর অভাব নাই। সাধারণ রঙ্গালয়ে নৃত্যগীত করিয়া, সংসারে মদন ও মরণের অভিনয় অনেক স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে, এ রমণীও তাহা করিত। ক্রমে ক্রমে অনেক পুরুষ হৃদয়, অযাচিত অর্ঘ্যরূপে তাহার পায়ের তলায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। রমণী তাহার কোনটীকে ডিঙ্গাইয়া, কোনটীকে বা চরণে দলিত করিয়া গেল। একদিন যখন দেখিল যে, রণক্ষেত্রে হতাহতের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, মৃতের ভিড় ঠেলিয়া আর চলিয়া যাওয়া যায় না, এমন কি তাহাতে জীবনের ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রণয়ীগণের মুণ্ডমালা পরিলেও জীবনের পথে চলিবার সুব্যবস্থা করা যায় না, তখন সে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ মরণের খিড়কির পথ দিয়া, ইহলোক হইতে অলক্ষ্যে পলাইয়া গেল।

রমণী পলাইল বটে, সঙ্কট কিন্তু পলাইতে চাহে না। দীর্ণ জীর্ণ বুক, রুগ্ন ভগ্ন আশা, দলে দলে তাহার পিছু ছুটিতে লাগিল; শেষে পরলোকের ভিতর আত্মার চারিপাশ ঘেরিয়া, তাহারা বেশ দলবদ্ধ হইয়া বসিতে লাগিল। প্রণয়ের দাবী প্রাণ গেলেও ঘুচিতে চায় না। আবার 'ইহজীবনের শত শত প্রণয়ী যেন, সেই অবাঞ্ছিত, পুরাতন প্রীতির ক্ষতিপূরণ দরখাস্ত লইয়া, অতি ভয়ানক খেসারৎ আদায় করিতে চাহে। রমণী পলাইতে যায়, পলাইবার উপায় নাই, সকল পথ রুদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি যোগবলে এ ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি অভাগীর ভীতির কারণ নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু রমণী, ক্ষুদ্রত্বের উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, বিশেষ কোন উন্নতির পথ খুঁজিয়া পাইল না।

২। জীবনে যেরূপ পাপ করা যায়, মরণে তাহার সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত

হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত প্রকৃত ঘটনাটি তাহার উদাহরণ স্থল। আরব দেশের কোন স্থানে দুইটি লোক বাস করিত। আবাল্যের স্নেহপ্রীতি ও একত্র বসবাস-জনিত বন্ধুত্বের সহিত তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরে শ্রদ্ধাভক্তিও বর্দ্ধিত হয়। কিয়দ্দিবস পরে তাহাদের মধ্যে একজন কোন রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয়। দুর্দ্দৈবক্রমে অপর বন্ধুও সেই রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকটী প্রথম বন্ধুটীর প্রতি আপেক্ষিক অধিক অনুরাগিণী ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে ইষ্টসিদ্ধির পথে অন্তরায় ভাবিয়া, শত্রুদল-মধ্যে তাহাকে বিক্রয় করিয়া আইসে। কিছুদিন পরেই শত্রুগণ তাহাকে নিধন করিয়া ফেলিলে, রমণী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিল। তাহা দেখিয়া দ্বিতীয় বন্ধু আত্মহত্যা করিল। তাহার পর, প্রথম ব্যক্তির আত্মা, অকপট প্রেম-পরবশ হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করে। দ্বিতীয় ব্যক্তির আত্মাকেও সেই আহ্বান-আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি পাতকে লিপ্ত, সে পলায়ন করিতে চাহে—এ দিকে ভালবাসার আকুল আকর্ষণে তাহাকে বাধ্য হইয়া তাহার নিকটে আসিতে হয়, অমনি ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মত, তাহার আত্মকৃত পাতকের স্মৃতি, তাহাকে মর্ম্মন্তুদ শত-বৃশ্চিক-দংশনে জ্বালাইতে আরম্ভ করে। *

"দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান ও ব্যভিচার করিয়া, জনৈক কুবেরের বরপুত্র হঠাৎ বৃদ্ধাবস্থায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে দৈনন্দিন ব্যভিচার ও দুষ্ক্রিয়ায় উত্ত্যক্ত হইয়া, শুভানুধ্যায়ী ও সুহৃদ্‌বর্গ, তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দারিদ্র্য-যন্ত্রণায়, সমাজের নির্যাতনে, বৃদ্ধ আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিল। পৃথিবী মায়াহীন, মনুষ্য নির্ম্মম

* The Other Side of Death P. P. 75—76

বন্ধুবর্গ স্বার্থপর—বৃদ্ধ সঙ্কল্প করিল, আত্মহত্যা করিয়াই ইহার প্রতিশোধ দিবে। আত্মহত্যার পর হইতে ক্রমান্বয়ে ষাট বৎসর পর্য্যন্ত হতভাগ্যের প্রেতাত্মা আপনার নিধন ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই। হঠাৎ সেই স্থানে কোন জীবিত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে সে উপস্থিত ব্যক্তির কর্ণে আত্মহত্যার উপদেশ প্রদান করিত, অনেক ব্যথিত দুঃখ-দীর্ণ-মনুষ্য হৃদয়কে তাহার কুমন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া ইহজীবন ত্যাগ করিতে শুনা গিয়াছে।

আবার মদ্যপান, পরস্ত্রী বা বারনারী আসক্তি প্রভৃতি ব্যভিচারিণী বৃত্তি মৃত্যুর পরও সমানরূপে বলবতী থাকে। মদ্যপায়ী বা বেশ্যাসক্তের আত্মা প্রেতজীবনের নিম্নতম স্তরে বসবাস করে। বিদেহ অবস্থায়ও পরিতৃপ্তি লালসার নিবৃত্তি হয় না বলিয়া মদ্যপায়ী বা বেশ্যাসক্তের আত্মা অধিকতর যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকে। এই সকল আত্মা প্রেতজীবনের যে স্তরে বসবাস করে, তাহাও মর্ত্ত্য বা মনুষ্য-জীবনের অতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া, বারাঙ্গনা বা শৌণ্ডিকালয় হইতে একরূপ সূক্ষ্ম গন্ধ উত্থিত হইয়া, ইহাদিগের পরিতৃপ্তি লালসা অত্যন্ত বলবতী করিয়া তুলে। তখন এই সকল উন্মত্ত পিশাচেরা আপন আপন প্রাচীন ব্যভিচার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ব্যভিচার করিলে ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এমন কি, জীবাত্মার মনোবৃত্তিসমূহের উপর কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব থাকে না। সুতরাং প্রেতাবস্থায় এই প্রকার কোনরূপ সূক্ষ্ম পূতি গন্ধ আঘ্রাণে ব্যভিচারীর আত্মা পুরাতন ব্যভিচার-ক্ষেত্রে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

---

* Otner Side of Death P. 69

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কর্ম্মফল।

শিষ্য। ইহজীবনের পাপ-পুণ্য-চিন্তা ও সংস্কার এবং ভাবাদি সমস্তই কি পরলোকগত সূক্ষ্মদেহীর বর্ত্তমান থাকে? কবিত্ব, কৃতিত্ব বা পাপ-কার্য্য সমস্তও কি সঙ্গে যায়?

গুরু। সংসার প্রতিপালনের জন্য অনেককেই জীবনের উচ্চ আশা উচ্চ বৃত্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়। মৃত্যুর পর গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন থাকে না বলিয়া, আত্মা সকল উচ্চবৃত্তিরই উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন। যে কবি উদরান্নের দায়ে জীবনের গদ্যময় কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, মৃত্যুর পর শরীরের ব্যবধান ঘুচিলে, তাঁহার আত্মা উচ্চতম কাব্যরসে চিরন্তন ভাসিতে থাকিবে। প্রেতাবস্থায় অনেক বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞানের মহীয়ান্ সত্য অনুসন্ধান করিতে দেখা গিয়াছে। স্থূল বা শারীরিক ক্ষেত্রে যে সকল পদার্থ উচ্চতর গবেষণার অন্তরায়, সূক্ষ্ম শরীরে সেই সকল অন্তরায়ের অভাব বশতঃ পূর্ণতম সত্য যে, তাহাদের শরীরে বিকশিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন;—

"ইহা খুব সহজ অনুমেয় যে, মনুষ্যজীবনে কোন বিশিষ্ট অনুরাগের বস্তু না থাকিলে, অনেক আত্মার মধ্যে প্রেতাবস্থা অসন্তোষকর ও নিরানন্দময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গত বৎসর কার্য্যানুরোধে আমাকে একটী বাটীর সম্মুখ দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিতে হইত। আমি যতবার যাইতাম, ততইবারই দেখিতাম, সেই বাটীর মৃত পূর্ব্বস্বামী কোন একটী

গৃহে বসিয়া আছেন। জীবিতাবস্থায় গৃহস্বামী চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন, সুতরাং অনেক পীড়িত গৃহস্থই সাদরে ও সোৎসুকনেত্রে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। আমি ঐ চিকিৎসকের প্রেতাত্মার সহিত কথা কহিলাম, শুনিলাম, তিনি অত্যন্ত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। প্রেতাবস্থায় বহুসঙ্গীর সংসর্গসুখের সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহার তাহাতে শ্রদ্ধা নাই। সুতরাং একরূপ নিঃসঙ্গে নির্জ্জনে দিনাতিপাত করাই তাঁহার দৈনন্দিন ভাগ্য। মনুষ্যজীবনের পুরাতন গৃহ ও পুরাতন অনুসঙ্গের ভিতর বিচরণ করিতে তাঁহার অত্যন্ত সুখবোধ হয়। চিকিৎসক বলিলেন, "আমার স্ত্রী বিবেচনা করেন, আমি কোন সুদূর স্বর্গে নন্দনসুখে কালাতিপাত করিতেছি, আমার নিতান্ত কষ্ট, আমি তাহাকে বুঝাতে পারি না যে, আমি দিবা-রাত্রি তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া থাকি।" আমি (গ্রন্থকার) তাঁহাকে (প্রেতকে) প্রেতজীবনের নিম্নস্তর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধস্তরে উঠিতে অনুরোধ করিলাম। উত্তরে প্রেতাত্মা বলিল, ঊর্দ্ধস্তরে যাইবার আমার কোন প্রয়োজন নাই, ঊর্দ্ধস্তরবাসীরা সকলে শারীরিক সুখদুঃখের অতীত, সুতরাং তথায় চিকিৎসার বা চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই। ঊর্দ্ধস্তরে উঠিলে আমাকে একরূপ অলস ও নিরর্থক কালযাপন করিতে হইবে।"

জীবন-প্রবাহ বিচ্ছেদহীন ও নিয়ত গমনশীল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অনুমান করেন, মৃত্যুর পর জীবনপঙ্‌ক্তির পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায়; মনুষ্য আত্মা বহুদিন ধরিয়া কোন অজ্ঞেয় শূন্য গহ্বরে বন্দীকৃত হইয়া বসবাস করে,—হঠাৎ একদিন ভগবানের দুন্দুভিনাদে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিচারালয়ে আসিয়া, আপনার সুকৃতি দুষ্কৃতির পুরস্কার বা দণ্ড লইয়া যায়। ইহা

---

* Light on the Hidden way Boston, Ticknor & Co 1886. P, 71

অপেক্ষা অধিক ভ্রান্তি কিছু হইতে পারে না। জীবন একরূপ শক্তি। জগতের কোন শক্তির বিলোপ, বিচ্ছেদ বা আন্তরিক নিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভগবানের বিচার দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছে; প্রতিমুহূর্ত্তেই জীবাত্মা আপনার সুকৃতিদুষ্কৃতির ফলাফল ভোগ করিতেছে। পুণ্যফল অবশ্যম্ভাবী ফল। ভগবানের বিধান অনিবার্য্য। মৃত্যু বা যম অর্থে নিয়ম, ভগবৎপ্রেরিত কোন দায়রার বিচারপতি নহে।

এই ঘটনার মন্তব্য।—সংসারে অনেক সময় সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মোপদেশ বা ভ্রান্তিমান মনুষ্যের পরকালের উন্নতির অন্তরায়, এবং তজ্জন্য আত্মাকে পরলোকে গিয়া কষ্ট পাইতে হয়।

গুরু। ঋণের দায়েও আত্মার উর্দ্ধগতি হইতে পারে না। তৎপ্রমাণার্থ একটি ঘটনা তোমাকে শুনাইতেছি।

বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার বিম্‌স, তাঁহার গ্রন্থে (Anatomy of Melancholy) নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"স্কট্‌লণ্ডের রাজধানী এডিনবরা হইতে তেতাল্লিশ মাইল দূরে, টে-নদীর দক্ষিণতটে পুরাতন পার্থনগর। পার্থনগরের সেনানিবাসের সন্নিকটে দুইটি দুঃখিনী বাস করিত। তন্মধ্যে একের নাম আনি সিম্‌মন্ অপরের নাম মালয়। মালয় রজকের কার্য্য করিত,—উভয়েই দারিদ্র্যের কঠোর শাসনে নিপীড়িত, এবং একত্র বসবাসে সখীত্বভাব সম্বন্ধ।

একদা মালয় সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইল,—আনি তাহাকে বিশেষ যত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিন্তু মালয় আরোগ্য হইল না; আনির শুশ্রূষা ও অশ্রুসিক্ত সম্ভাষা তাহাকে রাখিতে পারিল না; মালয় তনু-ত্যাগ করিল।

আনি সখী মালয়ের মৃত্যুতে বড়ই শোকগ্রস্তা হইয়াছিল। একদিন

রাত্রে নিজ কাজকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া শয্যায় গা দিয়াছে, এমন সময় সে পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল, মালয় দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে চাহিয়া দেখিল, মালয়ের সেই দেহ, সেই মুখ, সেই চক্ষু। তবে মুখখানা যেন বড় ম্লান। আনির হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মালয় কথা কহিল। বলিল, "আনি! ভয় করিও না। তোমাদের ভাষায় আমি মরিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমি যেমন ছিলাম, তেমনই আছি—কেবল একটা খোলস পরিত্যাগ করিয়াছি। সখি আনি! আমি বড় অশান্তিতে আছি —আমি কিছুতেই ঊর্দ্ধস্তরে উঠিতে পারিতেছি না। আমার তের আনা ঋণ আছে, সেই ঋণের দায়েই আমার অধোগতি। তুমি কোন ধর্ম্মযাজকের নিকট গিয়া আমার এই দুঃখকাহিনী বলিলে অবশ্যই তিনি আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া আমার সদগতি করিবেন!" ভয়ে, বিস্ময়ে আনির সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতেছিল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না। ছায়ামূর্ত্তিও অদৃশ্য হইল।

এই দিন হইতে প্রত্যহ রাত্রেই মালয়ের প্রেতাত্মা আসিয়া আনির নিকট উপস্থিত হইত, এবং ঋণ পরিশোধের জন্য তাহাকে যে কোন ধর্ম্মযাজকের নিকট যাইতে অনুরোধ করিত। এই ব্যাপারে আনির নিদ্রা-ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠিল—সে রাত্রের মধ্যে একটু নিদ্রা যাইতে পারিত না। অনুসন্ধানে কোন ধর্ম্মযাজকেরও সাক্ষাৎ পাইল না।

এই সময়ে, ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড চার্লস ম্যাক (Rev. Charles Mekey) পার্থশায়র-মিশনের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পার্থনগরে উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া, আনি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া মালয়ের প্রেতাত্মা সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিলেন। ধর্ম্মযাজক বলিলেন— "তার ঋণের সংখ্যা এবং কাহার নিকটে সে কত ঋণী?" আনি বলিল, "তের আনা ঋণ, কিন্তু কাহার নিকট ধারে, তাহা আমি জানি না।"

ধর্ম্মযাজক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, যে মুদীর নিকটে মালয় দ্রব্যাদি লইত, তাহার নিকাট সে কিছু ধারে। ধর্ম্মযাজক মুদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুদী বলিল,—"মালয় কয়েকদিন আসে নাই। বোধ হয় কোন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে।" মালয় যে মরিয়াছে, মুদী তাহা শুনিতে পায় নাই। ধর্ম্মযাজক তাহার মৃত্যু-সংবাদ দিয়া বলিলেন, "তোমার যাহা ধারে, আমাকে দিতে বলিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার সংখ্যা কত?"

তদুত্তরে মুদী বলিল, "একদিনকার দেনা নহে। খুচরা এক পয়সা আধ পয়সা করিয়া ছিট দেনা—দুইদিন সময় না দিলে, আমি খাতাপত্র না দেখিয়া বলিতে পারিব না।"

চারি পাঁচদিন পরে মুদী ধর্ম্মযাজকের নিকট বলিল "মালয় আমার তের আনা ধারে।" ধর্ম্মযাজক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তখনই তাহার তের আনা পরিশোধ করিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে আমি আর মালয়ের ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই।

গুরু। এক্ষণে তুমি বোধ হয়, অবগত হইতে পারিয়াছ যে, যাঁহারা পরলোকের অধিবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পৃথিবীর সহিত যিনি বেশী জড়িত, তিনি তত বেশী যাতায়াত করিয়া, মরণ-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়ান। যিনি যে ভাবে যত গোপনেই পাপকার্য্য করুন, যে প্রকারে লুকাইয়াই পরের বুকের শোণিতপানে স্বার্থ সাধন করুন—তাঁহার সেই পাপকার্য্য কালের অতল জলে ডুবিয়া গেলেও—সেই ক্ষণিকস্থায়ী স্বার্থ, পৃথিবী হইতে বিদূরিত হইলেও—তাঁহার পাপের স্মৃতি যায় না, এবং সেই স্মৃতির প্রবলাকর্ষণ তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া, নরক যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া লইয়া বেড়ায়। যাঁহারা পার্থিবজীবনে সৎপ্রকৃতির লোক, তাঁহারা পর-জীবনেও সৎ। তাঁহারা পৃথিবীতে দর্শন দিলে, বা কাহার উপর আবিষ্ট হইলেও অনিষ্ট করেন না। আর পাপ-হৃদয় আত্মিকগণ মাঝে মাঝে

মনুষ্যকে ছায়ামূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়া প্রাণের অতৃপ্ত বাসনা ও জ্বালা অন্তর্দ্দাহ নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। থিয়োসফিষ্ট (Theosophist) সম্প্রদায়ের আধুনিক উপদেষ্ট্রী, বাগ্মিকুল-ভূষণা, আনি বেসাণ্ট Anie Besant) বলেন, যে সকল ছায়ামূর্ত্তি প্রাণময়ী, যাহারা মানুষকে দেখা দেয়, যে সকল ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া মানুষ ভয় পায়, চমকিয়া উঠে, তাহা আত্মিক মূর্ত্তির আকাশিক প্রতিবিম্ব (Revolutions in Astral Light) এই সকল ব্যক্তির আত্মা অবশ্যই পাপের স্থলে আবদ্ধ রহে না। প্রেতলোকে থাকিয়াও নিরন্তর যে, সেই পাপকার্য্যের স্মরণ ও চিন্তা করে, তাহাতেই তদীয় চিন্তাময়ী মূর্ত্তি, সময়ে সময়ে চক্ষুর সম্মুখীন হইয়া মানুষের ভয় কিম্বা বিস্ময় জন্মায়। থিয়োসফিষ্ট মতে এতাদৃশ মূর্ত্তির নাম (Thought body) অর্থাৎ চিন্তাত্মিকা তনু। ড্রেস্‌ডেন নগর-নিবাসী প্রফেসর ডামারও এরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, মানবাত্মা জড়দেহের বন্ধন বিমুক্ত হইয়া এবং দূর স্থানে থাকিয়াও, নানাপ্রকার কল্পিত মূর্ত্তি দেখাইতে পারে। ঐ মূর্ত্তির নাম আঈডোলন (Eidoln) অর্থাৎ আভাসিক তনু।

ফল কথা, পরলোকগত আত্মার এই সকল বিষয় এক্ষণে সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মানুষ যে নিতান্ত আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যায়, ইহা বোধ হয়, তুমি অনেকের কাছে শুনিয়াছ। এক্ষণে আবেশ ও মৃত্যুকালীন আত্মার দর্শন দিয়া চলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রোফেসর এস, বিট্রেন, ১৮৫২ খ্রীঃ বলিয়াছেন ;—

"আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্ প্রদেশে স্প্রিংফিল্ড নগরে, মিঃ রুকাস এল্‌মারের বাড়ীতে আমি বেড়াইতে যাই, গত শীতকালে ঐ স্থানে

মিঃ এইচের সহিত আমার আলাপ হয়। সন্ধ্যার সময় আমি, মিঃ এল্‌মার ও মিসেস এল্‌মার এবং মিঃ এইচ—আমরা বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা মিঃ এইচ—মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। ঐরূপ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, হানা-বি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলাম, কেননা হানার কথা আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত ভাবি নাই, এমন কি সেই বাল্যকাল হইতে তাহার সহিত ছাড়াছাড়ি; আজ এই তাহার কথা কেন উঠিল? আমি ভাবিতে লাগিলাম, সে লোক কি এখানে চক্ষুর সাম্‌নে উপস্থিত হইতে পারে? আমি যখন এইপ্রকার ভাবিতেছি, মিঃ এইচ তখন অত্যন্ত দুঃখের চিহ্ন সকল দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। দেখা গেল, তিনি তাঁহার চেয়ার হইতে উঠিয়া গৃহের ভিতরে বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু হাত-ছুটান, মুখভঙ্গী করা সত্ত্বেও তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে কপালে হাত চাপড়াইতে লাগিলেন, এবং অসম্বন্ধভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। তৎপরে দুঃখসূচক স্বরে সকল লোককে ডাকিয়া হা হুতাশ করিতে লাগিলেন, এবং ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি স্পষ্টভাবে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল, "ওঃ—কি ভয়ানক অন্ধকার! কি—ভয়ানক মেঘমালা! কি গভীর গহ্বর! নিম্নে বহু নিম্নে অগ্নিময় স্রোত দেখিতেছি—দাঁড়াও—ঐ গহ্বর থেকে তাহাদিগকে রক্ষা কর। আমি গভীর গহ্বরে পড়িয়াছি—অন্ধকারময় কূপে পড়িয়াছি—কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না, কোন প্রকার আলো নাই, কেবল অন্ধকার! ভয়ানক মেঘমালা আসিতেছে, অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, আমার মাথা ঘুরিতেছে—আমি কোথায়?" এই আশ্চর্য্য ভয়াবহ দৃশ্যটি প্রায়

আধঘণ্টাকাল ছিল। আমি সেই সময় ইহা স্থিরভাবে দর্শন করিতেছিলাম যে, মিঃ এইচ—অজ্ঞান অবস্থাতেই এইগুলি করিতেছিলেন। মিষ্টার এল্‌মার ও মিসেস্ এল্‌মার ইহার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। মিসেস্ হানা-বি একজন উচ্চশিক্ষিতা ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা অনন্ত নরক প্রভৃতি প্রাগুক্ত কথাগুলি বলিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু মিঃ এইচ—জন্মিবার বার বৎসর পূর্ব্বে হানা-বির মৃত্যু হয়, এবং এতদ্দেশের কেহই সে বিষয় কিছু জানিতেন না।

১৮৫০ সালের মর‍্যাল ইন্‌ষ্ট্রেক্টর নামক কাগজে, এই ঘটনার বিষয় লিখিত হয়,—

"এমেরিকার কোন এক নগরে, একটি ভদ্র মহিলা পথে যাইতেছিলেন,—এমন সময় তাঁহার উপর আত্মিকের আবেশ হয়। ঐ আবেশ অবস্থায়, তিনি এক দোকান হইতে কয়েকখানি রুটি কিনিয়া, অনেক রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ নগরের উপকণ্ঠে এক রাস্তার ধারে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন, একটি দুঃখিনী কাফ্রী রমণী একটি শিশুসন্তান ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতেছে। তখন আত্মিক ঐ মিডিয়মের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" তখন সেই কাফ্রী স্ত্রীলোকটী বলিল, "আমি নিজে ক্ষুধার্ত্ত, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই শিশুসন্তানটী ক্ষুধার জ্বলায় বড় আকুল হইয়াছে, ইহার জন্য আমি অনেক বড়লোকের বাটীতে ভিক্ষার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু কোথাও কিছু সাহায্য না পাইয়া হতাশ হইয়া এখানে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছি।" তখন সেই আবিষ্ট স্ত্রীলোক, রুটিখানি দিয়া বলিল, "ভগবান্ তোমার এই অবস্থা জানিতে পারিয়া, রুটিখানি পাঠাইয়াছেন, নাও।" তখন ঐ কাফ্রী স্ত্রীলোকটী জানু পাতিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিতে যাইতেছিল, মিডিয়ম বলিল, "ধন্যবাদ আমাকে দিতে

হইবে না। যিনি তোমাকে এই রুটি পঠাইয়াছেন, সেই ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও।”

১৮৫৩ সালে ক্যালিডোনিকা নামক জাহাজে প্যাসিফিক্ রেল কোম্পানির একজন ফায়ারম্যান মিষ্টার ব্যাটারকোল এই ভাবে তাহার সহকারীর মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিয়াছিল। ঐ রেলের যে দুর্ঘটনায় সে মারা যায়, তার দুই এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে তাহার বন্ধুবান্ধবের নিকট বলিত, আমি এ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্য করিব, নতুবা শীঘ্রই এমন এক দুর্ঘটনা ঘটিবে, যাহাতে আমার সমূহ অনিষ্ট হইবে। তৎপরে যে দিনে ঐ দুর্ঘটনা হয়, সেই দিন অতি প্রত্যূষে আমি ও সে গাড়ী ছাড়ি—একটু যাইতেই ড্রাইভার বলিল, দেখ একজন লোক লাইনের উপরে দাঁড়াইয়া আছে—আমি গাড়ী রাখিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোথাও কেহ নাই দেখিয়া পুনরায় গাড়ী ছাড়া হইল। আবার কিছুদূর যাইয়া ড্রাইভার বলিল ঐ দেখ, সেই লোক লাইন পার হইতেছে—তুমি নামিয়া যাও, দেখিয়া আইস। তাহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে—যেমন আমি গাড়ী হইতে নামিয়াছি আর অমনি এঞ্জিন ফাঁসিয়া গেল এবং ড্রাইভারের মৃত্যু হইল। আমি কিন্তু কোন মানুষকে লাইনের উপর দেখিতে পাই নাই।

ডব্লিউ এইচ হ্যারিসন্ তাঁহার গ্রন্থে * বলিয়াছেন—

ব্লুমস্‌বেরি নগরে, মিসেস্ লুই নাম্নী গ্রন্থকারের একটি বন্ধু ৩নং ফেরুস্‌প্লেসে বাস করিতেন। তিনি আবিষ্ট অবস্থায় অনেক অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদন করিতেন। একদিন গ্রন্থকার তাঁহার ঐ বন্ধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কিছু পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি। তাহাতে মিসেস্ লুই আবেশ কাল পর্য্যন্ত হ্যারিসনকে তদীয় ভবনে অপেক্ষা করিতে বলেন। তৎপরে লুই আবিষ্ট

* Sp rits before our eyes. P 215.

হইলে, গ্রন্থকর্ত্তা বলিলেন, মিষ্টার গ্রেগারি নামক আমার একটি বন্ধু ২১নং গ্রীন ষ্ট্রীটে বাস করেন। তিনি এক্ষণে কি করিতেছেন, এবং তাঁহার নিকটে আপনি এমন একটি কার্য্য করুন, যাহাতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারি; আপনি সেখানে গিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তর হইল, আপনার বন্ধু তাঁহার দুইটি বন্ধুর সহিত গল্প-কৌতুক করিতেছেন। আর আমি যে সেখানে গিয়াছিলাম, আপনার এই বিশ্বাসের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে প্রবল বেদনার আবির্ভাব করাইয়াছি, এক্ষণে তিনি সেই বেদনার কথা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবকে জানাইতেছেন। তৎপরে গ্রন্থকর্ত্তা অনুসন্ধানে বন্ধুর নিকট ঐ কথার সত্যতার প্রমাণ পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

এমেরিকার নিউইয়র্ক বিভাগস্থ এ্যালবানি নগরের খ্যাতনামা ডাক্তার হজ্‌সন্—বলেন, আমি একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী। আজ প্রায় ১১ বৎসরকাল যাবৎ চিকিৎসা করিতেছি। তামাক, চা, কাফি, মদ্য প্রভৃতি কোনরূপ উত্তেজক বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা আমার অভ্যাস নাই। সুতরাং নিয়মে থাকিলে মনুষ্যদেহ যে মুহূর্ত্তের জন্যও রুগ্ন ও অসুস্থ হইতে পারে না, একথা বিশ্বাস করিবার পক্ষে আমার জীবনে অনেক জীবন্ত প্রমাণ আছে। স্বপ্ন দেখা রোগটা আমার বড় কখনই ছিল না। ভূতপ্রেতের কথা শুনিলে, চিরকালই আমি আমার স্ফীত গুম্ফ পাকাইয়া অনেকটা স্পর্দ্ধিত অবিশ্বাস প্রকাশ করিতাম।

গত সোমবার (৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৮) আমি শয়ন করিতে গেলাম। রাত্রি তখন প্রায় ১১টা বাজিয়াছে। আহারাদি প্রায় সন্ধ্যা ৭টার সময়ই সমাপ্ত হইয়াছিল। আহার তেমনি গুরুতরও হয় নাই। এমন কি আহারান্তে আমি ২।১ জন রোগী দেখিতেও বাহির হইয়াছিলাম।

আমার ও আমার স্ত্রীর শয়ন-গৃহ দুইটী পাশাপাশি ঘর। আমার

স্ত্রীর ঘরে একটা জানালা ও দরজা আছে। দরজা দিয়া কেবল আমার শয়নগৃহেই প্রবেশ করা যায়। আমার গৃহে একটি জানালা ও তিনটি দরজা। সকলগুলিই ভিতর দিক হইতে অর্গলবদ্ধ থাকে। অধিকন্তু দরজাজানালাগুলি সবুজ পরদায় ঢাকা থাকে, সুতরাং বাহিরের আলো গৃহে প্রবেশ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি যখন শয়ন করি, তখন প্রায় রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। শুইবামাত্র আমার নিদ্রা আইসে। রাত্রি প্রায় ৪টার সময় আমার মনে হইল, যেন আমার মুখে খুব খানিকটা উজ্জ্বল আলোক প্রভা আসিয়া পতিত হইতেছে। কেমন অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, আমার সহধর্ম্মিণীর মত একটি রমণীমূর্ত্তি যেন দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ভাবিলাম, সেদিন প্রত্যূষের ট্রেণে আমার স্ত্রীর কোন দূরদেশে যাইবার কথা ছিল, তাই বুঝি তিনি সকাল সকাল উঠিয়া সমস্ত উদ্‌যোগাদি করিতেছেন। গৃহাভ্যন্তরস্থিত জ্যোতি তখন এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি না চেঁচাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার শব্দ শুনিয়া রমণী-মূর্ত্তি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে সেই রশ্মিরেখাও অপসৃত হইল। আমি মনে করিলাম পার্শ্বস্থ গৃহে কোন ভৃত্য বোধ হয় আলোক হইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে, দ্বারের চাবির রন্ধ্র দিয়া তাই এ গৃহে আলোক আসিয়া থাকিবে। পরক্ষণেই মনে হইল, পর্দ্দা দেওয়া আছে, সুতরাং এরূপ আলোক প্রবেশের সম্ভাবনা অতি অল্প। তবে বোধ হয়, গৃহে চোর প্রবেশ করিয়াছে। আমি উচ্চৈঃস্বরে আমার স্ত্রীকে ডাকিলাম। তিনি জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও কি, ও ঘরে অত আলো কেন?" আমি উঠিলাম, গ্যাস জ্বালিলাম, দেখিলাম গৃহের একটি জিনিষও স্থানচ্যুত হয় নাই। গৃহসামগ্রী পূর্ব্বের ন্যায় সমস্তই অস্পৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রভাতে আমার স্ত্রী তাঁহার অভীষ্টস্থানে যাত্রা করিলেন, আমি দৈনন্দিন রোগীচর্য্যায় বাহির হইলাম। বেলা ১২টার পর আমি ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, বাহিরে আমার জন্য একটি লোক অপেক্ষা করিতেছে। আমি লোকটীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, শুনিলাম আমার একটি স্ত্রী-রোগী গতরাত্রে প্রায় ৩॥০টার সময় মরিয়া গিয়াছে। লোকটি তাহারই মৃত্যু সার্টিফিকিটের জন্য আসিয়াছে। গত রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত আমার মনের ভিতর একবার চমকাইয়া উঠিল। মনে পড়িল, সেই ছায়ামূর্ত্তি অনেকটা আমার সেই মৃত রোগিনীর মত বটে, তবে শুধু মুখখানি যেন অনেকটা বর্ষীয়সীর মুখ।

আমি নিম্নে আর একখানি পত্র উদ্ধৃত করিলাম।

সেক্রেটারি অফিস, জেনারেল পোষ্ট অফিস; ২৯এ মার্চ্চ ১৮৯২।

৮ই মার্চ্চ (১৮৭৫) রাত্রি প্রায় ৮॥০টার সময় আমরা লণ্ডনের বো পল্লীতে আমাদের বসত বাটীতে বসিয়া আছি। শুনিলাম, কে যেন ডাকিতেছে, "যোষেফ—যোষেফ!" আমি আমার পিতা ও পিতৃব্য-পুত্র যোষেফ ক্যারির সহিত ব্যালাক্লাভা যুদ্ধ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। আমার তখন ৩৩ বৎসর বয়স—সুস্থ সবল শরীর। আমরা তিনজনেই সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম। সে স্বর যোষেফের পিতামহীর কণ্ঠস্বর। পরদিন প্রত্যূষে আমরা টেলিগ্রাম পাইলাম, যোষেফের পিতামহী গত রাত্রে ৮॥০টার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কামনা ও আসক্তি।

শিষ্য। আপনার মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম, জীবিতাবস্থায় ইচ্ছা-শক্তির বলে, মানুষের পরস্পরের হৃদয়ে ভাব পরিচালনা করিতে পারে। বুঝিলাম, কাল ব্যাপ্তি প্রভৃতি ইচ্ছাশক্তির কাছে কোন ব্যবধান বলিয়া অনুভূত হয় না। একজন মানুষ গৃহে বসিয়া সূক্ষ্ম-শরীরে প্রবাসী বন্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাৎও করিতে পারেন। বুঝিলাম, ইহজীবনের আকাঙ্ক্ষা-আসক্তি প্রেতাবস্থায়ও আত্মার অচ্ছেদ্য সঙ্গিনীরূপে বিচরণ করে। কিন্তু এক বিষয়ে আজিও আমি কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই।

গুরু। বিষয়টা কি বল? আমার আয়ত্তীভূত হইলে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি।

শিষ্য। মনে করুন, জীবিতাবস্থায় যেন ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রহিল, মরণের পর আত্মিক পরিবর্ত্তন পূর্ণরূপে সংসাধিত হইলে, অর্থাৎ আত্মিক জগতে নব জন্ম হইলেও যেন তাহার পুনঃ স্ফুরণও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ঠিক মৃত্যুকালে যখন আত্মিক পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইচ্ছাশক্তি কেমন করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সক্ষম হয়? মনে করুন, গাছে ফল ধরিলে, ফলে বীজ হইল, বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পুনরায় বৃক্ষ হইল। সেই বৃক্ষে আবার সেইরূপ ফল জন্মিতে পারে, তাহার অঙ্কুরাবস্থায় সে ফল কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আপনার মনে মৃত্যু ত আধ্যাত্মিক জন্মের অঙ্কুর?

গুরু। আমি তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। ভাল করিয়া বল?

শিষ্য। আমি বলিতেছি, গীতাদি শাস্ত্রে আছে, মানুষ যাহা চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে, মরণান্তে তাহাই প্রাপ্ত হয়। * ইচ্ছা-শক্তির বিধাতৃত্ব গুণে মানবের কামনা-সিদ্ধি হয়, এ কথা সত্য হইলে, প্রাগুক্ত শাস্ত্রবাক্য কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? মৃত্যুকালে যখন মনেরই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে, তখন ত ইচ্ছাশক্তিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে; অর্থাৎ যেরূপ ইচ্ছাশক্তি মানবের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে, মৃত্যুকালে তাহা সেইরূপ অবিকৃত থাকে না। তাহার অবিকৃত অবস্থার গুণ, বিকৃত অবস্থায় কিরূপ সম্ভব হইতে পারে?

গুরু। তুমি বুঝিতে চাহ, কেমন করিয়া মুমূর্ষুর অন্তিম চিন্তা ফলবতী হয়। অর্থাৎ মরণের আমূল পরিবর্ত্তনের ভিতর কেমন করিয়া ইচ্ছাশক্তি নামে একটী অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা অবস্থিতি করিতে পারে?

শিষ্য। হাঁ তাহাই। আমি অমন করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না। মৃত্যুকালে মৃগ-রূপ চিন্তা করিয়া, ভরত পরজন্মে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্তিম সময়ে নারায়ণ নামক পুত্রকে স্মরণ করিয়া অজামিল মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। অন্তর্জ্জল অবস্থায় অনেক মুমূর্ষুর বন্ধু-বান্ধবকেই ভগবৎনাম কীর্ত্তন করিতে শুনা যায়। অন্তিম চিন্তা বা কামনা এত শক্তিমতী হইলে জীবনে ধর্ম্মাধর্ম্মভেদের সার্থকতা কি? তাহা হইলে ত একজন আজীবন দুষ্কর্ম্ম করিয়াও অন্তিমে শুধু একটু পুণ্য চিন্তার বলেই সদ্গতি লাভ করিতে পারে?—তাহা হইলে ত জীবনের তপস্যার মত পণ্ডশ্রম নাই?

* যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
গীতা—৮ম অঃ—৬ শ্লোঃ।

গুরু। সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ। কিন্তু এখনও ভাব-পরিচালন প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিবার উপযুক্ত অবসর আইসে নাই। পশ্চাতে আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে আমি কেবল অন্তিম-চিন্তা বা মৃত্যুকালীন কামনার শক্তিমত্তা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাহি।

মৃত্যু অর্থে পরিবর্ত্তন বা পরিণতি হইলেও, তাহা এত আমূল নহে যে, মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা একেবারে বদলাইয়া যায়। মরণে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কেবল রূপান্তর মাত্র। অর্থাৎ শরীর প্রভৃতি নরত্বের জীবনে নরত্বের যে সকল উপাদান স্থূল ছিল, মরণের হাপরের উত্তাপে তাহা গলিয়া সূক্ষ্ম হইয়া যায়। যাহার রূপ ছিল, তাহারই রূপান্তর হইয়া থাকে। যাহার রূপ নাই তাহার রূপান্তরও নাই।

নরত্বের ভিত্তিভূমি বা জীবাত্মার রূপ নাই, সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। এক একটি জ্ঞান বা বিশিষ্ট চৈতন্য তাহার এক একখানি ইষ্টক-ফলক, ইচ্ছাশক্তি তাহার সিমেণ্ট বা সর্জ্জরস। নরত্ব বা মনুষ্য দেহের এরূপ আত্মিক ইচ্ছাশক্তিমূলক বনিয়াদের কথা যে শুধু শাস্ত্রদৃষ্ট বা যোগদৃষ্ট, তাহা নহে, বর্ত্তমান যুগে অনেকে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গর্ভজাত বীজকে সন্তানরূপে গঠিয়া দেওয়া এই ইচ্ছাশক্তির কার্য্য। নরত্ব বা মনুষ্যদেহের সর্ব্ব প্রথম স্তর, আত্মা ও আত্মাধিষ্ঠিত ইচ্ছাশক্তি। * সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, জ্যোতিপ্রকাশকত্ব প্রভৃতি ঐশীশক্তি

* আত্মাঽব্যক্তশ্চতুর্ব্বিংশতত্ত্বানি পুরুষঃ পরঃ।
সংযুক্তশ্চ বিযুক্তশ্চ যথা মৎস্যোদকে উভে॥
অব্যক্তমাশ্রিতানীহ রজঃসত্ত্বতমাংসি চ।
আন্তরঃ পুরুষো জীবঃ স পরং ব্রহ্ম কারণম্॥

অগ্নিপুরাণম্॥ ৪—৫।৩৭০ অ।

মানবের আজন্মের বৈভব। নর ও নারায়ণের ভিতর কোন জাতিগত ভেদ নাই—কেবল অবস্থাগত বিভিন্নতা। মানুষ দেবতার সহোদর ভাই। জীবনের এই জ্যোতিষ্মৎ বনিয়াদ যতই মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হয়, ততই তাহার আলোক, জ্ঞান বা দৃষ্টি সর্ব্বত্রগামিনী হইয়া উঠে। ক্লেয়ার-ভয়েন্স কালে আবিষ্ট ব্যক্তি দেখিতে পান যে, একরূপ আলোক-স্রোত তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া যেন বিশ্বের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। যাহা চর্ম্ম চক্ষে দেখা যায় না, তাহা উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু সে সকল বিষয় আমার প্রসঙ্গান্তে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন বুঝিতে পারিলে, যে দুইটি উপাদানে নরত্ব গঠিত হয়, তাহার একটি পরিবর্ত্তনশীল, অপরটি অপরিবর্ত্তনীয়। একটি দেহ অপরটি আত্মা বা আত্মিক, ইচ্ছাশক্তি বা চিরজীবী হইবার অক্ষয়-অনন্ত ইচ্ছা।

এইবার দেখিতে হইবে, আকাঙ্ক্ষা বা কামনার স্বরূপ কি। কামনা অর্থে অভাব, যাহা ভাব নহে. যাহা উপস্থিত নাই। জীবন অর্থে বর্ত্তমান. কামনা অর্থে ভবিষ্যৎ। জীবন মুহূর্ত্তের সেবক,—কামনা অনন্তকালের অনন্ত ভবিষ্যতের ধ্যানমগ্ন উপাসক। জীবন উপস্থিত বর্ত্তমান পলক লইয়া বিব্রত। কামনা যুগযুগান্তরের ভিতর ছুটিয়া জীবনের গন্তব্য-পথ নিরূপণ করিয়া দেয়। জীবন অন্ধের মত অবিশ্বাসী সন্তর্পণে, প্রতি মুহূর্ত্তের গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিতে চাহে। কামনা অনন্তের উচ্চৈঃশ্রবা নির্ভয়ে, আশায়, উৎসাহে, জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর ছুটিয়া যায়। কামনা কাল—জীবন ব্যাপ্তি। জীবন গতি, কামনা তাহার প্রশস্ত বর্ত্ম। কামনা না থাকিলে পথশূন্য হইয়া উঠে।

এখন বুঝিতে পারিলে, কামনা অন্তরের উত্তরসাধক, জন্মজন্মান্তরের বর্ত্ম-নিয়ামক; ভাগ্য-জাহ্নবীর অক্লিষ্ট ভগীরথ; নরত্বদেবত্বের ফরাসী

লেসেপ। জীবন বা চির বর্ত্তমান থাকিবার ইচ্ছা কামনার আদেশ-ইঙ্গিতে কামনার নির্দ্দিষ্ট বর্ত্মে ছুটিতেই বাধ্য।

কামনা মানস-জন্য,—দেহ ও আত্মার স্তন্যপুষ্ট সন্তান। কামনাকে তাই ভিতরকার রাজ্যের দ্বৈমাতুর বলা যাইতে পারে। কামনা গিরি ব্রজের জরাসন্ধ রাজা—নরত্বের গিরি বা অটল অপরিবর্ত্তনীয়, আত্মিক সত্তার অগ্রণী সেবক, এবং ব্রজ বা সচল, পরিবর্ত্তনীয় দৈহিক তত্ত্বের দণ্ডধর প্রভু। কামনা জরাসন্ধ জরা বা উত্তর কাল বা চিরপরিণতি, বা চির ভবিষ্যের সন্ধান করিয়া বেড়ায়। ভীমবলে তাহার দৈহিক ও আত্মগত ভাব টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলে, তাহা নর-নারায়ণের সম্মুখে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। নর-নারায়ণ চিরদিনই অভিন্ন হৃদয়। যে হৃদয়হীন সেই "পাখী" "সখী" দিয়া স্বর্গ গড়িয়া থাকে।

তুমি বলিবে, সকল শাস্ত্রেই কাম বা কামনার অখ্যাতি আছে, কামনা ত্যাগই ধর্ম্ম, একথা নৈমিষারণ্যের পক্ষিশাবকেও জানিত। আমার উত্তর,—কামনা নরত্বের স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া, তাহার আবির্ভাবটা আদৌ অভিপ্রেত হইতে পারে না। কামনার যে অংশটা কাম বা কর্ম্মগত—যাহা দৈহিক ও মানসিক সম্ভোগের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাই আপনার জন্ম-জন্মান্তের নরত্বের স্রষ্টা হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যজন্ম, তাপ—দেহের সহজ, সাধারণ অদৃষ্ট—জ্বরভোগ অভাব অসঙ্গতি। ভোগরাগ হিসাবে মনুষ্যজন্ম একটা বিরাট বৈফল্য। সম্ভোগ কামনায় জন্ম জন্ম কর্ম্মভোগ করিতে হয়, তাহাতে চিরজীবী হইবার কামনা ঢাকা পড়িয়া যায়। কামনা ও জীবাদৃষ্ট একই পদার্থ। সুতরাং দৈহিক বা সম্ভোগ কামনা ত্যাজ্য। দেহের উৎপত্তি আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে, সুতরাং দৈহিক কামনা নির্ব্বাপিত করা যায়। যাহা সম্ভব, তাহার সাধনা হইতে পারে, অসম্ভবের সাধনা নাই।

তুমি বলিবে, তবে কি নিষ্কাম ধর্ম্ম অসম্ভব। কামনার এক অংশ যখন আত্মাধিষ্ঠিত, তখন তাহার ধ্বংস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

প্রথমে নিষ্কাম শব্দের অর্থ কি তাহা বুঝিয়া দেখ। নিষ্কাম ও নৈষ্কর্ম্ম্য একার্থবাচক। যে কাম—কর্ম্মাশ্রয়ী, যাহা জীবাত্মার জন্মে জন্মে জগৎ সৃষ্ট করিয়া দেয়, * যাহার আত্মার ধর্ম্মগত কামনা বা অত্যন্ত চিৎ-পরিণতির অন্তরায়, তাহাই ত্যাজ্য। জীবাত্মার যাহা কামনা, যাহাকে আধ্যাত্মিক ইচ্ছাশক্তি বলে, যাহার আকর্ষণে জীবাত্মা পূর্ণচিত্তে পর্য্যবসিত হইতে যায়, তাহার ধ্বংস কে করিবে? জগতে মৌলিক শক্তির ক্ষয় বা অবরোধ করা কাহার সাধ্য? আধ্যাত্মিক কামনা ত্যাজ্য বা সংরোধক্ষম হইলে, আত্মারাম শব্দের অর্থ থাকে না। কাম না থাকিলে রাম থাকেন কোথায়? যাঁহারা এ তথ্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা নিষ্কাম শব্দের অর্থ করিতে গিয়া, কেবল কতকগুলা গল্প-গুজব ফাঁদিয়া বসেন।

আত্মার আত্মগত কামনা কে ধ্বংস করিবে? পূর্ণ চৈতন্যের চৈতন্য আলিঙ্গনের মাঝে কে অন্তরায় হইতে পারে? কে এমন লৌহের ভীম আছে, এই অনন্তব্যাপী সংক্ষুব্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বাহুবন্ধনের ভিতর চূর্ণ হইতে যাইবে? আমি তোমায় যে কামনার কথা বলিতেছি, তাহার নাম আত্মিক মাধ্যাকর্ষণ—আধ্যাত্মিক কৌশিকত্ব। সে কামনার ফল—নির্ব্বাণ, নিমজ্জন।

তুমি দেখিয়া থাকিবে, মহাসাগর দিবারাত্রি সহস্র স্রোতস্বিনীকে আপনার বুকে ডুবাইয়া রাখিতেছে, অভ্রভেদী ভূধর কোন ভালবাসার তান্ত্রিক আকর্ষণে আপনার দেহ ধ্বংস করিয়া পৃথিবীর ভিতর মিশাইয়া যায়। শুনিয়া থাকিবে, কত ধাতুময়, বজ্রময় গ্রহ, উপগ্রহ, হঠাৎ একদিন ধূলি-ধোয়া হইয়া অনন্ত ব্যাপ্তির মাঝে নিবিয়া গেল। শুনিয়া

* জীবাদৃষ্টাৎ জগৎ—বেদান্তসূত্র।

থাকিবে, আমাদের এ সৌর বিশ্ব আপনার চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি লইয়া হারকিউলিস নামক নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে দিবারাত্রি উন্মাদের মত ছুটিয়া যাইতেছে। বাহ্য প্রকৃতিতে,—পূর্ণব্রহ্মের স্থূল বিরাট বিগ্রহের ভিতর কোথায় আহ্বান আকর্ষণ নাই? আহ্বান না থাকিলে প্রলয় হইতে পারে না। যাহাকে প্রলয় বল, তাহা কেবল পূর্ণচিতের আত্মসংগ্রহ। আত্মোপসংহৃতির কামনা জীবাত্মা, তাই দৈহিক কামনার ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেই, আপনার আধ্যাত্মিক কৌশিকত্বে পূর্ণ চিতে পরিণত হইতে বাধ্য। এখন আত্মিক কামনার কথা বুঝিতে পারিয়াছ কি? ইহা পূর্ণব্রহ্মের স্নায়বিক শক্তি, বিশ্বপ্রকৃতির দৈহিক কৌশিকত্ব।

কতক অংশে সম্ভোগ কামনাও কল্যাণকরী। এরূপ আসক্তি লালসা না হইলে সংসার চলিতে পারে না। সংসার না থাকিলে সন্ন্যাস অসম্ভব। স্কুল না থাকিলে কলেজ চলিতে পারে না। যাহাকে সমাজের লোক "স্বার্থ" বলিয়া থাকে, সংসারের বৃদ্ধিকল্পে তাহাও ন্যায্য পরিমাণে আবশ্যক। সংসারী হইয়া যাহার এরূপ ন্যায্য "স্বার্থ" নাই তাহার জীবনও অর্থশূন্য। তুমি তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে পার না। সে ব্যক্তির পক্ষে কোন মহাপাতক অকৃত্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। স্বার্থ বা কামনাকে এরূপ ন্যায্য গণ্ডীর ভিতর পূরিয়া রাখা, সময়ে সময়ে জনক যুধিষ্ঠিরের মত লোকেরও বড় দুরূহ হইয়া দাঁড়াইত। অন্য পক্ষে, পরার্থকে স্বার্থ করিতে অনেকেই বড় বেশী রকম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। কে বলিয়াছিল না দুনিয়াটা পাগলা-গারদ?

কামনা তুচ্ছ, মমতা মহান্। এই সংসার পুতুলনাচ নহে, ছায়াবাজী নহে, এ পৃথিবী!

কামনা কল্পনার প্রসব। কামনা কল্পনা এ সংসারের একমাত্র অর্থ-পুস্তক। ইহার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে জীবনের গ্রন্থের কোন স্থান জটিল

বা দুর্ব্বোধ থাকে না। ঋষি-তপস্বীরা সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতেন, সংসারের নিগূঢ় অর্থের ধারণা ও সাধনা করিবার জন্য আত্মা পরমাত্মার চিরন্তন পারম্পরিক কামনার পূর্ণসিদ্ধি ঘটাইতেন।

এইবার মানবের অন্তিমকামনার কথা ভাবিয়া দেখা যাউক। আমরা দেখিয়াছি, দৈহিক বা কর্ম্মজন্য কামনা, জীবনের পথপ্রদর্শক। মনুষ্য-দেহে প্রতি মুহূর্ত্তে যে মরণ বা পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া চলিতেছে, তাহার ভিতর কামনাই বিধাতাপুরুষরূপে তাহার দৈহিক ও মানসিক অদৃষ্ট গঠিয়া দেয়। কামনা বা আসক্তি অনুসারে লোকের গঠন, স্বাস্থ্য, সঙ্কল্প, উদ্যম, চরিত্র প্রভৃতি নিরূপিত হয়। দৈহিক সম্ভোগ-কামনাকে জীবনের একচ্ছত্রী সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে, পুনর্জ্জন্ম বা অবতারিত্বের অধি-কারটা অধিক বাড়িয়া যায়। সংসার রক্ষা কল্পে কতকটা এরূপ কামনা আবশ্যক। দেখিতে হইবে, মানুষের অন্তিম কামনা কতদূর শক্তিমতী।

তুমি পূর্ব্বে বুঝিয়াছ, দৈহিক তত্ত্ব সম্বন্ধে মরণ একরূপ নিঃশেষ পরি-বর্ত্তন। মনুষ্যদেহ ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় উপাদানে মরণ আর একটি দেহ গঠিতে থাকে। কামনা জীবনগতির পথনিরূপক বা ভবিষ্যের দ্বাররক্ষী বলিয়া মৃত্যুকালে যে কামনা উপস্থিত হয়, তাহারই নেতৃত্বাধীনে তাঁহারই প্রদর্শিত পথে, মুমূর্ষুর জীবনী স্রোত, পরলোকাভিমুখে যাত্রা করিতে থাকে। তাহার পর মরণের হাপরে পড়িয়া স্থূল দৈহিকতত্ত্ব-গুলি যখন অতিশয় সূক্ষ্ম,—তরল হইয়া উঠে, তখন তাহাকে যেরূপ কামনা বা যেরূপ অস্তিত্বের ছাঁচে ফেলিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাতে ঘনীভূত হইয়া, সেই আকার ধারণ করিতে হইবে। একখানি লৌহকটাহকে শীতল ও শক্ত অবস্থায় বাঁকাইয়া ভাঁজ করিয়া ভিন্নাকৃতি করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু তাহাকে গলাইয়া যে কোন ছাঁচে ফেলিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার সেইরূপ আকৃতি হইয়া যাইবে। সেইরূপ আত্মা যখন

আপনার প্রয়োজনানুসারে ধাতুময় মনুষ্যশরীরকে গলাইয়া ভিন্নরূপ করিয়া গঠিতে বসিয়াছেন, তখন যেরূপ কামনার ছাঁচ আসিয়া তাহার উপর ঢাকা দিয়া পড়িবে, তাহার যে সেইরূপ আকৃতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ চলিতে পারে না। তাই চলিত কথায় বলে, "তপ জপ কর কি মর্‌তে জান্‌লে হয়।" সুতরাং বুঝিতে পারিলে, ভরতের মৃগজন্ম লাভ বা অজামিলের নারায়ণ প্রাপ্তি অযৌক্তিক কথা নহে; এবং মৃত্যুকালে মুমূর্ষুর বন্ধু-বান্ধব যে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা কোন পূর্ব্বকালীন কুসংস্কারের ধ্বংসাবশেষ নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ট, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেই এ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিশ্বাস সার্ব্বজনীন,—কেননা, সমগ্র মানবের আত্মিক-সত্বা প্রতি হৃদয়ে বসিয়া, অপরোক্ষে এই মহাসত্য উপদেশ করিয়াছেন।

তোমার প্রশ্নের শেষাংশের উত্তরে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সংসারে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চরিত্ররক্ষা বা সাধনা-তপস্যারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। জগতের সকল ভাব, সকল চিন্তা সকল কামনাই অভ্যাস-পুষ্ট। যাহা নিত্য করা যায়, তাহা একরূপ আত্মিক-সংস্কার বা প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যাহা অভ্যাস করিবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারই শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা। কর্ম্ম ও কামনা অনুসারে, মানুষের গঠনের যখন পরিবর্ত্তন ও বিকৃতি হয়, তখন মানসিক প্রকৃতিও যে তাহাতে বিশিষ্টরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এ কথা অধিক মাথা ঘামাইয়া বুঝিতে হয় না।

তাহার পর, এক কথায় জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে, বুঝিতে হইবে,—জীবন কেবল মরণের জন্য আয়োজন। সংসারী, সন্ন্যাসী, ত্যাগী ভোগী সকলেই আজীবন মরণের বিলি-বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত। দাতা,

কৃপণ, বিলাসী, বৈরাগী, সকলের জীবনেরই একমাত্র লক্ষ্য, মৃত্যু বা মনুষ্য-জন্মের অবসান। কারাবদ্ধ ব্যক্তি খাটিয়া খুটিয়া যেমন আপনার মুক্তি স্বাধীনতা অর্জ্জন করে, দেহবদ্ধ জীবের জীবনও ঠিক সেইরূপ ভাবে কাটিয়া যায়। সংসারে যে এত বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্য-উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লক্ষ্য একই—অদৃষ্টানুসারে তাহার প্রকারের ভিন্নতা হইয়া থাকে। যে চোর, যে সাধু উভয়েই কামনার দাস, তবে তাহাদের কামনার স্বরূপ বুঝাইবার প্রভেদ হয় মাত্র।

এখন বুঝিতে পারিলে, ভাল করিয়া ভাল মরণের আয়োজন করিতে হইলে, "ভালর" উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করাই একমাত্র অনিবার্য্য সাধনা। কেননা, ভালর কামনা ভাল চিন্তা জীবনে বিশেষ অভ্যস্ত বা প্রকৃতিগত না হইলে, তাহার মৃত্যুযাতনা বা অন্তিমবিদায়ের ব্যস্ত-কোলাহলের ভিতর মনে না আসাই সম্ভব। কামনা, লালসা, ছ'দণ্ডের খেয়াল নহে, তাহার অন্তরের পরমায়ু সংস্কাররূপে তাহা আত্মার আবরণ হইয়া দাঁড়ায়। এই সংস্কার-ভেদই সাধু অসাধুর ব্যবধান। সংসারে কুলোক বলিয়া কোন জীব জন্ম গ্রহণ করে না। এইরূপ কামনা কৃত্যের কু সু অনুসারে অদৃষ্ট-উন্নতির তারতম্য হয়। কামনা তাই মনুষ্য-ভাগ্যের অপর পৃষ্ঠা। অদৃষ্ট কি, তাহা কথায় বুঝান যায় না, অদৃষ্ট—অ-দৃষ্ট; তাহা রুগ্ন-ভগ্নের সাফাই সাক্ষী নহে।

এখন বুঝিতে পারিয়াছ, অন্তিম কামনা এতদূর শক্তিশালিনী? অন্তিম কামনার শুদ্ধির জন্য, আজন্মের শুদ্ধি-সাধনা আবশ্যক হইয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

স্বপ্ন।

শিষ্য। জীবন-মরণের বিষয় অনেক বলিয়াছেন, কিন্তু জীবন-মরণের সন্ধিস্থল বা স্বপ্নরাজ্য বলিয়া, যে কয়েকটি অজ্ঞাত মহাদেশ আছে, তাহার ভূগোল-ইতিহাস সম্বন্ধে আপনি কোন কথাই বলেন নাই। সংসার স্বপ্ন, জাগ্রত-স্বপ্ন প্রভৃতি অনেক স্বপ্নভূমি পাপাপাশি পড়িয়া আছে, তাহাদের ভিতর প্রত্যেকের কি কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না? স্বপ্ন জিনিষটা কি, তাহা জানিতেও আমার বিশেষ কৌতূহল আছে। অধিকারী বিবেচনা করিলে, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় সে বিষয়ে উপদেশ দিন।

গুরু। জীবন-মরণের মত স্বপ্নও একটি জৈবিক অবস্থা। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান বলেন, জাগ্রত অবস্থায় কর্ত্তা যে সকল বিষয়ে চিন্তা বা অনুভব করেন, অসম্পূর্ণ নিদ্রাবস্থায় সেই সকলের স্মৃতি যাহা মনোমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, তাহারই নাম স্বপ্ন। মানুষ যাহা ভাবে, যাহা দেখে, যাহা মনে করে, তাহাই স্বপ্নে দেখিয়া থাকে। বিকৃত শারীরিক ক্রিয়া, বাহ্যিক শব্দ বা অন্য কোন রূপ সংযোগে এই সকল স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠে। তাঁহাদের মতে, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার ভিতর প্রভেদ এই যে, নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি (Volition) বিলুপ্ত হয়, সুতরাং মন কোন বলবতী-স্মৃতি বা স্মৃতিসমূহের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়া উঠে। জাগ্রত অবস্থায় ঠিক ইহার বিপরীত। স্বপ্নে ভয় পাইলে, শত চেষ্টায়ও যে দৌড়ান যায় না, তাহা এই ইচ্ছাশক্তির অভাবের জন্য।

দেহ ও আত্মা লইয়া মানুষ। সুতরাং মানুষের স্বপ্নও দেহ বা আত্মগত ভেদে দুই প্রকার। প্রাগুক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মত,

দৈহিক স্বপ্নসম্বন্ধে সত্য হইলেও, তাহা এ বিষয়ে পূর্ণ সত্যের অর্দ্ধভাগ। আমাদিগের দেশের প্রাচীন ঋষিদিগের মতও এ সম্বন্ধে অনেকটা ঐরূপ। তাঁহারাও বলিয়াছেন,—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপভেদে মানুষে ভিন্নরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বহুবাত ব্যক্তি গগনভ্রমণ, বহুপিত্ত ব্যক্তি বহ্নিদাহ ও বহুশ্লেষ্মা লোক জলভ্রমণ প্রভৃতি স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। *

এক্ষণে বুঝিতে পারিলে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে, অনেক সত্য বা যথার্থীভূত স্বপ্নের কোন মীমাংসা করিতে পারা যায় না। শারীরিক ক্রিয়ার বিকৃতি জন্য মানুষ যে স্বপ্ন দেখে এবং ঋষিরা যাহাকে জৈবিক-স্বপ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহাদের মতে একমাত্র যথার্থ ও সম্ভবপর স্বপ্ন। ইহা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ।

শুনিয়া থাকিবে, অনেক স্বপ্ন কেবল ক্ষণিক ও চিন্তা-স্মৃতি, আবার অনেক স্বপ্ন সত্য হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় অনেকে জটিল অঙ্ক-শাস্ত্রের মীমাংসা করিয়া থাকেন, অনেকে ঔষধ প্রাপ্ত হন, অনেকের ভবিষ্য জ্ঞান আইসে। কেন এরূপ হয়, ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, স্বপ্ন জিনিষটা কি।

হার্বার্ট-স্পেনসরপ্রমুখ খ্যাতনামা নর-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, স্বপ্নের অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজিতে অনেক দূরে যাইতে হয় না। কোল-ভিল প্রভৃতি অসভ্য জাতির কুটীরে দুই-এক-

---

স্বপ্নে গগনশ্চৈব বহুবাতো নরো ভবেৎ ॥

*　　　*　　　*

স্বপ্নে চ দীপ্তিমৎপ্রেক্ষী বহুপিত্তো নরো ভবেৎ ॥

*　　　*　　　*

স্বপ্নে জলাশয়ালোকী বহুশ্লেষ্মা নরো ভবেৎ ॥

অগ্নিপুরাণম্ ৬ অঃ। ৩৬।৩।৭

রাত্রি বসবাস করিলেই, তাহার মূলরহস্য উদ্‌ঘাটিত করা যাইতে পারে। আদিম বা অসভ্য অবস্থায় মানবের আত্মগত ও আগন্তুক (যাহা বহির্জ্জগতাশ্রয়ী) অনুভূতির ভেদজ্ঞান থাকে না।

আদিম অবস্থায় মানবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রভৃতির ভেদজ্ঞান ছিল না। আজিও অনেক ভাষা আছে, যাহাতে অতীতকাল বলিয়া কোন পদার্থ নাই। সুতরাং পূর্ব্বে কোন পদার্থ দেখিলে তাহার স্মৃতি মনে করিয়া রাখিয়া, আপনার অনুভূতি ও কালের বিভাগ করা আদিম সমাজে মানবের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ইহার ফলে, কোন পূর্ব্বদৃষ্টের স্মৃতি মনে জাগিলে, তাহা যেন কোন উপস্থিত বাস্তব পদার্থের ছায়া বা কার্য্য বলিয়া তাহার মনে হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি! মনে কর, এরূপ লোক কোন দিন হয় ত কোন নূতন অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিল। তাহার অতীত কালের ধারণা নাই বলিয়া ইতর জন্তুর ন্যায় কালভেদ লইয়া চৈতন্যের রাজ্যে তাহার বড়ই গোলযোগ ঘটিত। মনে কর, একদিন নিদ্রিতাবস্থায় সেই ছবি তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে স্বপ্নে দেখিল,—যেন সেই নিবিড় অদৃষ্টপূর্ব্ব অরণ্যের ভিতর সে কোন ব্যাঘ্রের বা সিংহের পশ্চাতে ছুটিতেছে। জাগিয়া উঠিয়া দেখিল সে যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে। মনে তাহার বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল, "আমি না ছুটিয়া ছুটিতেছিলাম কিরূপে।" স্বপ্নে স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে, সে মৃগয়া করিতেছে। চক্ষুকে অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আদিম মানব সিদ্ধান্ত করিল, কোন ভূত অপার্থিব সত্তা সিংহ বা ব্যাঘ্র হইয়া তাহাকে এইরূপ ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল।

এইরূপে স্বপ্নের অপার্থিব চরিত্রের প্রথম সংঘটন। তাহার পর ক্রমবিকাশ-সূত্রে, সেই বিশ্বাস, সেই ধারণা কাল ও বংশপরম্পরাক্রমে মানবের অনিবার্য্য মৌলিক বিশ্বসমষ্টির অন্তর্ভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের মত,—ভুলভ্রান্তি রক্তবীজ হইলেও অমর নহে। মানুষের আদিম অবস্থায় যে সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল, বর্ত্তমান মানবের উন্নতিশীল বুদ্ধিতে তাহা বহুদিন ত্যক্ত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। যে মানবের কালভেদ ছিল না, আর বর্ত্তমান যুগের মানবের মার্জ্জিত বিজ্ঞান ধরিলে ইহাতে ও তাহাতে নর-বানরের অপেক্ষাও অধিক প্রভেদ। অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ আর অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র, বংশপরম্পরাগত একই শক্তির বিকাশ হইলেও ব্যক্তিগত হিসাবে এক ব্যক্তি নহে। আদিম মানবের জ্ঞান বহুদিন মরিয়া গিয়াছে। যাহা মরিয়া গিয়াছে, তাহার গুণের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং সত্য যুগপৎ বা ভবিষ্যদ্দর্শী স্বপ্নের কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু ক্রমবিকাশ-সূত্র অনুসারেও পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সমীচীন নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ঋষিরা এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্বপ্নের দেহগত বা মানসিক অংশ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তাহার আত্মিক বা অধ্যাত্ম অংশের ব্যাখ্যাই আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গাধীন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিদ্রা শরীর সম্বন্ধে একরূপ স্তনদাত্রী মাতা। জাগ্রত অবস্থায় ক্লান্ত জীবের শ্রান্তিবিধান করিতে, শরীরে সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া নবীন শক্তিতে নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত করিতে নিদ্রার মত অন্য কোন উপায় নাই। কারণ, নিদ্রাবস্থায় দেহের বা জীবত্বের গূঢ়তম মৌলিকতত্ত্বগুলি জীবাত্মার অধিষ্ঠান আনুসঙ্গক্রমে নবজীবন লাভ করিয়া থাকে। তাই বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মানুষ ও দেবতা যাহারই কোনরূপ দেহ আছে, তাহাকেই আত্মস্থিতির জন্য ঘুমাইতে হয়। কিন্তু ইহা শুধু নিদ্রার মৌলিক উদ্দেশ্যের একাংশ মাত্র। নিদ্রার অপর উদ্দেশ্য স্বপ্নদর্শন।

একথা শুনিয়া তোমার আতঙ্ক হইতে পারে। কিন্তু তাহার কোন কারণ নাই। জীবনও স্বপ্ন। জীবাত্মা যে কামনা, যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

করিতে বা যে অদৃষ্ট যে কর্ম্ম উপভোগ করিতে দেহবদ্ধ হইয়াছেন, তাহারই নাম জীবন। তাহার শ্রেষ্ঠোপযোগী আনুসঙ্গের নামই সংসার। কিন্তু জীবন অদৃষ্ট-স্বপ্ন লইয়া বনবাস করিলে, জীবাত্মার মুক্তি বা ঊর্দ্ধগতির পথ চিররুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাই জীবাত্মাকে ঊর্দ্ধতন চৈতন্যের রাজ্যে মাঝে মাঝে উকি মারিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার নামই অধ্যাত্ম বা আত্মিক স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্ন,—জীবাত্মার স্বদেশের ভৌগোলিক মানচিত্র পরিদর্শন,—আপনার মহীয়ান্ অদৃষ্টের আলেখ্য দর্শন মাত্র। নিদ্রায় দেহ নবীকৃত হয়, আত্মিকতত্ত্বের মার্জ্জন সংস্কারই একরূপ চিদাশ্রিত স্বপ্নের উদ্দেশ্য। মানুষে সংসার লইয়া থাকে, মরণের জন্য আপনার ঘর সংসার গুছাইয়া রাখিতেই তাহার জীবন কাটিয়া যায়। সুতরাং তাহার আত্মিক অধিকারের কথা তাহার অমর বৈকুণ্ঠগত আনন্দপিতৃসত্ত্বের বিষয় ভাবিবার বড় ইচ্ছা বা অবসর ঘটিয়া উঠে না। তাই মাঝে মাঝে কোন কারণে চিত্তের একাগ্রতা হইলে, সেই সকল ঐশ্বর্য্য,—সেই সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতির ঐশীশক্তির আভাস মাঝে মাঝে তাহার জীবনচৈতন্যের উপর ভাসিয়া যায়। সে স্বপ্ন তাহার পিতৃরাজ্যের আবাহনী লিপি,—আপনার গরীয়ান্ অদৃষ্টের অঞ্চল-বাতাস। সে স্বপ্নে মানবের দেবটীকার মাহেন্দ্রলগ্ন ফুটিয়া উঠে। স্বপ্নদ্রষ্টা বুঝিতে পারে, তাহার জীবত্বের নিম্নে যে অনন্ত রত্নাকর অনন্ত অশ্রুত কল্লোলে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে, তাহার সলিলে তীর্থস্নান করিতে পারিলে, তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ক্ষিত্যপ্‌তেজ প্রভৃতির উপর প্রভুত্ব চির প্রতিষ্ঠিত হইবে। এরূপ স্বপ্নে ভোগী যোগী হয়, ঘোর সংসারী কঠোর সন্ন্যাস আশ্রয় করে।

এইরূপ স্বপ্নে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন। এইরূপ স্বপ্নে ধ্রুব অনন্তে ধ্রুবত্ব লাভ করেন। তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, স্বপ্নাবেশে

ঔষধ পাওয়ার পর হইতে অনেক পাষাণ-পাপাত্মাও দেবাত্মা হইয়া উঠিয়াছে।

এখন বুঝিতে পারিলে, মানুষে যে সত্য স্বপ্ন দেখে, তাহা চিত্তের একাগ্রতার জন্য দ্রষ্টার (জীবাত্মার) আবরণ উন্মুক্ত হয় বলিয়া। ঋষিদের মতে, একাত্মা সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান। কেবল ব্যক্তির অদৃষ্টানুসারে তাহার অবস্থার ভেদ হইয়া থাকে। একথা মিথ্যা নহে। এইজন্যই একে অপরের মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন। দুইজনে একাবস্থায় পড়িলে প্রায় একরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। প্রথমটী আমরা ভাবপরি-চালন বা দূরানুভূতি প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। দুইজনের এক স্বপ্নদর্শন বিষয়ে আমি তোমায় একটী সত্য ঘটনা বলিতেছি। দেখিবে, আত্মিক স্বপ্নে মানুষে যুগযুগান্তর পূর্ব্বের অধিবাসীকে জীবন্ত ও বর্ত্তমান দেখিতে পায়। ঘটনাটি এই,—শ্রীমতী ইনা বিডার ও শ্রীমতী এন্ বিডার দুইজন সহোদরা ভগিনী। তাঁহাদের পিত্রালয়ের পার্শ্বস্থিত ময়দানে, পাষাণযুগের (যে যুগে মানুষে কোন রূপ ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার জানিত না কোন প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র বা থালা বাটি ইত্যাদি ব্যবহার করিত) একটী নরকঙ্কাল ও কতকগুলি অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায়। একদিন রাত্রে ভগ্নীদ্বয় একরূপ স্বপ্ন দেখেন। আমি তাঁহাদের পত্র একখানি পাঠ করিতেছি,—

র‍্যাভেন্স্‌বেরী পার্ক। মিছেম ৯ই জুন, ১৮৮০।

গত রাত্রে আমি ও আমার ভগিনী ইনা বিডার এক গৃহে নিদ্রা যাইতেছিলাম। ঘুমাইতে ঘুমাইতে আমার মনে হইতে লাগিল, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। স্বপ্নের প্রথমাংশটি আমার ভাল স্মরণ নাই, তবে একটু মনে আছে যে, যেন সেই পাষাণযুগের নরকঙ্কালটি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে সে মূর্ত্তি বড় স্পষ্ট, বড় জীবন্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল * * স্কন্ধ হইতে একটী কাল চাদরের মত আবরণ

ঝুলিতেছে * * এখন তাহা আর কঙ্কাল নাই, যেন জীবিত। সুদীর্ঘ নাসা যেমন গড়াইয়া পড়িতেছে * * আমার বড় ভয় করিতে লাগিল, আমি জাগিয়া উঠিলাম। আমার ভগিনীকে জাগাইলাম, কিন্তু আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সে বলিল, "আমি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি।" এই কথা বলিয়া, সে তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। দেখিলাম আমার স্বপ্ন ও তাহার স্বপ্ন ঠিক এক।—শ্রীমতী এন্ বিডার। *

স্বপ্ন সত্য হইবার কথা তুমি অনেক শুনিয়াছ, দুই চারিটি ঘটনা আমি প্রসঙ্গান্তে বর্ণনা করিব। এক্ষণে দেখিতে পাইলাম, আত্মা যে এক তাহা অবিশ্বাস্য কথা নহে; বরং মনুষ্য জ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই এ সত্যের প্রচুর প্রমাণ সংগৃহীত হইতেছে।

"স্বপ্ন এ সংসার."—একথা কবিরা বলেন। কবিরা বলেন বলিয়া কি ইহা সত্য নহে? কবি বা প্রতিভা, সমগ্র মনুষ্যজাতির একরূপ দিব্যচক্ষু। কাব্যে অনেক সত্যের আলোক প্রথমতঃ প্রতিভাত হয়, পশ্চাতে বিজ্ঞান দর্শন তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তুলেন। মনে কর, একটী বিরাট চৈতন্য—তুমি, আমি, বৃক্ষ, লতা, গিরি, সাগর যাহার বহির্বিকাশ, তাহা হঠাৎ কোন অজ্ঞেয় কারণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মায়া বল, অবিদ্যা বল, এমন কোন সর্ব্বাঙ্গীন আবরণ মুড়ী দিয়া সে ঘুমাইতেছে,—যাহাতে এ বিশ্বপ্রকৃতি স্বপ্নরূপে তাহার নয়নে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার এ চাদর স্বকৃত, স্বেচ্ছাবৃত হইলেও তুমি আমি তাঁহার ব্যাষ্টি অংশ বলিয়া, তোমার আমার তাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি "স্বপ্ন এ জীবন" এ কথার পূর্ণ সার্থকতা কি? মরণে তুমি আমি জাগিয়া উঠি, স্বপ্ন ছুটিয়া যায়, তখন এ সংসার ধ্বংস হওয়াই অনিবার্য্য। তুমি আমি একরূপ স্বপ্নের কাশীর কৌটা—বড়

* Apparition and Thought Transference, P. 170.

স্বপ্নের ভিতর ছোট স্বপ্ন, তাহার ভিতর আরো ছোট, তাহার ভিতর আরও। এ জগৎ স্বপ্ন নহে, কে বলিল?—কে বলিতে পারে, তোমার আমার চক্ষে বিশ্ব যেরূপ প্রতীয়মান, তাহার রূপ প্রকৃতই তাহাই? মনুষ্য চক্ষুর মত পরকলা লইয়া জগৎ দেখিলে মানুষকে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইতে হয়। জগৎ স্বপ্ন নহে কে বলিয়াছে? মানব-চক্ষে অনুভূতির ছায়া ভিন্ন স্বপ্নের অন্য কোন্ অর্থ হইতে পারে? জীবন স্বপ্ন, মরণে স্বপ্ন, স্বপ্ন আসিয়া স্বপ্নকে ঘেরিয়া বসিতেছে। তুমি আমি দিন রাত স্বপ্ন-নিদ্রার অতল সাগরে ডুবিয়া যাইতেছি। জানিয়া শুনিয়া মানুষে তাহা সহ্য করে কেমন করিয়া! কোথায় সত্য! কোথায় জাগরণ! এই জীবন-স্বপ্নের ভিতর আবার—স্বপ্ন আইসে, তাহা ধরিয়া সত্য জাগ্রতের দেশে পাওয়া যায়।

মিষ্টার এফ্ এ মার্ক লিখিয়াছেন,—১৪ই জানুয়ারি ১৮৭৪।

গত অক্টোবর মাসে একদিন অপরাহ্নে আমার বড় ক্লান্তি বোধ হয়, আমি ঘুমাইয়া পড়ি। আমি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম, আমি যেন এক বহুদূর বিস্তৃত জলরাশির কূলে উপস্থিত হইয়াছি। তাহা যেন অনিদ্র-হ্রদ। ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে, অন্ধকারের বুকে বিদ্যুৎ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। পর্ব্বত-আকার তরঙ্গ তুলিয়া হ্রদের জল বায়ু-বৃষ্টির সহিত ভৈরব তাণ্ডবে যোগ দিতে ছুটিতেছে। হঠাৎ যেন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বড় বিপন্ন হইয়া, উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিল, তাহাতে দুইজন মাত্র আরোহী আছে। একজন পিছনে বসিয়া হাল ধরিয়া, আর একজন প্রাণপণ যত্নে পাল নামাইবার চেষ্টা করিতেছেন। নৌকাখানি এক একবার তরঙ্গের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্বস্থ জলরাশি, ফুলিয়া উঠিয়া ক্ষুদ্র তরণীকে যেন সমাহিত করিয়া ফেলিতে চাহে। তাহার পর যখন দেখিলাম, আরোহীদ্বয়ের মধ্যে একজন আমার কনিষ্ঠ চাল স,

তখনই প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে নিরাশায় আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, হঠাৎ ঝড়-বাতাস যেন একটু থামিয়া গেল, যেন স্বর্গদেবতারা আমার ভ্রাতার রক্ষাকল্পে প্রকৃতির সে উগ্রমূর্ত্তি শান্ত করিতেছেন।

আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া, স্বপ্নবোধে সে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করিতে কেমন আমার শ্রদ্ধা হইল না। আমি আমার বন্ধু ফ্রাঙ্ক স্মিথকে এ সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি স্বপ্ন অমূলক চিন্তা ইত্যাদি কথা বলিয়া, জগতের বুদ্ধিমান সর্ব্বজ্ঞের মত একটী সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার তিন চারি দিবস পরে আমি চার্লসের পত্র পাই, সে পত্র আমার স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্তের অনুরূপ। সে নদীতে বেড়াইতে গিয়া ঐ দিন বিপন্ন হইয়াছিল। *

* Onelda Circular (U. S. A.) 19th January 1871

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভৌতিক কাহিনী।

গুরু। এক্ষণে, আমি তোমাকে কতকগুলি ভৌতিক কাহিনী শুনাইতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

শিষ্য। হাঁ, এক্ষণে আমারও উহা শ্রবণ করিতে আকুলবাসনা হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। কেন, ভৌতিক কাহিনী শুনিতে তোমার আকুলবাসনা কেন হইতেছে?

শিষ্য। কি প্রকার পাপ করিয়া, কোন্ আত্মিক কিরূপ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কি প্রকার পার্থিব মনুষ্যকে দর্শন দিয়াছিল, কিরূপে সে মুক্তিলাভ করিয়াছিল,—তাহাই শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। তবে শুদ্ধ ভৌতিক কাহিনীর অদ্ভুত ঘটনা শুনিয়াই বিস্ময়-রসে আপ্লুত করিতে চাহ না?

শিষ্য। না;—তজ্জন্য অনেক গল্পের বহি আছে, পাঠ করিতে পারি। আপনি ইত্যগ্রে ভৌতিকতত্ত্বের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,

এক্ষণে আর বিশ্লেষণে প্রয়োজন নাই—আপনি কেবল কাহিনীগুলি বলিয়া যান।

গুরু। এস্থলে আর একটি কথা তোমাকে বলিতে চাই।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। তোমার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি, তাহা জড়াতীত বিষয়; অতএব আমাদের জড়বুদ্ধির অতীত কোন বিষয় বুঝিতে যদি আমাদের একটু গোলযোগ হয়, তাহা আমাদেরই অজ্ঞতা বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা তাহা বাস্তবিক ভ্রম নহে। মনে কর আমরা নিদ্রা যাই,—কিন্তু আবার নিদ্রা ভাঙ্গে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে যেমন সবিশেষ সদুত্তর পাওয়া কঠিন হয়, তদ্রূপ জড়াতীত সমস্ত বিষয়েরই সূক্ষ্মভাবে উত্তর হইতে পারে না; কেননা আমরা জড়—ঐ জ্ঞান জড়াতীত।

শিষ্য। সে কথা আবার কেন? পূর্ব্বেই ত তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

গুরু। আর একবার কথাটা বলিলাম। কেননা, যে সকল কাহিনী তোমাকে বলিব—তাহাতে অনেক অলৌকিকত্ব—অনেক অদ্ভুততত্ত্ব আছে। সমস্ত কথার—সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও সময় সাপেক্ষ।

শিষ্য। আমি সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি, আর বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হইবে না; এক্ষণে আপনি কাহিনীগুলি বলুন।

গুরু। এই জন্যই আমাদের দর্শনশাস্ত্রাদির পরে পুরাণাদির উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছিল। দর্শন যাহা বহু কষ্টে বুঝায়, উপাখ্যান তাহা সহজেই লোকের মনে অঙ্কিত করিতে পারে, অর্থাৎ দর্শন-বিজ্ঞানের কার্য্য পরোক্ষভাবে, আর উপাখ্যানের কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে। দর্শন-বিজ্ঞান

উপদেশ, উপাখ্যান উদাহরণ। দর্শন-বিজ্ঞান অশরীরী, উপাখ্যান শরীরবিশিষ্ট। সূক্ষ্ম ও স্থূলে যে প্রভেদ, এতদুভয়ে আমি সেই প্রভেদ দেখিতে পাই। যাহাকে বুঝিতেছি অথচ ছুঁইতে পারিতেছি না, তাহাই সূক্ষ্ম। আর যাহাকে যেমন বুঝিতেছি, তেমনি নাড়িয়া চাড়িয়া অনুভব করিতে পারিতেছি, তাহাই স্থূল। উপাখ্যান বা কাহিনীকে আমি সেই রূপ স্থূল মনে করি। বস্তুতঃ সূক্ষ্মের পরমাণুসমষ্টি স্থূল ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে পরমাণু অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে অনুভূতির বিষয়ীভূত হইতে পারে না, তাহারই একত্র সমবায় ঘটিলে দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে। উপাখ্যান বা কাহিনী দর্শন-বিজ্ঞানের সেইরূপ পরমাণু-সমবায় বলিয়া আমার ধারণা। আমি এই বুঝি যে Philosophy শব্দের যদি Abstract ও Concrete বলিয়া দুইভাগ করা যায়, তাহা হইলে উপাখ্যান বা কাহিনী সেই Concrete Philosophy ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া অল্পাধিক পরিমাণে এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে জগতের সকল বস্তুরই সেই বৃত্তির উপর কার্য্য করিতেছে। ইহার মধ্যে যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যত বেশী কার্য্য করে, সেই তত তাহার বেশী আপনার বলিয়া বোধ হয়। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণের এই জন্য এত আবশ্যকতা। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন অপেক্ষা পুরাণাদির কাহিনী এই জন্য এত মর্ম্মস্পর্শী। সুখ কি, দুঃখ কি, পাপ কি, পুণ্য কি, জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ সকল তত্ত্বদর্শন যে ভাবে বুঝাইয়া দেয়, তাহা বুদ্ধির অননুমেয় না হইলেও বৃত্তির উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় একটা কার্য্য করে না। উপাখ্যান বা কাহিনী সে সব তত্ত্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পায়, সুতরাং তাহা সহজে গিয়া বৃত্তির উপর ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত করে। এই সময়েই আমরা উপাখ্যান বা কাহিনীর কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

বুঝিতে পারি। উপাখ্যান বা কাহিনী বৃত্তির উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এইরূপ কার্য্য করে বলিয়াই Revd. Abererombie প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে উপাখ্যান ও কাহিনীপাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলেন পাপ, পুণ্য, সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মানব-হৃদয়ের অতি উচ্চ বৃত্তি। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সেই সকল কাহিনী পাঠ করিয়া ঐ বৃত্তিগুলির এত অধিক আধিক্য জন্মিয়া যায় যে, আমরা পৃথিবীর উপরে থাকিয়া অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়া বসি। সে যাহা হউক, প্রাগুক্ত কথা কয়টির এইস্থলে অবতারণা করিবার হেতু এই যে, উপাখ্যান ও কাহিনী যে মানব হৃদয়ের বৃত্তির উপরে অতি দ্রুততর কার্য্য করিতে সক্ষম, তাহাতে কেহই দ্বিবিধ মতের পরিপোষণ করে না। অতএব আমি তোমাকে এইজন্যই ভূতের কাহিনী শুনাইতে প্রস্তুত হইতেছি।

শিষ্য। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। আপনি যে সকল কাহিনী বলিলেন, তাহার সকল গুলিই কি সত্য?

গুরু। আমি ত সেগুলি সব নিজ চক্ষে দর্শন করি নাই। কোনটি বা কোন বন্ধুর নিকটে শুনিয়াছি, কোনটি বা পুস্তকে পড়িয়াছি—কোনটির বা আভাসিক ঘটনা অনুভব করিয়াছি। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে সকল গল্প আমি বলিব, তাহা যাহাদিগের নিকট অবগত হইয়াছি, তাহা আমি নিজের দেখারমত বিশ্বাস করিয়া থাকি। আরও এক কথা,—এই গল্পগুলির মধ্যে যেগুলি শুনিয়া বা পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছি, তাহাদের কোথাও একটু আধটু ব্যতিক্রম হইতে পারে। তজ্জন্য আমি দায়ী নহি; কেননা, শ্রবণীয় বিষয়ের কোন কোন অংশ আমার বা বক্তারও মনে না থাকিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

গদখালির হাত।

প্রথমে যখন আমাদের দেশে জনপদ-বিধ্বংসিনী ম্যালেরিয়া রাক্ষসী সমাগত হয়েন, তখন তাঁহার প্রথম কবলে উলা, শ্রীপুর ও গদখালি বিধ্বংস হয়। গদখালি যশোহর জেলায়।

ম্যালেরিয়ার নিদারুণ কবলে গদখালি যখন জীর্ণ-দীর্ণ ও বিধ্বংস হইতেছিল, তখন প্রতি গৃহস্থের গৃহ শ্মশান-ভূমির বিভীষিকাময় দৃশ্যে পরিণত, সকলেই রোগযন্ত্রণায় শয্যা-শায়িত। গৃহস্থ পুত্র-কন্যা-স্ত্রী-ভগিনী লইয়া রোগশয্যায় পতিত। কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহে না; কোলের ছেলে রোগে ভুগিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল,—স্নেহময়ী জননীব কাঁদিবার শক্তি নাই, উত্থানের সামর্থ্য নাই। রোগ-ক্লিষ্ট অধরে মৃত্যুর ছায়া,—কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষুর উষ্ণজল রুগ্নহস্তে মুছিয়া উপাধানে মুখ গুঁজিতেছিল। হয় ত শোকসন্তপ্ত মাতাও দিবসের শেষে পুত্রের অনুগমন করিলেন। সৎকার করিবার লোক নাই,—মৃতদেহ দূরে ফেলিবার সহায় নাই। প্রতিবাড়ীতেই মৃতদেহ—প্রতিগৃহস্থই জনশূন্য ও রোগের করালগ্রাসে আপতিত।

এই সময় একদিন এক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার পর প্রান্তরের পথ বহিয়া গদখালি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণের বয়স চল্লিশের উপর নহে, দেহ বেশ বলিষ্ঠ ও সমুন্নত। হাতে একটি ব্যাগ ও একগাছা লাঠি। পায়ে নাগরা জুতা, গলে শ্বেতবর্ণের উপবীতগুচ্ছ। মস্তকে একখানা উড়ানী বাঁধা। রাত্রি হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ যেন একটু অধিকতর দ্রুতপদে আশ্রয় লাভার্থ গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার

মুখভাব দর্শন করিলেই স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যাইতেছিল যে, তিনি অধিক দূর হইতে পদব্রজে চলিয়া আসিতেছেন,—এবং তজ্জন্য নিতান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

সন্ধ্যার আঁধারে যখন গ্রামখানি তাহার সমস্ত বৃক্ষ-বল্লীর ও বাড়ী-ঘর-দুয়ার লইয়া ম্লানমুখে বসিয়াছিল, যখন পথ-ঘাট সমস্ত অন্ধকারে বিপ্লাবিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন পথিক ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই একটী গৃহস্থের বাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহার দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন "কে বাড়ীর মধ্যে আছেন মহাশয়! আমি একজন সম্পূর্ণ অজানিত ব্রাহ্মণ অতিথি। আমাকে রাত্রির মত একটু স্থান দিতে হইবে।" ব্রাহ্মণের কথায় কেহই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। ব্রাহ্মণের এ গ্রামে কেহই পরিচিত ছিল না, পূর্ব্বে যে কখনও এ গ্রামে তিনি আসিয়াছিলেন, ভাবে এমনও বোধ হয় না। তিনি পুনরায় ডাকিলেন এবং ঐ কথাই বলিলেন। এবার রমণী-কণ্ঠে কাতর করুণ শব্দে উত্তর হইল, "মহাশয়! বাড়ীতে পুরুষ মানুষ নাই, আমরা দুই শ্বাশুড়ী-বউ আছি,—দু'জনেরই জ্বর। একটি কোলের ছেলে ছিল, গত কল্য তাহাকে হারিয়েছি। আপনি অন্যত্র দেখুন।" তাহা-দিগের বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া পথিক ব্রাহ্মণের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল; কিন্তু তদবস্থায় তিনি আর কি করিতে পারেন? কাজেই অন্যত্র অবস্থানের জন্য প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর যাইতেই সম্মুখে একটী ক্ষুদ্রায়তন সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন সেই বাড়ীতে অবশ্যই আশ্রয় পাইবেন, এই আশাতে তদভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে গমন করিয়া দেখিলেন, বহির্ব্বাটীতে একটিও আলোক নাই, চারিপাশের অন্ধকাররাশি বুকে করিয়া সেই প্রাসাদটী নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া আছে। এক একবার স্তব্ধ-

নৈশবায়ু তাহার বুকের উপর দিয়া সন্ সন্ রবে চলিয়া যাইতেছে। পথিক ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু জনমানবের সাড়া শব্দ কিছুই পাইলেন না। তখন মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয় ত এখানকার নিয়মানুসারে এই বাড়ীর যিনি মালিক, তিনি সপরিবারে বিদেশে অবস্থান ও চাকুরী করিতেছেন, বাটীর মধ্যে দুই একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া আছেন, কিন্তু কি করিয়া আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করি? অথবা প্রবেশ না করিয়াই বা কোথায় যাই? রাত্রি হইয়াছে, অন্ধকারে পথ ঘাট সমস্ত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রথমে সেখানে দাঁড়াইয়া অনেক ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু কাহার কোন প্রকার সাড়া-শব্দ না পাইয়া পায় পায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন,—একটা ক্ষীণ আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে। তখন তিনি যে গৃহ হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া ডাকিয়া বলিলেন, "গৃহে কে আছেন? আমি দূরনিবাসী জনৈক পথিক ব্রাহ্মণ,—রাত্রি হইয়াছে, এ গ্রামে কাহাকেও জানি না। কোন বাড়ীও চিনি না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজ রাত্রি যাপনের মত একটু স্থান প্রদান করিতে হইবে।"

গৃহ হইতে পুরুষকণ্ঠে, অথচ কিছু করুণ-ক্লিষ্ট-স্বরে উত্তর হইল, "মহাশয়! আমার বাড়ীতে স্ত্রীলোক আদি নাই! কেন নাই, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমার নিজেরও উঠিবার শক্তি নাই। যদি নিজে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইতে পারেন এবং নিজে সব দেখিয়া শুনিয়া লইতে পারেন, তবে থাকুন, তাহাতে আপত্তি নাই।"

পথিক ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন,—"আপনারও কি অসুখ?" উত্তর পাইলেন "হাঁ মহাশয়!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার আহারাদির কোন প্রয়োজন নাই। একটু স্থান পাইলে রাত্রিটুকু কাটাইয়া প্রত্যূষে চলিয়া যাইব।"

উত্তর হইল, "তাহা হইতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ উপবাসী থাকিতে পারিবেন না। তারপরে আমার একটু উপকার করিয়া যাইতে হইবে।"

ব্রা। আমি যথাসাধ্য আপনার উপকার করিতে চেষ্টা করিব।

উ। তবে ঘরে আসুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ বাড়ীতে স্ত্রীলোক নাই।

তখন ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, একখানা খাটের উপরে একজন পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার দেহ জীর্ণ-শীর্ণ, বয়স অনুমান পঞ্চাশের উপর হইবে না। শয্যার অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, অনেক দিন পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি রোগশয্যায় শায়িত এবং শয্যাদি অনেকদিন পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় আছে। তদ্দর্শনে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, কল্য না হয় কিয়ৎক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিয়া ভদ্রলোকের শয্যাদি পরিবর্ত্তন ও পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইব। তিনি আরও ভাবিলেন, ভদ্রলোকটী যে উপকারের কথা বলিবেন, বোধ হয়, এই সকল কার্য্যের কথাই হইবে। রোগ-শয্যায় শায়িত গৃহস্বামী বলিলেন, "মহাশয়! ঐ কোণের দিকে আসন আছে, একখানা টানিয়া লইয়া বসুন, সম্ভবতঃ গাড়ুতে জল আছে, আর যদি না থাকে, গাড়ু অথবা ঘটী লইয়া উঠানের কূয়া হইতে জল তুলিয়া আনিয়া হাত-পা মুখ ধৌত করুন। তৎপরে আহারাদির বন্দোবস্ত করুন।" ব্রাহ্মণ জল তুলিয়া আনিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিলেন। তদনন্তর বলিলেন, "আমি রাত্রে কিছুই খাইব না।" তখন গৃহস্বামী বলিলেন, "মহাশয়! তাহা হইতে পারিবে না। একান্তই যদি রন্ধনে অনিচ্ছুক ও অপারগ হয়েন, তবে ঐ তাকের উপরে পিতলের কলসীর ভিতর চিড়া

মুড়্কি আছে, মাটির ভাঁড়ে গুড় আছে,—আর এই খাটের নিম্নে থালা, গেলাস ও বাটি আছে, বাহির করিয়া লইয়া ভক্ষণ করুন, আমার দুরদৃষ্ট, —নতুবা ব্রাহ্মণ-অতিথিকে যেরূপে অভ্যর্থনা করিতে হয়, তাহা আমি কিছুই করিতে পারিলাম না।" ব্রাহ্মণ ঐ রুগ্ন গৃহস্বামীর এতাদৃশ সৌজন্য ও ভদ্রতায় বিমুগ্ধ হইয়া তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলেন। যথাকথিত স্থান সকল হইতে দ্রব্যাদি বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বাটিতে চিড়া ভিজাইয়া লইয়াছেন, এমন সময়ে রুগ্ন গৃহস্বামী বলিলেন, "মহাশয়ের নিতান্তই কষ্ট হইল,—দধি বা দুগ্ধ না হইলে, কখনই চিড়ামুড়্কি খাওয়া যায় না; জল দিয়া খাওয়া অত্যন্ত বিরক্তিকর। যাহা হউক, উহা ভক্ষণ করুন—আমার ত কোন শক্তি নাই।" তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন "না, মহাশয়! আপনি সেজন্য মনে কিছুই করিবেন না। আপনার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ইহাই যথেষ্ট! আমার কিছুই খাবার প্রবৃত্তি নাই, তবে আপনি দুঃখিত হইবেন, এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন বলিয়া ইহা খাইতে স্বীকৃত হইলাম। আমাদের মত লোকের —বিশেষতঃ আমাদের মত প্রবাসীজনের ইহাই যথেষ্ট! দধি দুগ্ধ কি আর সর্ব্বদা মিলিয়া থাকে? তবে একটু অম্ল হইলেই আর কথা কিছু ছিল না।"

ব্রাহ্মণের বাক্য শেষ হইলে, গৃহস্বামী বলিলেন "হাঁ হাঁ, মনে হইয়াছে। এই গৃহের পশ্চাদ্ভাগে নেবুর গাছ আছে, সে গাছটা প্রায় এই গৃহের ভিত্তিসংলগ্ন, তাহাতে অনেক নেবু ধরিয়াছে।"

ব্রা। পথ কোন্ দিক্ দিয়া জানিতে পারিলে, আমি না হয় একটা ছিঁড়িয়া আনিতে পারিতাম।

গৃ। না মহাশয়! সেদিকে আপনি যাইবেন না। আপনি কি জানেন না, আমাদের গ্রামে ভয়ানক মারীভয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিগৃহস্থের

গৃহই প্রায় জনশূন্য,—যে দুই চারিজন বাঁচিয়া আছে, তাহারাও রোগগ্রস্ত ও শয্যা-শায়িত। কোন বাড়ীতে কেহ মরিলে আর তাহার সৎকার্য্য করিবার লোক নাই,—কত লোকের সৎকার্য্য হইবে? প্রত্যহ কত লোক মরিয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রা। কি সর্ব্বনাশ? হাঁ, শুনিয়াছি বটে যে আপনাদের এই গদখালিগ্রামে একরূপ জ্বর হইতেছে, তাহাতে লোক মরিয়া যাইতেছে,—তবে এতদূর ঘটনা শুনি নাই। কিন্তু আপনি নেবুগাছের ওদিকে যাইতে আমাকে কেন নিষেধ করিতেছেন?

গৃ। আমার দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে উপর্য্যুপরি দুই দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু শ্মশানে লইয়া যাইবার লোক পাইলাম না, আমারও শরীর তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কাজেই ঐ বাগানের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ এখনও তাহাদের দেহ সেখানে পড়িয়া থাকিতে পারে।

ব্রা। কি ভয়ানক শোক-সংবাদ! আপনার স্ত্রী কোথায় আছেন?

গৃ। সে তাহার চারি পাঁচদিন পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল। তাহার দেহ সৎকার করা হয়।

ব্রা। তবে ত এই রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে আপনার হৃদয় নিদারুণ শোক-যন্ত্রণায় দহ্যমান। আমি আসিয়া ত তবে আপনাকে আরও যন্ত্রণা দিলাম। মহাশয়! ক্ষমা করিবেন।

গৃ। না, আমার এখন আর কোন শোক বা যন্ত্রণা নাই, আমার দারা, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি যেখানে, আমিও সেখানে যাইতে পারিব—আপনি কৃপা করিয়া আসিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আপনি না আসিলে বরং আমি সমধিক যন্ত্রণাতেই ছিলাম।

পথিক ব্রাহ্মণ কথাগুলার অর্থ তত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন

না। তবে একরূপ বুঝিলেন যে, শোকে, মোহে, রোগে ও যন্ত্রণায় ভদ্রলোক ঐরূপ বলিতেছেন।

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আপনার শোকের কাহিনী শুনিয়া আমার আর আহারাদি ভাল লাগিতেছে না।"

গৃ। সে কি মহাশয়! আপনি কিছু না খাইলে আমার শান্তি হইবে না। আমার শৃঙ্খল ছিন্ন হইবে না।

ব্রা। আপনার কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

গৃ। আপনি আহার করুন, সমস্তই বুঝাইয়া বলিব এখন।

ব্রাহ্মণ চিড়ায় জল ঢালিয়া দিলেন। গৃহস্বামী বলিলেন,—"আপনি চক্ষু মুদ্রিত করুন, আমি নেবু আনিয়া দিতেছি।"

"সে কি! যে ব্যক্তির শয্যার উপর উঠিয়া বসিবার সামর্থ্য নাই,—যাহার ভৌতিক দেহ শয্যার সহিত সংলগ্ন, সে কি প্রকারে নেবু আনিয়া দিতে পারিবে! বিশেষতঃ চক্ষু বুজিলে কি প্রকারে তাহার গতিশক্তি হইবে?" এবম্বিধ চিন্তা ব্রাহ্মণের হৃদয় অধিকার করিল,—সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুগুলা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হাঁ, চক্ষু বুজিয়াছি—"

ব্রাহ্মণ চক্ষু বুজিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুতে ছিলেন,—তিনি দেখিতে পাইলেন, ঐ রুগ্নব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত জানালা গলাইয়া, দূরে নেবুগাছের উপর গিয়া সংস্থিত হইল এবং নেবু ছিঁড়িয়া লইয়া আসিল। যে খাটে ঐ রুগ্নব্যক্তি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে নেবুগাছটি প্রায় দশ বার হাত দূরে অবস্থিত ছিল। এই দুর্দ্দর্শ দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞান লোপ হইল,—মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি তখন উঠিতেও পারেন না, বসিতেও পারেন না। এক একবার তাঁহার বোধ হইতেছিল, তাঁহার

মাথাটা যেন ঝুঁকিয়া ঐ রুগ্ন ব্যক্তির খাটের পায়ার উপর পড়িবার উপক্রম হইতেছে।

তখন সেই রুগ্ন গৃহস্বামী বলিলেন, "মহাশয়! এখন বোধ হয় আমাকে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি আপনাদের কথায় জীবিত নাই—অর্থাৎ আমি দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। ঐ খাটের উপরে আমার দেহ নাই—বিছানা শূন্য। ঐ নেবুতলায় আমার দেহের কঙ্কালগুলি এখনও রক্তমাখা অবস্থায় পড়িয়াছে। আমি আজি ছয়দিন হইল পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাদের আর কেহ নাই—সব মরিয়া চলিয়া গিয়াছে, কেবল আমি আছি। আমার যাইবার উপায় নাই, পার্থিব বাঁধনে বাঁধা আছি। অদ্য আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। নতুবা কতদিন যে আমাকে এই স্থানে যন্ত্রণার বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিয়া অবস্থান করিতে হইত, তাহা বলা যায় না। আপনার কোন ভয় নাই,—আপনি আমার একটা কথা শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। এই ঘরের পূর্ব্বদিকের কোণে একটা ঘটী পোঁতা আছে, তাহার মধ্যে টাকা আছে,—আপনি তুলিয়া লইবেন, ঐ টাকার জন্য আমার যাওয়া হয় নাই।"

মুহূর্ত্তে সমস্ত নীরব। শয্যা, গৃহস্বামী শূন্য গৃহ, আলোক শূন্য। সেদিন কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি—বাহির হইতে চাঁদের আলো আসিয়া সমস্ত গৃহখানি আলোকিত করিয়াছে। জনশূন্য সমস্ত বাড়ীখানা একটা হতাশ শোকের উদাস-কাহিনী বুকে করিয়া হা হা করিতেছিল। পথিক ব্রাহ্মণ নিতান্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন,—তাই অতি কষ্টে নিজের ব্যাগটী হাতে করিয়া ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে অনতিদূরবর্ত্তী এক কর্ম্মকারগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভয়-চকিতস্বরে গৃহস্বামীকে চিৎকার করিয়া ডাকিলেন। সেখানে দাঁড়াইতেও তাঁহার

সাহস হইতেছিল না,—কি জানি এ গ্রামের বা সমস্ত মানুষগুলা মরিয়া ভূত হইয়া থাকিবে! কিন্তু সত্বরেই তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল। যথার্থই একজন জীবিত মানুষ একটা আলো লইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল এবং তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, ভীত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"এক্ষণে কিছু বলিবার শক্তি আমার নাই, একটু বিশ্রাম না করিয়া কিছু বলিতে পারিব না, আমার হৃৎপিণ্ডটা বড় দ্রুত কাঁপিতেছে।" আলোকহস্তে ব্যক্তি তখন ব্রাহ্মণকে যত্ন পূর্ব্বক লইয়া গিয়া একটা গৃহের বারেণ্ডায় উপবেশন করাইল; সেখানে আরও দুই চারিজন লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। ইহার অনেকক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ একটু সুস্থ হইয়া প্রাগুক্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া সকলে এক বাক্যে বলিল "হাঁ মহাশয়! ঐ বাড়ীর সমস্ত লোকগুলি মরিয়া গিয়াছে। আপনি যে, এরূপ বিভীষিকা দর্শনেও জীবন্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার জোর কপালের কথা বলিতে হইবে।"

ব্রাহ্মণ সে রাত্রে আর কিছুই আহার করিলেন না। একাও একস্থানে থাকিতে পারিলেন না—তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া সেই গৃহস্বামী বহির্ব্বাটীর গৃহে তাঁহার নিকটে শয়ন করিয়া থাকিল, তথাপি সারা রাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের চক্ষুতে একবারও একটু নিদ্রার আবেশ হয় নাই।

প্রভাতের আলোক-রশ্মি দর্শন করিয়া তবে ব্রাহ্মণের চিত্তে একটু সোয়াস্তি হইয়াছিল। শেষে ঐ কর্ম্মকারের সবিশেষ প্ররোচনায় ব্রাহ্মণ ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রেত কথিত গুপ্তধনের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। যথার্থ তিনি এক ঘটী টাকা তথায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। ব্রাহ্মণ ঐ টাকাগুলির কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন?

গুরু। টাকাগুলি তিনি কি করিয়াছিলেন, কর্ম্মকারকে কত অংশ দিয়াছিলেন বা নিজে কত অংশ লইয়াছিলেন,—অথবা গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ পাই নাই। এই ঘটনাটি যাঁহার নিকটে শ্রুত হই, তিনি একজন গণ্য ও পদস্থ ব্যক্তি। তিনি গদখালির কোন একজন ভদ্রলোকের নিকটে শ্রুত হয়েন। "গদখালির হাত" এখনও জনশ্রুতিরূপে তদ্দেশীয় লোকের মুখে মুখে আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাদ্রী ভূত।

কতকাংশে ঐরূপ আর দুইটী ঘটনা তোমাকে শুনাইতেছি। সে দুইটাই ইউরোপের ঘটনা। তবে তাহার স্থান বা সকলগুলি লোকের নাম আমার ঠিক স্মরণ নাই,—স্মরণ নাই বলিয়া কোনটিরই নামের উল্লেখ করিব না। ঘটনার স্থূল মর্ম্ম বলিব। কলিকাতার প্রধান ধনী ও স্বধর্ম্মনিরত বাবু রামানন্দ পাল মহাশয়ের বাটীতে একদিন সান্ধ্য সমিতিতে ঐ সমিতির বক্তা সুপণ্ডিত পরমযোগী শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত বি, এল মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গমন করি, এবং সেখানে তাঁহারই মুখে গল্প দুইটী শ্রুত হইয়াছিলাম। সম্ভবতঃ তিনি কোন প্রখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থ হইতেই ঐ গল্প দুইটী বলিয়াছিলেন। আমার যেন স্মরণ হইতেছে,—"আদার সাইড অব্ ডেথ" নামক পুস্তক হইতে গল্প দুইটী সঙ্কলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সে বিষয়ে যখন ঠিক স্মরণ নাই, তখন তাহা নির্দ্দেশ করিতেও পারিব না। গল্প দুইটী কিন্তু নিশ্চয়ই সত্য ঘটনা। ঘটনাটা এই,—

পাশ্চাত্য প্রদেশের কোন নগরে একজন পাদ্রী বাস করিতেন। তিনি ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে অতি নির্ম্মল ও পুণ্যচেতা ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি শিকারে যাইবেন, সমস্ত প্রস্তুত—তিনিও সাজিয়া গুজিয়া বন্দুক হস্তে বাহিরের অলিন্দায় পা দিয়াছেন, এমন সময়ে সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া একটি স্ত্রীলোক আসিয়া পাদ্রীসাহেবের হাতে একখানা কাগজ প্রদান করিলেন। পাদ্রী তখন শিকার-গমনোন্মুখ আনন্দ-তাড়িত হৃদয়, উদাস-উচ্ছ্বাসে হৃদয় পূর্ণ। তিনি তাড়াতাড়ি ঐ কাগজখানির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন।

কৃষ্ণ পরিচ্ছদাবৃত রমণী কোন ভদ্রবংশের কামিনী। যৌবনের অদম্য উচ্ছ্বাসে, বৃত্তির পাপময় প্রবল উত্তেজনায় পাপকার্য্য করিয়া এখন অনুতপ্তা,—তাই পাদ্রীর নিকটে প্রায়শ্চিত্তের প্রার্থিনী। পাদ্রী তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন এবং শিকার হইতে সমাগত হইয়া সময়ে তাঁহার কার্য্য করিবেন বলিয়া রমণীদত্ত ঐ কাগজখানি একখানা পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া কেহ না দেখিতে পায়, এই জন্য অলিন্দার চোরাকুলঙ্গীর মধ্যে পুস্তক সহ ঐ কাগজ রাখিয়া তৎ-সম্মুখভাগ আঁটিয়া দিয়া দ্রুতপদে শিকারার্থ বহির্গত হইয়া গেলেন।

শিকারে গিয়া সেই স্থানেই পাদ্রীসাহেবের মৃত্যু হইয়াছিল। তৎপরে পাদ্রীসাহেবের বাড়ীখানি তাঁহার এক আত্মীয় বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ঐ বাড়ী কোন ভদ্রমহিলা ক্রয় করেন এবং সমস্ত বাড়ীখানি উত্তমরূপে মেরামতাদি করিয়া তাহাতে বসবাস করিতে থাকেন। পাদ্রীর শিকারে যাইবার দিন হইতে আর এই সকল ঘটনা ঘটিতে বহুদিন অতীতের বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।

একদিন ঐ বাড়ীতে এক সান্ধ্য-ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। অনেক লোক নিমন্ত্রিত ও আগত হইয়াছিলেন। ঐ বাড়ীর অধিস্বামিনীর

পরিচিত একটি ভদ্রলোক কিয়ৎক্ষণ অগ্রেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া যে মহল্লায় উপস্থিত হইলেন, সে মহল্লায় তখন বড় অধিক লোক ছিল না।—দুই একজন ভৃত্যমাত্র এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। আর সকলে যে মহলে আহারাদির বন্দোবস্ত ছিল, সেই মহলেই কার্য্যাদিতে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। সমাগত ভদ্রলোকটী আসিয়াই পাঠাগারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, ঐ গৃহের টেবিলের ধারে একজন পাদ্রী বসিয়া কোন পুস্তক পাঠ করিতেছেন। পুস্তক পাঠে তিনি অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক পাদ্রীকে কিছুতেই চিনিতে পারিলেন না। পাদ্রী-সাহেব একবার সেই ভদ্রলোকটীর প্রতি চাহিয়াছিলেন,—তাঁহার দৃষ্টি এতই তীব্রোজ্জ্বল যে তাহাতে ভদ্রলোকটীর হৃদয়ের আমূল পর্য্যন্ত যেন একবার আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতার বিরুদ্ধ, সুতরাং আর কোন কথা না বলিয়া যে মহল্লায় সকলে আহারাদির উদ্যোগ করিতেছিলেন, তিনি তথায় গিয়া গৃহস্বামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! তোমার পাঠাগারের টেবিলে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত পাদ্রী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন দেখিয়া আসিলাম,--কিন্তু তাঁহাকে আমি কিছুতেই চিনিতে পারিলাম না; তাঁহার চক্ষুর যেরূপ তীব্রোজ্জ্বল চাহনি, তাহাতে তাঁহাকে অনন্যসাধারণ লোক বলিয়াই বোধ হইল.—ঐ ব্যক্তি কে?

গৃহাধিস্বামিনী চমক চকিত-চাহনীতে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ পাদ্রী কি তোমাকেও দর্শন দান করিয়াছেন? উঁনি ত আর কাহাকেও দর্শন দেন না। তবে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই দর্শন দিয়া থাকেন। তিনি জীবিত ব্যক্তি নহেন,—পরলোকগত

আত্মিক। তুমি এক কাজ করিতে পার; উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, উঁনি কে; এবং কেনই বা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আগমন করেন?"

ভূতের নাম শুনিয়া ভদ্রলোকটির হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু লেডীর অনুরোধ না শুনিলে নিতান্ত কাপুরুষ হইতে হইবে। সুন্দরী স্ত্রীলোকের নিকট হেয় হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু ভাল, এই স্থির করিয়া ঐ ভদ্র ব্যক্তি পাদ্রীর আত্মিক তনুর নিকটে গমন করিলেন। একা যাইতে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল, তাই আর একজন সাহসী ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, নিজে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন;—তখনও পাদ্রীসাহেব সেইভাবে সেইখানে বসিয়া ছিলেন।

স্খলিতপদে গৃহ-প্রবেশপূর্ব্বক অন্তিম সাহসে ভর করিয়া ভদ্রলোকটি রুদ্ধশ্বাস চাপিয়া বলিলেন, "আপনি কে মহাশয়? আপনাকে দর্শন করিয়া আমাদের এ পৃথিবীর লোক বলিয়া বোধ হয় না। আপনি কি জন্য প্রায়ই এ বাড়ীতে আগমন করিয়া থাকেন?"

পাদ্রী সাহেব ফিরিয়া বসিয়া প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, "তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক। আমি বহুকাল ধরিয়া এই বাড়ীতে আসা যাওয়া করিতেছি, আমাকে কিছু শুধাইবে বলিয়া কতলোককে দর্শন দান করিতেছি, কিন্তু কেহই কোন দিন আমাকে কোন কথা শুধায় নাই। কাজেই আমারও যন্ত্রণার অবসান হয় নাই। আজি যে তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতে বোধ হইতেছে—আমার কর্ম্মভোগ শেষ হইয়া আসিয়াছে।

এই বাড়ী আমারই ছিল। বহুদিন হইল আমার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একটি সামান্য জিনিষের প্রবলাকর্ষণে আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া

যাইতে পারিতেছি না। ঐ জিনিষটী একখানি কাগজ। উহা আমাকে —নং ষ্ট্রীটের অমুক স্ত্রীলোক প্রদান করিয়াছেন। আমি চারি নম্বর মহলের দক্ষিণদুয়ারী কামরার অলিন্দার চোরকুলঙ্গীতে উহা একখানা পুস্তকের মধ্যে পূরিয়া আট্‌কাইয়া রাখিয়া শিকার করিতে গমন করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইখানেই আমার মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুকালেও উহার কথা আমি ভুলিতে পারি নাই, কাগজখানি ঐ স্থলে রাখিয়া মরিলাম, যদি কেহ দেখে, তবে বড়ই অন্যায় হইবে—ভাবিতে ভাবিতে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ কাগজই আমার কাল হইল,—আমি এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া উহার আকর্ষণে আকৃষ্ট ও পৃথিবীতলে আবদ্ধ থাকিয়া বহু যাতনা ভোগ করিতেছি। এই বাড়ীর অধিস্বামিনী অলিন্দায় যে কৌশলময় কুলঙ্গী আছে, তাহা না জানিতে পারিয়া গৃহ-সংস্কার সময়ে উহাতে চূণ-বালির কাজ করিয়া দেওয়ালের সঙ্গে সমান করিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু উহার এক স্থলে ফাট ধরিয়া আছে। তুমি এখনই তথায় গমন পূর্ব্বক শাবল দিয়া খুঁড়িয়া ফেল, তাহা হইলে ঐ পুস্তক প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমার অনুরোধ—কদাচ উহা খুলিয়া দেখিও না! পুস্তকখানি সহ তখনই অগ্নি-দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে আমি উদ্ধার হইতে পারিব।”

ভদ্রব্যক্তি তদ্দণ্ডেই সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গৃহস্বামিনীকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রণবিজয়ী বীরের ন্যায় সমস্ত দেহটা ফুলাইয়া আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। গৃহস্বামিনী তখনই ঐ দেওয়াল ভাঙ্গিতে অনুমতি করিলেন। ভদ্রলোকটী দেওয়াল ভাঙ্গিয়া কুলঙ্গী প্রাপ্ত হইলেন; এবং কুলঙ্গীর ইষ্টকাদি সরাইতে আত্মিককথিত পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন। সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গও এই সকল ঘটনা অবগত হইয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তখন সেই ভদ্রলোকটি আত্মিকের অনুমতি অনুসারে

কাগজসহ পুস্তকখানি নিজে খুলিয়া না দেখিয়া বা কাহাকেও দেখিতে না দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করতঃ ভস্মাবশেষে পরিণত করিলেন।

তৎপরে সেই বাটীর অধিস্বামিনী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই পাতকানুতপ্তা কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে আর পাদ্রী সাহেবের আত্মিক-তনুকে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই।

গল্পটা অবশ্য আমি একবার মাত্র শুনিয়াছিলাম, ইহাতে কোন কোন স্থলে যদিও একটু রূপান্তরিত হইবার সম্ভব, কিন্তু মূল ঘটনার যে সামঞ্জস্য ও যথাযথ বর্ণনা আছে, তাহাতে ভরসা করিতে পারি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

ভূতের সভা।

এই গল্পটিও পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত স্থানে পূর্ণবাবুর নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। সুতরাং পূর্ব্বপরিচ্ছেদের গল্পটি সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছি, এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্যও তাহাই।

পৌষমাস; রাত্রি প্রহরাতীত,—আমাদের দেশের ধারণার অতীত, কল্পনার বহির্ভূত দারুণ শীত! তুষার পড়িয়া সর্ব্বত্র যেন শ্বেত মরকতের বসনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। পথে লোক জনের গমনাগমন রহিত। আগামী কল্য খৃষ্টম্যাস্‌ডে—ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোৎসব।

একজন যুবক এই রাত্রে কি একটা কার্য্যের জন্য বাহিরে যাইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু বরফে যদি পা অসাড় হয়, তবে হাটিয়া যাওয়া বা

আসা অসম্ভব হইবে, এই বিবেচনায় আস্তাবল হইতে একটা অশ্ব লইলেন কিন্তু তাহাতে আরোহণ না করিয়া অশ্ব-বল্গা ধারণ পূর্ব্বক হাটিয়াই গমন করিলেন। নিজ গন্তব্য স্থানে গমন পূর্ব্বক কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, ফিরিয়া আসিতে রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছিল। তিনি আসিতে আসিতে শুনিতে পাইলেন, অতি পুরাতন, অসংস্কৃত এবং পরিত্যক্ত একটা গির্জ্জার মধ্য হইতে উপাসনার সময়ে যেরূপ ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে, সেইরূপ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। তাহাতে ঐ বালক অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই গির্জ্জার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন, জীর্ণ-দীর্ণ ভজনালয়টি অতি পরিপাটীরূপে সংস্কৃত করা হইয়াছে, এবং কক্ষাভ্যন্তর হইতে আলোক-রশ্মিসমূহ নির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে যুবক ভাবিলেন, বাঃ! এই ভগ্ন পরিত্যক্ত ভজনালয় এরূপভাবে কবে সুসংস্কৃত করা হইল! আমি ত বৈকালেও এই পথ দিয়া যাতায়াত করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ ত দেখি নাই। আবার ভাবিলেন, হয় ত আমি তত লক্ষ্য করি নাই। যাহা হউক, একবার উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া বহির্দ্দেশে অশ্বকে বাঁধিয়া রাখিয়া সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উপাসনার উপযোগী পরিচ্ছদাদি পরিহিত হইয়া অনেকগুলি মানুষ সভা করিয়া বসিয়া আছেন এবং একজন পাদ্রী আসনোপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অতি সূক্ষ্ম রুটির টুকরা প্রদানোদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু সভাস্থ কেহই তাহার প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ স্বরূপ সেই দ্রব্য লইতে অগ্রসর হইতেছে না। ইহাতে ঐ যুবক অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কেন না, পাদ্রীপ্রদত্ত ঐ জিনিষ খৃষ্টিয়ানদিগের নিকট অতি পবিত্র পদার্থ। তখন যুবক বলিলেন, "মহাশয়! আমি উহা খ্রীষ্টম্যাস্‌ডের প্রাতঃকালে লইব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সভাস্থ

কেহই যখন উহা লইতেছেন না,—তখন যদি দয়া হয়, তবে আমাকেই প্রদান করুন।"

তখন সেই পাদ্রী রেলিংয়ের অতি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হে ভদ্র যুবক! ইহা তুমি গ্রহণ কর।"

যুবক নতজানু হইয়া রেলিংয়ের নিকটে উপবেশন করিলে, পাদ্রী তাহার হস্তে ঐ দ্রব্য প্রদান করিয়া প্রশান্ত-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, ভদ্র যুবক! এমনই একদিন রাত্রে— এইরূপেই চাঁদের আলোর কোলে বরফ পড়িয়া রাস্তাঘাট সব জমাট পাকাইয়া উঠিয়াছিল—আমার একজন নমস্য ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। তিনি কি বলিবেন বলিয়া আমাকে ডাকিয়াছিলেন, আমি যাই নাই। তৎপর দিবস শুনিলাম তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমার প্রাণে এমন একটা আঘাত লাগিয়াছিল, যাহাতে আমি আমার পার্থিব জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে অব্যাহতি পাই নাই। সেই অনুতাপে আমাকে এই পৃথিবীতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আর যাবার উপায় নাই,—আজি তিনশত বৎসর আমি এখানে অবস্থান করিতেছি। কথাটা বলিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইব, কিন্তু কাহাকেও পাই নাই, আজি তোমাকে পাইয়াছি। এক্ষণে আমার কার্য্য সমাধা হইয়াছে,—তবে বিদায়! মুহূর্ত্তমাত্রে সমস্ত আলোকমালা নিবিয়া গেল,—সভ্যবৃন্দ অদৃশ্য হইল, পাদ্রীও একখানা ছায়ার মত দিগন্তের কোলে মিশিয়া গেলেন। যুবক ভয়বিকম্পিত হৃদয়ে চন্দ্রালোকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই পুরাতন অসংস্কৃত ভগ্নমন্দির-চত্বরে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। বিছুটীর গাছ ও তৃণগুচ্ছ, সমস্ত বাড়ীতে গজাইয়া আছে।

তখন কম্পিত কলেবরে যুবক বাটীর বাহির হইলেন এবং অশ্ব-বল্গা খুলিয়া লইয়া কোন প্রকারে তাহাতে আরোহণ করতঃ আবাস অভিমুখে

গমন করিয়াছিলেন। তিনিই পর দিবস এই ঘটনা সংবাদ পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বালকভূত।

আমার একজন পদস্থ বন্ধু বালকভূত সম্বন্ধে একটি গল্প করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

আমাদের গ্রামটা নিতান্ত গণ্ড পল্লী। ঐ পল্লীর মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত একটা পথ বহিয়া গিয়াছে। পথটী মাটি দিয়া বাঁধা—বর্ষাকালে কাদা হয়, চারিদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি যেন পথিককে ধরিবার জন্য তাহাদের শাখা প্রশাখা প্রসারণ করিয়া দেয়। বৃষ্টির দিনে ঐ বৃক্ষ-পত্র-সঞ্চিত জলে প্রায়ই কাপড় ভিজাইয়া যাইতে হয়।

গ্রামের মধ্যে দুইটী পাড়া,—এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইতে মধ্যস্থলে খানিকটা স্থান জনশূন্য – বাঁশ বাগান এবং কদাচিৎ দুই একটা আম কাঁঠালের গাছ সেই পথে অবস্থিত। আর একটা বহু পুরাতন গাবগাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দণ্ডায়মান আছে। এই গাবগাছের তলপ্রদেশ দিয়াই ঐ গ্রাম্যরাস্তা গমন করিয়াছে। বহুদিন হইতে জনশ্রুতি আছে যে, ঐ গাবগাছে ভূত আছে। সুতরাং গ্রাম্যলোক সেখান দিয়া একটু সাবধানতার সহিতই গমনাগমন করিত।

আমাদের গ্রামে একজন তান্ত্রিক-সাধক ছিলেন। তিনি শনি মঙ্গলবারে এবং অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে মহানিশায় নদী-কিনারায় গিয়া সাধনাদি করিতেন। নদী-কিনারায় যাইতে হইলে ঐ গাবগাছের নিকট দিয়াই যাইতে হয়।

একদিন কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আপনি কখনও কি ঐ গাবগাছে ভূত দেখিয়াছিলেন? আপনি ত প্রায়ই রাত্রিকালে ঐ পথ দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন।"

তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"হাঁ, একটা বালকভূত ওখানে আছে।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "বালকভূত কি প্রকার? আপনিই বা কি অবস্থায় তাহাকে দর্শন করিয়াছেন?"

তিনি বলিলেন, "বালকভূত অর্থে একটা বালকের সূক্ষ্ম দেহ হইতে পারে। কিন্তু সে যখন মানবের জড় চক্ষুর দর্শনীয় হয়, তখন অবশ্যই তাহার পার্থিব জীবনের দেহ ধারণ করিয়াই দেখা দিয়া থাকে।"

আ। তারপরে কি প্রকারে তাহাকে দেখিতে পাইলেন?

তা। প্রায়ই সে আমার সম্মুখে পড়িয়া থাকে।

আ। ও মা! সে কি? কি প্রকার অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পান?

তা। পথের ধারে যেন একটী আট নয় বৎসরের ছেলে দাঁড়াইয়া থাকে, আমার পায়ের শব্দ পাইলেই অতি দ্রুত ছুটিয়া দৌড় মারে।

আ। আপনি কোন দিন তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?

তা। জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাই নাই,—সে সাড়া পাইলেই ছুটিয়া দৌড় মারে।

আ। উদ্ধার হইবার আশাও কি সে করে না?

তা। তাহার সহিত ত আমার কুটুম্বিতা নাই যে, বসিয়া বসিয়া সমস্ত কথা আমাকে বলিবে।

এই কথা আমি আমার এক বন্ধুর সহিত গল্প করায় তিনি আদৌ বিশ্বাস করিলেন না। তখন ঐ তান্ত্রিক আমাদিগকে দুই তিন দিন রাত্রে তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। আমরা ভূত দেখিব, এই আশাতেই উপর্য্যুপরি তিন চারি দিন তাঁহার সঙ্গে ঐ পথে গমন করিতে

লাগিলাম। একদিন যথার্থই ঐ বালকভূত দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পাই নাই;-- বাস্তবিকই সে দর্শন দিয়াই ছুটিয়া দৌড় মারিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ভূতের ঔষধ।

"আয়ুর্ব্বেদার্থচন্দ্রিকা" নামক সুপ্রকাণ্ড এবং উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদ অভিধান পুস্তকের প্রণেতা, সুপণ্ডিত ও অধ্যবসায়শীল কবিরাজ ভাজনঘাটনিবাসী বাবু শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত মহাশয় নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত ঘটনার গল্প করিয়াছিলেন;—

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক একটি পুত্রের তরুণ রক্তামাশয় পীড়া হয়, এবং তাহার চিকিৎসার্থ আমাকে আহ্বান করেন। আমি চারি পাঁচ দিন তাহাকে চিকিৎসা করিতে তথায় গমন করি, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও রোগের কোন প্রকার উপশম করিতে পারিলাম না,—অনেক দিন পরে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহার সাত আট দিন পরে আবার ঐ গৃহস্থের একটি পঞ্চম-বর্ষীয়া কন্যার ঐ তরুণ আমাশয় রোগ প্রকাশ পায় এবং তাহার চিকিৎসার জন্য পুনরায় আমাকে আহ্বান করেন। আমি সেবারেও তিন চারি দিন সেখানে যাতায়াত ও বিশেষ যত্নের সহিত বালিকার চিকিৎসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বিশেষ কোন ফল করিয়া উঠিতে পারিলাম না। রোগের কোন প্রকার উপশম হয় না, বরং নূতন নূতন দুই একটা উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন শেষ দিন সেখানে গিয়া ঐ অবস্থা পরি-

দর্শন করতঃ আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ ভীত হইলাম। কারণ, এই কয়দিন পূর্ব্বে এই রোগে আমারই চিকিৎসাধীনে থাকিয়া ভদ্রলোকের ছেলেটি মারা গেল, আবার মেয়েটিরও ত অবস্থা ভাল নহে; এতদবস্থায় গৃহস্থকে অন্য চিকিৎসক ডাকিতে বলাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমি গৃহস্থকে অন্য আর একজন চিকিৎসককে আহ্বান করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যাহা হয় আপনিই করুন।"

সে দিন তাঁহাদের অনুরোধে আমাকে মধ্যাহ্নে সেই স্থানেই স্নানাহার করিতে হইল। আমি আহারাদি করিয়া বিশ্রামার্থ তাঁহাদের বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া আছি, বেলা তখন দ্বিপ্রহর—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই সময় আমার সহিস আসিয়া বলিল, "বাবু আমি খাইতে গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখি, ঘোড়াটা দড়ি ছিঁড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। "আমি তাহাকে শীঘ্র দেখিতে আদেশ করিলাম এবং বলিয়া দিলাম, ভাজনঘাট যাইবার পথের দিকে দেখিতে দেখিতে যা; কেন না, যাইতে হইলে গ্রামাভিমুখে যাইবার সম্ভাবনা"। সহিস চলিয়া গেল।

অন্য গ্রামে আমার দুইটী তরুণ রোগাক্রান্ত রোগী ছিল, পূর্ব্বাহ্নেই তাহাদিগকে দেখিতে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু এখানকার অনুরোধে যাওয়া হয় নাই,—তবে এখন না গেলেই নয়। ঘোড়া যদি না পাওয়া যায়, তবে কেমন করিয়া যাইব,—এই ভাবনায় একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কেবল সহিসের অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া সে যে দিকে গিয়াছে, তদ্বিপরীত দিকে অশ্বানুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পড়িলাম,—দেখিলাম দূর হইতে ঘোড়াটা গ্রামাভিমুখে আসিতেছে, কিন্তু অশ্বের গতি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কে তাহাকে খেদাইয়া গ্রামাভিমুখে লইয়া আসিতেছে,

কেন না, ঘোড়াটা এদিক্ ওদিক্ যাইবার চেষ্টা করিতেছে, আবার যেন তাহাকে কে গ্রামের দিকে বাগাইয়া তাড়াইতেছে। ক্রমে অশ্ব আমার নিকটবর্ত্তী হইল,—কিন্তু কোন লোক দেখিতে পাইলাম না। এখনও ঘোড়াটা একবার অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা করিল, আর সেই দিক হইতে কে যেন ঘোড়াটার সম্মুখে গিয়া তাড়া দিল, ঘোড়া ফিরিয়া আবার আসিতে লাগিল, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ঘোড়াকে ধরিয়া ফেলিলাম। কোথাও কিছু নাই, সহসা মনুষ্যকণ্ঠ-স্বর উত্থিত হইল—স্বর যেন অল্প-বয়স্ক বালকের কণ্ঠ বিনিঃসৃত এবং পরিচিত। বলিল "কবিরাজ মহাশয়, আশ্চর্য্য হইতেছেন? আমি বিপিন। আপনার ঘোড়াটা চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া এবং চলিয়া গেলে আপনার কষ্ট হইবে ভাবিয়া, উহাকে তাড়াইয়া আনিয়াছি। আপনি এই রৌদ্রে ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন?"

আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কোথাও জন মানব নাই, কেবল নিদাঘ রৌদ্রোত্তাপিত বায়ুপ্রবাহ স্বন্ স্বন্ করিয়া সেই দিগন্তবিস্তারী প্রান্তর বহিয়া যাইতেছিল। কোথাও কোন মূর্ত্তি নাই,—কে কথা কহিতেছিল? কে বিপিন, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ভয়ে বিস্ময়ে সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতে আরম্ভ করিল।

আবার সেই স্বরে কথা কহিল। বলিল,—"কবিরাজ মহাশয়। ভয় করিবেন না। আমি আপনার রোগী বিপিন। আমাকে কয়েক দিন পূর্ব্বে আপনি রক্তামাশায় রোগের জন্য চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঁচাইতে পারেন নাই। আমি আপনাদের হিসাবে মরিয়া গিয়াছি। কিন্তু মানুষ মরে না, দেহ পরিত্যাগ করে। আমার ভগিনী শৈলকে চিকিৎসা করিবার জন্য আবার আসিয়াছেন, কিন্তু রোগের প্রতিকার হইতেছে না, ছেলেমানুষ বড় কষ্ট পাইতেছে। তখন তাহার রোগ-

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখখানা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু কি করিব! আমি ত আর সেরূপভাবে কিছুই করিতে পারিব না! আপনাকে আমি একটা ঔষধের কথা বলিয়া দি, ইহার দুই মাত্রা সেবন করিলেই রোগ আরোগ্য হইবে। * * * পাতার রস ছাগলের দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিবেন।"

কোথাও মানুষ নাই, কোন ছায়ামূর্ত্তিরও আবির্ভাব নাই। কথাগুলা একদমে বহির্গত হইল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ভূতযোনি অনুনাসিক বর্ণে কথা কহিয়া থাকে, তাহা মিথ্যা। বেশ স্বাভাবিক রূপে কথা হইল। সমস্ত কার্য্যেরই কার্য্যারম্ভের পর ভয় কম হয়। ক্রমে আমারও ভয় কম হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিপিন! তুমি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইলে কেন?" উত্তর হইল, "সকলেই হয়, কেবল আমি নহি। তবে ভাল কর্ম্ম করিলে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, আর পৃথিবীর আকর্ষণাকৃষ্ট আত্মিকগণ রহিয়া যায়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মানুষ কি হয়, মরে কেন, মরিয়া কোথায় যায়, মরিবার সময়ে কি হয়, এ সকল আমায় বলিয়া দিবে কি?" উত্তর হইল, এখন সে সময় নহে। আপনাদের সহিত কথা কহিতে হইলে আমাদের কষ্ট হয়। নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়াই আমি এতটা কথা বলিলাম।"

আমি বলিলাম, "বিপিন! তোমার মাতা তোমার শোকে পাগলিনীর ন্যায় হইয়াছেন। একদিন তাঁহাকে দেখা দিবে কি?"

উত্তর হইল, "আমাকে দেখিয়া তাঁহার কি হইবে? কে কাহার?"

আমি বলিলাম, "তোমার কথা শুনিলেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে যে, মানুষ মরিলেই তাহার শেষ হয় না, শোক করা কেন?"

উত্তর হইল, "আগামী পরশ্বঃ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীর উঠানে যে

বাতাবীনেবুর গাছ আছে, আমি তথায় উপবিষ্ট হইব, আপনি ডাকিলে কথা কহিব।"

আমি আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন উত্তর প্রাপ্ত হই নাই। তখন অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হৃদয়ে ঘোড়া লইয়া ঐ গৃহস্থের বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। তখনই প্রেতাত্মাকথিত সেই পত্র সংগ্রহ করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত বালিকাকে সেবন করাইতে বলিয়া আমি সে দিনকার মত বিদায় লইলাম।

যে দিন সন্ধ্যার সময়ে বিপিন কথা কহিবে বলিয়াছিল, আমি সেইদিন বিকালে ঐ গৃহস্থের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম বালিকা অতি সুন্দরভাবে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কোন অসুখ আর তাহার নাই, অত্যন্ত ক্ষুধা ক্ষুধা করিতেছে। তখন তাহাকে পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া, আমি গৃহস্থকে তৎপুত্র বিপিনের ব্যাপার সমস্ত বলিলাম। তিনি শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "আর তাহার কথা শুনিয়া কাজ নাই।" কিন্তু ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, "ভাল কি বলে শুনিব। এ সম্বন্ধে আমি গৃহিণীর মত জানিয়া আসি।" এই বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "গৃহিণী বিপিনের কথা শুনিবার জন্য নিতান্ত অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন।"

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার ধূসর রঙ্গে সমস্ত জগৎ এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা তিমিরাবগুণ্ঠনে স্বীয় মুখ আবৃত করিলে,—অন্ধকারে জগৎ ঢাকিয়া পড়িল। গৃহস্থগণ বাড়ীতে দীপ জ্বালিয়া অন্ধকার বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ না হইতেই গৃহস্বামী আমাকে ডাকিতে আসিলেন। বলিলেন, "আপনি আসুন, গৃহিণী বিপিনের কথা শুনিবার জন্য নিতান্ত

অধীরা উতলা হইয়া পড়িয়াছেন।” আমি বাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া নেবুগাছ আছে কি না সন্ধান করিলাম। দেখিলাম, প্রাঙ্গণের প্রান্ত-দেশে একটী পুষ্পভারাবনত নেবুগাছ আছে। কর্ত্তা ও গৃহিণীকে ডাকিয়া সেই বৃক্ষতলে গিয়া ডাকিলাম, “বিপিন! তুমি কি আসিয়াছ?”—কোন উত্তর পাইলাম না। কর্ত্তা ও গৃহিণী আমার মুখের দিকে চাহিলেন। সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় ডাকিলাম, কিন্তু কোন উত্তর মিলিল না। তখন আমার কথায় অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহস্বামী ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমত সময়ে নেবুগাছের একটা ডাল নড়িয়া উঠিল। বিপিনের কণ্ঠস্বরে কথা হইল,—বলিল, “কবিরাজ মহাশয়! আপনারা আসিয়াছেন?”

আমি বলিলাম “হাঁ, আসিয়াছি। তোমার পিতা এবং মাতাঠাকু-রাণীও আমার সঙ্গে আছেন, দেখিতে পাইতেছ কি?”

সেই স্বরে উত্তর হইল, “হাঁ দেখিতে পাইতেছি বৈ কি! আপনাদের চেয়ে আমাদের দর্শনাদি সমস্ত শক্তিই অধিক। স্থূল হইতে সূক্ষ্মের প্রতাপ অনেক বেশী।”

আমি বলিলাম,—তোমার মাতাঠাকুরাণী তোমার শোকে বড়ই কাতরা হইয়াছেন।”

বিপিনের প্রেতাত্মা বলিল,—“ভুল! ভুল! কে কাহার? কাহার জন্য শোক করেন। সকলকেই আমার মতন হইতে হইবে। আমি ত মরি নাই—আমার জন্য শোক কেন? স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আসিয়াছি।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“তুমি কেমন আছ?”

উত্তর হইল,—ভাল আছি, বিশেষ কোন কষ্ট নাই, তবে ঊর্দ্ধে যাইতেছি না। পার্থিব আকর্ষণ আছে।”

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “সে আকর্ষণ কি?”

উত্তর হইল,—"শৈলের ব্যারাম। তাহার রোগ সারিলেই আমি পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "তুমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দেখা দিয়া যাইতে পারিবে না?"

উত্তর হইল, "না। ইচ্ছা করিলেই আসা ঘটে না। আজ তবে বিদায় হই। আর কথা কহিতে সক্ষম হইতেছি না।"

সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। আমার আরও কতকগুলি কথা ছিল, তাহা বলিবার আগেই বিপিনের আত্মা চলিয়া গিয়াছিল, কাজেই আমার আর তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

শৈল বেশ আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল, বিপিনের কথিত সেই পত্ররস আমি অদ্যাবধিও রক্তামাশয়-রোগীকে ব্যবহার করাইতেছি, ইহা ঐ রোগের উপরে মন্ত্র-শক্তির ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভূতের স্নেহ।

সুধীসমাজে প্রখ্যাত-পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত মিস্ ফেলিসিন্ স্কিন্ ক্যাসেলস্ ম্যাগাজিন নামক কাগজে নিম্নলিখিত ঘটনাটী বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বামী বিদেশে গমন করিয়াছেন,—তদীয় পত্নী কাতরে তাহার হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, "বিদেশে যাইতেছ, সর্ব্বদা পত্র লিখিও। তোমাকে দূরে রাখিয়া যে গৃহে থাকি, সে কেবল নিতান্ত অভাবের জন্যই। তোমার পাঁচ বৎসরের মেয়ে থাকিল, সে তোমার বড় আদরের—তোমায়

না দেখিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু অর্থাভাব সংসারের সকল সুখের বিঘ্ন। যাহা হউক, দুইদিন অন্তর এক একখানা চিঠি লিখিও—তোমার চিঠি পাইতে বিলম্ব হইলে, খালি বুক আরও খালি হইয়া যায়।" সজল নয়নে কন্যার মুখচুম্বন করিয়া গৃহস্বামী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুবতী এত করিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আজ প্রায় দশদিন গত হইল, তিনি বাড়ী হইতে আসিয়াছেন, তথাপি একখানিও পত্র আসিল না কেন? যুবতীর আর সোয়াস্তি নাই,—সে সর্ব্বদাই পত্রের চিন্তায় উদ্বিগ্ন।

নিদাঘ-দাবদাহে তৃষিত ব্যক্তি জল চাহিতেছিল, কিন্তু জলের পরিবর্ত্তে মেঘ হইতে ভীষণ অশনি-সম্পাত হইয়া তাহার বক্ষঃপঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া দিল। যুবতী পতির কুশল-কাহিনী-পূর্ণ পত্রের আশা করিতেছিল, কিন্তু সে কি শুনিতে পাইল? কি পত্র প্রাপ্ত হইল? সমস্ত বুকের রক্ত মথিত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া ত্রাসিত হৃদয়ে, স্তব্ধেন্দ্রিয়ে শুনিল,—তাহার ইহ পরকালের সম্বল স্বামী আর ইহলোকে নাই। সেই স্থানে—সেই বিদেশে তাহার স্বামী জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যুবতী কাঁদিয়া আকুল হইল পাঁচ বৎসরের মেয়েকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। বালিকা মাতার ক্রন্দনের কারণ কিছুই বুঝিল না,—কিছুই জানিল না, কেবল শুনিল, তাহার পিতা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, কিন্তু স্বর্গ কোথায়? সেখানে কি জন্য গিয়াছেন—আর ফিরিয়া আসা হইবে কি না, সে অবোধ বালিকা সে তথ্যের পরিচয় লইল না। সে ভাবিল, তাহার পিতা যেমন এ গ্রামে সে গ্রামে যাতায়াত করিয়া থাকেন,—তদ্রূপ এবারও বুঝি গমন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মাতা সর্ব্বদা কাঁদে কেন? মা আর পূর্ব্বের ন্যায় চুল বাঁধে না, গহনা গায়ে দেয় না, একটিবারও হাসে না,—কেন, তাহার মাতার এমন হইল কেন?

এবার তাহার বাবা বাড়ী আসিলে, মাতার এ সকল কথা তাঁহাকে না বলিয়া সে কিছুতেই ছাড়িবে না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, ঐ বিধবা যুবতী তাহার কন্যাকে লইয়া নিকটস্থ কোন গ্রামের এক আত্মীয় ভবনে গমন করেন। সে দিন আর ফিরিয়া আসা হয় না। সেখানে কন্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

রজনী গভীর—সকলেই সুপ্তি-সুখে অচেতন। সহসা বালিকা শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিল। বাবা এসেছ, বাবা এসেছ বলিয়া শয্যার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল,—স্পষ্ট দেখিল, তাহার পিতা সেই শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। পিতার আদর-সোহাগিনী কন্যা পিতৃ-সন্দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "বাবা, এতদিন বাড়ী এস নাই কেন? তোমার জন্য আমার প্রাণ কেমন করে। স্বর্গ থেকে আমার জন্য পুতুল এনেছ? আমার জামা কাপড় এনেছ ত? কৈ, সে সকল কোথায়? সে সকল কি বাড়ী রেখে, এখানে আমাদের খুঁজতে এসেছ। ওমা;—মা! উঠ না; বাবা এসেছেন।" এই বলিয়া সে অবোধ বালিকা তাহার মাতার গা চাপড়াইতে লাগিল। কিন্তু বালিকার মাতার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তখন বালিকা দেখিল, তাহার পিতা তাহার সহিত কোন কথা না কহিয়াই বরাবর গমন করিয়া অন্য প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালিকা ভাবিল, তাহার পিতা তাহাকে একটিবার কোলেও লইলেন না, একটি কথাও বলিলেন না। বালিকার বড় অভিমান হইল,—সে উপাধানে মুখ লুকাইল! আবার ভাবিল, মা উঠিলেন না,—বাবার বুঝি বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তাই অন্যত্র খেতে গেলেন। বালিকার মন বড় খারাপ হইল, এইরূপে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পর দিন প্রভাতে যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে তাহার

মাতাকে বলিল, "মা কাল রাত্রে বাবা এসেছিলেন। তিনি কিছু খাননি, আমি তোকে কত ডাক্‌লেম, তা তুই কিছুতেই উঠ্‌লিনি। আমাদের এই খাটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষে চলে গেলেন। ঐ ঘরের মধ্যে গিয়াছেন,—তুই চল্। বাবা হয় ত ঐ ঘরে শুয়ে আছেন।"

যুবতীর চক্ষু দিয়া শতধারা অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধদৃষ্টে আকাশ-পানে চাহিয়া যুবতী বলিতে লাগিল, "হৃদয়-সর্ব্বস্ব! স্বর্গে গিয়াও অধিনীদিগকে ভুল নাই। সেই অপরিমেয় ভালবাসা,—এখনও তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? আমি হতভাগিনী দেখিতে পাইলাম না, তুমি কৃপা করিয়া দেখা দিতে আসিয়াছিলে। প্রাণাধিক! আমি কবে গিয়া তোমার সহিত মিলিত হইতে পারিব? তোমার বিরহ আর কত দিন সহ্য করিব?"

বালিকা বলিল,—"চল্ মা! ঐ ঘরে চল্, বাবাকে দেখিয়া আসি। তিনি এসেছেন।"

মাতা কন্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তদীয় মুখ চুম্বন করিয়া বলিল,—"না মা! তোর পিতা আসে নাই। স্বর্গ হইতে মানুষ আর ফিরিয়া আসে না। তিনি আর আসিবেন না।"

"আমি যে কা'ল তাঁকে দেখেছি।"—বালিকা অশ্রু-বিপ্লুত নয়নে এই কথা বলিলে, তাহার মাতা বলিল,—"তিনি তোকে শেষ দেখা দিয়া গিয়াছেন।"

বালিকা তখন বড় ম্লানমুখে হতাশে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে দিন, সে আর ভাল করিলা কাহারও সঙ্গে কথা কহে নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ভূতের গান।

যে—বাবুকে সত্যবাদী লোক বলিয়া আমি বিশ্বাস করি; তিনি বলিয়াছেন,—

আমাদের গ্রামের অপর পারে কু—নামক গ্রাম। ঐ গ্রামের এক ব্রাহ্মণ যুবকের ষোড়শী স্ত্রীকে ভূতে পায়।

ঐ যুবতীকে যে ভূতে পাইয়াছে, প্রথমেই কিছু কেহ তাহা স্থির করিতে পারে নাই; যুবতী-বধূ কখন হাসিত, কখন গান গাহিত, কখন অসম্ভাবিত ও তাহার শিক্ষার অতীত কথা পরিব্যক্ত করিত, কখন কখন মূৰ্চ্ছিত হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় থাকিত। প্রথমে সকলেই তাহার হিষ্টীরিয়া হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন, এবং তদর্থে ডাক্তার ডাকাইয়া আনেন ও চিকিৎসার্থ রোগিনীকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। ডাক্তার যথাসাধ্য তাঁহার শাস্ত্রানুসারে ঔষধাদি প্রয়োগ করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তখন বাটীস্থ স্ত্রীলোকদিগের একান্ত অনুরোধে একজন ভূতুড়ে ওঝাকে ডাকিয়া আনা হয়। অবশ্য সেই রোগিনীর নিকটে তখনও ডাক্তারবাবু উপস্থিত ছিলেন।

ওঝা আসিয়া যথাবিধি চক্রাদি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। বধূটী তাহার উত্তর করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ঐ বধূটী তখন মিডিয়ম্। মিডিয়মের দ্বারা ভূতই সমস্ত বলিতে কহিতে লাগিল।

ওঝা বলিল,—"তুমি কে? কেন এই ভদ্র-কুল-কামিনীতে আবিষ্ট হইয়াছ?"

বধূই উত্তর করিল,—"আমি কা। দূর্ব্বাষ্টমীর দিন এই স্ত্রীলোকটী

অতি প্রত্যুষে ঘাটে নূতন কলসী লইয়া জল আনিতে যান, ইহার দেহ পবিত্র পাইয়া আবিষ্ট হইয়াছি।”

ও। কেন, তুমি কি সদ্গতি প্রাপ্ত হও নাই?

ভূ। না।

ও। কেন?

ভূ। সে কথায় প্রয়োজন নাই—সে এখনও অনেক দিনের কথা।

ও। কোন প্রতিকার হইতে পারে না কি?

ভূ। না,—প্রতিহিংসা বিষে আমার সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত হইতেছে।

ও। কি হইয়াছে বল না।

ভূ। বলিব না।

ও। তবে ইহাকে ছাড়িয়া যাও।

ভূ। যাইব না,—ইহাই প্রতিংসা-সাধনের ক্ষেত্র।

ও। তবে বলিতে হইবে, নতুবা সাজা দিব।

ভূ। বলিতেছি—এই যুবতীর স্বামী আমার জীবিতকালে আমার সঙ্গে অনেক প্রকার শত্রুতা সাধন করিয়াছে, আমি এখনও তাহা ভুলিতে পারি নাই।

ও। এখন সকল লোকেই সে কথা শুনিতে পাইল, তুমি চলিয়া যাও।

ভূ। কোথায়?

ও। যেখানে তোমার ইচ্ছা।

ভূ। যাইব না—বেশ আছি।

ও। আমি সরিষাবাণ মারিব।

ভূ। তবে যাইতেছি।

ও। শীঘ্র যাও, নতুবা জুতার মালা গলায় পরাইব।

ভূ। না—না—না, আমি যাইতেছি। আমি ব্রাহ্মণ—অমন কাজ করিও না।

এই সময় একজন ওঝাকে বলিল, "মহাশয়, কা—জীবিতকালে অতি সুন্দর গান গাহিতে পারিত। তন্মধ্যে একটি গান অতি সুন্দর ভাবেই গাহিত; সেই গানটিকে সে "সাধের গান" বলিত। যদি সেই গানটি, সে তাহার জীবিতকালের সুরে সেইরূপ ভাবে গাহিতে পারে,—তবে আমরা ঠিক এই ভৌতিককাণ্ড বিশ্বাস করিব।"

তাহাতে ওঝা উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই সে গান গাওয়াইতে পারিব। তবে আপাততঃ গান গাহিবেন—আপনাদের বধূ, যদি তাহাতে কোন আপত্তি না থাকে, তবে বলিতে পারি।"

তখন অপরাপর লোকদিগকে সে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া, কেবল বিশিষ্ট কয়েকজন লোক ও ওঝা থাকিয়া গেলেন। ওঝা বলিলেন,—"তোমার সেই সাধের গানটির কথা মনে আছে কি?"

ভূ। মনে সব আছে,—কিন্তু আমি তাহা বলিতে পারিব না।

ও। তোমার সে পূর্ব্ব সুরে, সেই জীবিতকালের ভাবে, সেই গানটি গাহিতে হইবে।

ভূ। আমি তাহা পারিব না। আমার বড় কষ্ট হয়।

ও। পারিতেই হইবে,—নতুবা সরিষাবাণ মারিব।

"তবে গাহিতেছি" এই কথা বলিয়া ঐ স্ত্রীলোকটি সুর করিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল। যাঁহারা ঐ গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে কা···র মতন অবিকল সুরে ও ঢঙ্গে স্ত্রীলোকটি সেই গানটি গাহিতে লাগিল। সে গানটি এই;—

কেন, যামিনী না যেতে জাগালে না

বেলা হ'ল মরি লাজে,

হের, সরমে জড়িত চরণে কেমনে

চলিব পথের মাঝে।

আলোক-পরশে মরমে মরিয়া,

হের গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,

কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া

কামিনী শিথিল-সাজে।

নিবিয়া বাঁচিল নিশার-প্রদীপ

উষার বাতাস লাগি,

রজনীর শশী গগণের কোণে

লুকায় শরণ মাগি;

পাখীর ডাকে বলে গেল বিভাবরী

বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী,

আমি এ আকুল কবরী আবরি

কেমনে যাইব কাজে।

সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। পরিশেষে ওঝা, ভূতকে এক ঘড়া জল দাঁতে করিয়া ঐ জল ঢালিয়া চলিয়া যাইতে বলিল। তখন স্ত্রীলোকটিই দাঁতে করিয়া এক ঘড়া জল তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া ফেলিয়া দিল এবং ঘোর মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল।

তৎপরে, ওঝার চিকিৎসায় তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

ভূতের বাজনা।

অনেকদিন হইল, কলিকাতার একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম,—কলিকাতা বাগবাজারের একটা বাড়ীতে যাত্রার তালিম হইত। গ্রীষ্মকাল, গ্রীষ্মাতিশয্য জন্য সন্ধ্যার পরে সকলে খোলাছাতের উপরে উঠিয়া গান বাজনার তালিম দিত। দলস্থ সকলেই দেখিত, প্রত্যহ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক, ছাতের আলিসার উপরে বসিয়া গান-বাজনা শুনিত; কিন্তু কেহই কখনও তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিত না। এ ভাবিত উহার লোক, ও ভাবিত তাহার লোক। অনেক লোকের সমাগম, কাজেই সকলেই ভাবিত, ইহার মধ্যে কোন একজন লোকের সহিত ঐ লোকটি আসিয়া গান বাজনা শ্রবণ করিয়া থাকে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকটি কাহারও সহিত বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করে না, যতক্ষণ গান-বাজনা হয়, ততক্ষণ একবার নড়িয়াও বসে না। মাছিটি নড়ে, তবুও সে ব্যক্তি নড়ে না। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদা একটি ভাল খেয়ালি আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। দলস্থ অনেকের অনুরোধে তিনি গান করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু যে বাদ্যকর যাত্রার গান বাজাইত, তাহার দ্বারা ঐ ওস্তাদের গানের সঙ্গে সঙ্গত হইল না। ইহাতে সকলেই দুঃখিত হইল, কেন না—বাজনা অভাবে এমন ওস্তাদের গান শুনা হইল না। তখন যে বাজাইতেছিল, সে বাদ্য যন্ত্র নামাইয়া রাখিয়া আর একজন যন্ত্রীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য নামিয়া চলিয়া গেল। তখন বাদ্যযন্ত্রটিকে তফাতে পাইয়া আলিসা

হইতে নামিয়া আসিয়া, সেই ব্যক্তিই যন্ত্র গ্রহণ করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কোন প্রকার কথা কহিল না,—যে তালে গায়ক পূর্ব্বে গাহিতে গাহিতে সঙ্গত ভাল না হওয়ায় থামিয়া পড়িয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি কেবল সেই তালটির বাজনা সেই যন্ত্রে বাদ্য করিতে লাগিল। তাহার বাজনার বোল, পড়ণ লয় প্রভৃতি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হওয়ায় এবং বাদ্য বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া, অনেকেই তাহার পরিচয় জানিবার জন্য তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যক্তি একটি কথাও কহিল না। তখন সকলে বিবেচনা করিল লোকটা বোবা হইবে। যাহা হউক, আর তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বৃথা বিরক্ত না করিয়া গায়ক গান গাহিতে লাগিলেন,—ঐ ব্যক্তি অতি শ্রবণমনোহর বাদ্য বাজাইতে লাগিল, তচ্ছ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইল। পরে গানবাজনা বন্ধ হইয়া গেলে, ঐ দলের অধিকারী দুইজন লোককে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, লোকটা কোন্ বাড়ীতে যায়, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সন্ধান করিয়া দেখ। ঐরূপ গুণী লোক একটা না পাইলে সুবিধা হইতেছে না। লোকটা যখন বোবা তখন অল্প বেতনেই থাকিতে পারিবে।

গান বাজনা বন্ধ হইয়া গেলে ঐ ব্যক্তি নামিয়া চলিল, অন্য দিন কেহ তাহার খোঁজ লইত না, কোন বিষয় লক্ষ্য করিত না, কাজেই সে কখন্ কোথায় যাইত, তাহার কোন প্রকার সন্ধানই হইত না। অদ্য তাহার পশ্চাতে লোক লাগিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, ঐ ব্যক্তি নামিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। ইহাতে অধিকারীর নিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল। কিয়দ্দূর যাইয়া তাহারা দেখিল ;—একটা প্রাচীরের দেয়ালে সে যেন মিশিয়া গেল। বহু অনুসন্ধানেও আর তাহার খোঁজ হইল না। অগত্যা তখন তাহারা ফিরিয়া গিয়া সে কথা তাহাদিগের অধিকারীর নিকট নিবেদন করিল।

তাহা শুনিয়া অধিকারী অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার হেতু সে পাড়ার কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিল, তদুত্তরে এক বৃদ্ধ স্বর্ণকার বলিল, উনি বাড়ুয্যে মহাশয়। আজি প্রায় ত্রিশবৎসর উহার মৃত্যু হইয়াছে। উনি গানবাজনায় অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। কিন্তু কি জন্য উনি অগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন,—ঐ বাড়ীতে উঁহাকে অনেকে দেখিয়াছে। একবার উহার বড় ছেলে, কিসে উহার গতি হইবে, জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছেন,—"আসক্তিই নরক। গান বাজনার উপরে অত্যাসক্তিই আমার দুর্গতির কারণ। বাসনার লয় না হইলে উদ্ধার হইব না। এখনও গান-বাজনার আসক্তি আমার যায় নি।"

অধিকারী সেই দিনই তাহার দল সে বাড়ী হইতে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

ভূতের বোঝা।

স—বাবু গল্প করিলেন,—

তাঁহাদের গ্রামের নিম্ন দিয়া ইচ্ছামতী নদী প্রবাহিতা। কালীতলার ঘাট নামক একটা ঘাটে একখানা অন্ততঃ দশমণ ওজনের প্রস্তর বহুদিন হইতে পড়িয়াছিল। কিন্তু পাথরের এক অতি আশ্চর্য্য ব্যবহার সংঘটিত হইত। পাথরখানা সমস্ত দিন ঐ ঘাটে দেখা যাইত, কিন্তু কোন কোন দিন ঐ পাথর রামরাজার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইত। কে লইয়া যাইত —কে আবার ফিরাইয়া আনিয়া কালীতলার ঘাটে রাখিত, তাহার কোন প্রকার অনুসন্ধানই কেহ করিতে পারিত না। কালীতলার ঘাট হইতে রামরাজার ঘাট প্রায় তিন শত হস্ত দূরে হইবে। লোকে এই ব্যাপারে

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইত, কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া উহা ভৌতিককাণ্ড বলিয়া স্থির করিয়াছিল—এবং পাথরখানিকে লোকে "ভূতের বোঝা" বলিয়া আখ্যা প্রদান করিত। কত জন রাত্রি জাগিয়া প্রস্তরখণ্ডের অদূরে থাকিয়াও কিছুই দেখিতে পায় নাই। সে সকল দিনে আর পাথর কালীতলার ঘাট হইতে বা রামরাজার ঘাট হইতে নড়িত না। সে দিন যেখানকার সেই স্থানেই থাকিত।

আমাদের গ্রামের রা—ঘোষ, প্রাচীন লোক। সে বলিয়াছিল, এক পশ্চিমদেশীয় সাধু এই গ্রামে আসিয়াছিলেন, তিনিই প্রস্তরখানি ঘাটে লইয়া যান এবং ঐ প্রস্তরের উপরে উপবেশন করতঃ তপ-জপ করিতেন। তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হয়,—তদবধি পাথরের ঐরূপ গতিশক্তি হইয়াছে। ইহাতেই সকলে অনুমান করিত, ঐ সাধু ভূত হইয়া এখনও তপ-জপ করেন, এবং পাথরখানাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এ ঘাট হইতে ও ঘাটে লইয়া যান। আজ তিন বৎসর হইল, একজন সাহেব ঐ পাথরখানি নৌকায় করিয়া তুলিয়া লইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ তাঁহার কি কাজে লাগাইয়াছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আবিষ্ট ভূতগ্রাম।

পাপের পরিণাম কি, পার্থিব জীবনে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, কি প্রকারে তাহার ফলভোগ করিতে হয়, যাহারা পাপ কর্ম্ম করে, আত্মিক তনুতে তাহারা কি প্রকার কষ্ট পায়;—জানিতে বাসনা হওয়ায় কোন বিশ্বাসী অধ্যাত্মযোগী একবার চক্র করিয়া পর পর কতকগুলি পার্থিব

জীবনে বিভিন্ন কর্ম্মাবলম্বী আত্মিককে চক্রে আনাইয়া তাহাদিগের কাহিনী শুনিয়াছিলেন। অবশ্য ইহাও এস্থলে আমার বলা কর্ত্তব্য যে তিনি ইহ জীবনের যে ভাবের লোকের সূক্ষ্মাত্মাদিগকে চিন্তা করিয়াছেন, তখন সেইরূপ লোকই আসিয়াছেন। চক্রে শব্দ হইতে আরম্ভ হইলে প্রশ্ন হইল,—"আপনি কে?"

উত্তর হইল,—"আর কেন? নামের গণ্ডী ত আমার বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তোমাদের পৃথিবীর নাম পার্থিব দেহের সঙ্গেই শ্মশানে দগ্ধ হইয়াছে।"

প্র। আপনি পৃথিবী দেহ ত্যাগ করিয়া কেমন আছেন?

উ। "বড় কষ্টে আছি,—আমার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া অগ্নিশিখা বহিতেছে। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। অনুতাপ আগুনে জ্বলিয়া মরিলাম,—পুড়িয়া মরিলাম! হায়! হায়! কি কুক্ষণেই ইন্দ্রিয়পর হইয়াছিলাম, কোন্ অশুভক্ষণে বারাঙ্গনায় মজিয়াছিলাম,—হায়! সেই যন্ত্রণায় এখন প্রাণ যায়। মাতাকে কাঁদাইয়াছি, পিতার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি,—পুত্র-কন্যার মুখ চাহি নাই, সতী স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ হৃদয় পদতলে দলিত করিয়াছি,—সংসারে যাহারা আমার মুখ চাহিয়াছিল,—আমার যাহারা অবশ্য প্রতিপাল্য, তাহাদিগকে অশেষবিধ কষ্ট দিয়াছি। নিজের যাবতীয় সম্পত্তি বারাঙ্গনা-চরণে অর্পণ করিয়াছি,—এখন তাহারই এই ফল, এই বিষময় পরিণাম।"

তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় অবশ্য আর এক প্রকারের কর্ম্মচারী আত্মিককে চক্রে আনিয়া প্রশ্ন করা হইল, "আপনার পার্থিব জীবনের নাম কি?

উত্তর হইল, "আমার নাম ছিল, স—বাবু।"

প্র। আপনি কেমন আছেন?

উ। আমি বড় যাতনায় কালক্ষেপ করিতেছি। অহোরাত্র চারিদিক হইতে চারিটী অগ্নিশিখা বিস্তারিত হইয়া আমাকে বিদগ্ধ করিতেছে। প্রাণ যায় ;—রক্ষা করিবার কেহই নাই। কামের প্ররোচনায় কেন এ পাপ করিলাম ? পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া কেন নিজের সর্ব্বনাশ করিলাম ? এখন সতীর সতীত্ব-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছি। ক্ষমা করিতে কেহ নাই ! কেবল দহন !—আমি পরস্ত্রীগামী, আমার যন্ত্রণা কত দিনে ফুরাইবে —কেমন করিয়া বলিব ?—প্রাণ যায় !

তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় আর একটি আত্মাকে আনান হইল। ঐরূপে তাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনি কেমন আছেন মহাশয় ?"

উত্তর হইল, "আমি পার্থিব জীবনে স্ত্রীলোক ছিলাম। সেখানে যে মহাপাতক করিয়াছি, এখন তাহার তীব্রবিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। কেহ মুখের কথাও শুধায় না, ফিরিয়াও চাহে না। সর্ব্বদাই অনুতাপের অগ্নি-দহন, সর্ব্বদাই সুতপ্ত লৌহশলাকায় বিদ্ধ হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছি ! হায় ! কেন রমণীর অমূল্যধন সতীত্ব-রত্ন বিক্রয় করিয়াছিলাম ! কেন নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছিলাম ! হা রূপ ! হা নয়ন ! হা হাব-ভাব ! হা যৌবন ! তোরাইত আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্, কেন এ পাপ করিয়াছিলাম। কত রূপের ছটা দেখাইয়াছি, কত সোহাগ-আদরের প্রলোভনে কত লোককে প্রলোভিত করিয়াছি—কত যন্ত্রণা দিয়াছি ; ধন্য অর্থ ! তাহার জন্য না করিয়াছি কি ? যাহার অন্নে যখন দেহ পালন করিয়াছি, তখন তাহারই সর্ব্বনাশ করিয়াছি। নারীজাতির অলঙ্কার দয়ারত্ন বিসর্জ্জন দিয়া কতজনকে পদাঘাতে দূর করিয়াছি, ফাঁকি দিয়া কতজনের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পথে বসাইয়াছি,—তাহারই এই ফল ! উঃ ! প্রাণ যায়। সেই দুষ্কার্য্যের এই

ফল জানিলে কি তখন মহাপাপ করিতাম! আমি বারবনিতা সাজিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছি।”

তাহাকে বিদায় দেওয়া হইল। পুনরায় আর একটি আত্মিককে আহ্বান করায়—চক্র ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কাঁপুনি আর থামে না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি অত কাঁপিতেছেন কেন?”

উ। “যন্ত্রণা—দিবা নিশি কেবল অনল-দহন।”

প্র। আপনার এত অনল যন্ত্রণা কেন?

উ। “আমি হতভাগিনী কুলবধূ। কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম করি নাই। আমি নষ্টবুদ্ধি, কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ লইয়া ভুলিয়াছিলাম, পবিত্র গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়া পঙ্কিল কূপে ডুবিয়াছিলাম, দেবতার অনাদর করিয়া অসুরের পূজা করিয়াছিলাম, আমার শাস্তির এখনও হইয়াছে কি? স্বামী কত যত্ন করিতেন, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, আমারই হাতে তৎসমস্ত অর্পণ করিয়া সুখী হইতেন; আমি খাইলে, আমি পরিলেই যেন তিনি কৃতার্থ হইতেন, কিন্তু আমি যৌবনের উচ্ছ্বাসে প্রবৃত্তির উদ্দামে অন্য পুরুষে আসক্ত হইয়াছিলাম। এখন তাহারই এই অনল-দহন। হায়, সে কত দিন হইল,—পার্থিবদেহ প্রায় ছয়শত বৎসর পরিত্যাগ করিয়াছি,—কিন্তু আজিও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না।—দিন নাই, রাত্রি নাই, সদা সর্ব্বদাই হৃদয়-মধ্যে এককালে চৌরাশি নরকের ভীষণ জ্বালা জ্বলিতেছে। আরও কতদিন এ জ্বালা সহ্য করিব, তাহা কে বলিতে পারে?”

তাহাকে বিদায় দিয়া, সে দিনকার মত কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছিল। পুনরায় অন্য আর একদিন চক্র করিয়া আত্মা আনান হয়। প্রথমাবির্ভূত আত্মাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—“আপনার নাম কি?”

উ। “নাম শুনিয়া কি হইবে? আমি চোর। কত জনের সর্ব্বনাশ

করিয়াছি। লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিত, আমি একদিনে তাহা আত্মসাৎ করিতাম। একজনের সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন আমি একদিনে হস্তগত করিয়াছি। কাহাকেও দয়া করি নাই। কত বিধবার জীবিকার একমাত্র সম্বল সবলে হরণ করিয়াছি। কত বালকের অমিয় বচন করুণ রোদন উপেক্ষা করিয়া সবলে তাহার গাত্র হইতে আভরণ হরণ ও পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। তখন ভাবি নাই, এমন চিরদিন থাকিবে না। তখন বুঝি নাই, কার্য্যের ফলাফল ভোগের দিন আছে। তাহা বুঝি নাই বলিয়াই ত আজ আমার এত দুর্দ্দশা। হায়! কেন পাপ করিলাম! এত লোকের চলে, আমার কি চলিত না? কিন্তু হায়! তখন এ বুদ্ধি আসে নাই, তাই এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? হায়! কতদিনে পরিত্রাণ পাইব?

আর একটি আত্মিক আসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কেন শক্তির আবেশ আনিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ? আমি সর্ব্বদাই বড় কষ্টে আছি। আমি পার্থিব জীবনে বড়ই দুর্ম্মুখ ছিলাম। কত জনকে কত মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়াছি, কত জনকে কত বিদ্রূপ—কত শ্লেষ করিয়াছি; তখন বুঝি নাই, কথার এত বিষ! এখন সর্ব্বদাই ভগবানকে ডাকিয়া বলিতেছি,—দয়াময়, আর যাতনা দিও না, আর কথার বিষে দগ্ধ করিও না। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে,—সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলের অবসানের অপেক্ষায় ব্যস্ত।"

ইহার পরে আর একটি আত্মিকের কাহিনী এইরূপ,—"আমি ভ্রমেও কখনও সত্য কথা কহি নাই। অর্থের লোভে কি স্বার্থ সাধনের জন্যত দূরের কথা, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা কহিয়াছি, তাই সর্ব্বদাই আমার জিহ্বা তপ্ত লৌহে দগ্ধ হইতেছে। পুরীষকূপে ডুবিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।"

আর একজন বলিয়া গেলেন,—"হায়। হায়! আমার যাতনা তোমরা বুঝিবে না। আমি স্বার্থের দাস হইয়া, আমার নয়নপুত্তলী কন্যাকে বৃদ্ধার করে অর্পণ করিয়া আজীবন তাহাকে দগ্ধ করিয়াছি। সেই মহাপাতকে এখন দিবারাত্রি গলিত শোণিত-মাংস হ্রদে ডুবিয়াছি।"

অতঃপর আর একটি আত্মিক বলিলেন,—"হায়, কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলাম। কেন সুখ-প্রাপ্তির কামনায় পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। এখন দেখিতেছি, ধর্ম্মতেজ সকলই সমান। তখন বুঝি নাই, তাই এখন এত শাস্তি।"

আর একজন বলিতে লাগিলেন,—"হায় জীবনের এই পরিণাম। আমি বড় অহঙ্কারী ছিলাম, অহঙ্কারে মাটিতে পা দিতাম না, ধরাকে সরা জ্ঞান করিতাম, জগৎ আমার সম্মুখে তৃণতুল্য ছিল, তাহারই বুঝি এই প্রতিশোধ! এখন আমাকেই তৃণ হইতে হইয়াছে। আমার সব শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে।"

ইহার পর আর একজন বলিলেন,—"আমি চিকিৎসক ছিলাম। তুচ্ছ জীবিকার জন্য অনেক লোককে হত্যা করিয়াছি। পসারের জন্য অসাধ্য রোগ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াও প্রকাশ করি নাই। অধিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য রোগীকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। রোগীর সঙ্গে কত ব্যবহারদুষ্ট-কার্য্য করিয়াছি, চিকিৎসা না জানিয়া চিকিৎসক সাজিয়াছি—সর্ব্বনাশ করিয়াছি। জীবন লইয়া যাহাদের সহিত সম্বন্ধ, জীবন রক্ষা যাহাদিগের হাত, আমি সেই চিকিৎসক হইয়া কত জনের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাই আজি এ যন্ত্রণা! হায়! কেন এ দুষ্কার্য্য করিয়াছিলাম? অন্য উপায়ে কি অর্থ উপার্জ্জন হইত না, না হইলেও ক্ষতি ছিল না, এ যন্ত্রণা অপেক্ষা তখন যদি প্রাণ দিতাম, তাহাও যে ভাল ছিল,—হায়! এ পাপের এই শাস্তি।"

আর একটি আত্মিক অতি আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বকৃত

পাতকের শাস্তি পাইতেছি। কত প্রলোভনে কতজনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছি; প্রথমে ভাল কথায় সদ্ব্যবহারে মোহিত করিয়া পরিশেষে তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছি। বিশ্বাসী হইয়া, বিশ্বাস জানাইয়া, সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছি, বক-ধার্ম্মিক সাজিয়া, অসত্যকে সত্যনামে অঙ্কিত করিয়া—সত্যের ধ্বজা উড়াইয়া স্বার্থ সাধন করিয়াছি। বিশ্বাসঘাতক আমি রাংকে রূপা বলিয়া, হেয়কে হেম বলিয়া বিক্রয় করিয়া পরের বহুপরিশ্রমের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছি, আমার এ মহাপাতকের কি পরিত্রাণ আছে, শত জীবন ধারণ করিয়া শত শত বার এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কি করিব, কৃত কর্ম্মফল জনিত ভোগ সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু হায়! আগে একথা কেন ভাবি নাই। পার্থিব জগতে ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, উপদেশ আছে, উপদেষ্টা আছে; কাহারও কথা শুনি নাই কেন? কোন দিকে দৃক্পাত করি নাই কেন? পাপের যে শাস্তি নিশ্চয়,—পূর্ব্বে একথা এক দিনও ভাবি নাই কেন? মুগ্ধ হইয়া মজিয়া মরিয়া ছিলাম কেন? এখন এই জ্বলন্তবাতি বুকে করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি,—জানি না, আরও কত কাল এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।"

আর একটি আত্মিকের কাহিনী এইরূপ,—"আমার শরীর সর্ব্বদাই ক্ষয়ের নিদারুণ দাগা দিতেছে। হায়! আমার এই ক্ষয় নিবারণ করিবার কি কেহ নাই? আগে কত জনাকে দৃষ্টিতে দগ্ধ করিয়াছি, লোকের ভাল সহ্য করিতে পারি নাই। যে দিকে চাহিয়াছি, তাহাই দগ্ধ করিয়াছি,—লোককে কত কষ্ট দিয়াছি, উন্নতির পথে কত বিঘ্ন দিয়াছি, কত কদাচারে—কত অসদুপায়ে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাই আমার এই ক্ষয়ের দাগা! আমি হিংসা প্রবৃত্তির দাস হইয়া হিংসুক নাম কিনিয়া শেষে এই প্রতিফল পাইলাম।"

আর একদিন চক্রে বসিয়া আত্মিক আহ্বান করিলে, চক্র হইতে অতি করুণ-ক্রন্দনের স্বর উত্থিত হইতে লাগিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—"আপনি কে? কাঁদিতেছেন কেন?"

প্রশ্নকারীর কথার প্রত্যুত্তরে আত্মিক বলিলেন,—"আমি হতভাগ্য জীব? আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। পার্থিব জীবনে যে কুকার্য্য করিয়াছি, তাহার পাতকে বড় জ্বলিতেছি।"

এই কথা বলিতে বলিতে আবার করুণ-ক্রন্দনের স্বর উত্থিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত অনুতপ্তভাবে এই কথা বলিতে শুনা গিয়াছিল—

"পিতঃ! পিতঃ! বড়ই কষ্ট দিয়াছি, সময়ে সেবা করি নাই—মান্য করি নাই—গ্রাহ্য করি নাই। তোমার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে কত আঘাত করিয়াছি। পিতঃ, যন্ত্রণা আর কেন দাও? প্রাণ যে যায়! এবার সুপুত্র হইব, পিতৃ আজ্ঞা পালন করিব,—পিতৃচরণ সার করিব। ক্ষমা কর,—পিতঃ ক্ষমা কর। আর যাতনা দিও না—মা! মা!—একটি ফল দাও মা! ক্ষুধায় মরি যে। কত কষ্ট দিয়াছি,—তোমার কুসুম কোমল স্নেহ-বাৎসল্যময় প্রাণে কত ব্যথা দিয়াছি মা! সময়ে পুত্রোচিত কার্য্য করি নাই,—বৃদ্ধ বয়সে প্রতিপালন করি নাই, কত কটূক্তি কহিয়াছি, স্ত্রীর প্ররোচনায়—ক্রোধের বশে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছি। কত গালাগালি দিয়াছি,—সেই পাপের আজ এই শাস্তি! মা! তোমার একবিন্দু ক্ষীর-ধারার ঋণ শতজন্মেও পরিশোধ হয় না, তা এখন জানিতেছি। আগে যদি জানিতাম, তবে কি এ পাপে পুড়ি! কিন্তু মা! মাতার প্রাণ যে স্নেহ-প্রবণ, মাতার শতমুখী স্নেহস্রোত কুপুত্রের প্রতিও ত প্রবাহিত হয়। তবে কেন মা, এ যন্ত্রণা? ক্ষুধায় মরি যে। এ জঠরানল যে নিবৃত্তি হইবার নয়। এ মহাক্ষুধা যে শান্ত হয় না। প্রাণ

যে যায় মা! একবার কৃপা কর। এবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সুপুত্র হইব! আর না, যথেষ্ট ফল লাভ করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা আর কি শাস্তি আছে মা!”

এইরূপ বলিতে বলিতে অনুতাপের ক্রন্দন আরও উচ্চে উঠিল। অতীব মর্ম্মন্তুদ-স্বরে কথিত হইতে লাগিল—

“দয়াময়! অনাথশরণ! পাপীর পরিত্রাতা! রক্ষা কর—রক্ষা কর! জ্বলিয়া গেল, দেহ পুড়িয়া গেল! হৃদয় ভস্ম হইয়া গেল। হায়! হায়! প্রাণ যায়। করযোড়ে বলি,—ক্ষমা কর। আর যাতনা দিও না, তুমিই পিতা, তুমিই মাতা। তুমিই ক্ষমা কর। তুমি বিভা-বসু, তুমি বহ্নি, তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র—আর না, আর না প্রভু; জ্যোতিঃ দ্বারা দগ্ধ করিও না। প্রাণ যায়, দয়াময়! রক্ষা কর। পরিত্রাণ কর। উঃ! যাই যে, আর সহ্য হয় না। রক্ত মাংস পচিয়া গেল, পুড়িয়া গেল, স্মৃতির অনল দংশন গেল না কেন? দেব! জীবন লও,—শত শত বার জীবন লও,—পশুযোনিতে নিক্ষেপ কর,—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না! ক্ষমা কর।”

চক্রস্থিত ব্যক্তিগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তাঁহারা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্র ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গোয়েন্দা ভূত।

ডার্হামের চেষ্টারলী ষ্ট্রীটে ওয়াকার নামক এক কৃষক বাস করিত। তাহার পত্নী-বিয়োগ হইলে কিয়দ্দিবস গৃহ শূন্য থাকে,—তৎপরে এন্

নাম্নী দূর সম্পর্কীয়া এক রমণী আসিয়া তাহার গৃহকর্ত্রীরূপে সংসারে প্রবিষ্ট হয় ও কিছুদিন শান্তির কোলে উভয়ে বস-বাস করিতে থাকে। অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে প্রভু দাসীতে—অযথা বচসা হয়। বচসা অত্যন্ত অধিক হয়। তখন ওয়াকার একান্ত অধৈর্য্য ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ওয়াকারসার্প নামক এক ব্যক্তির সহিত এন্‌কে কোনও কার্য্যোপলক্ষে গমনের ভাণ করিয়া দূরে পাঠাইয়া দিল এবং সার্পকে পরামর্শ দিয়া দিল, "এন্‌কে যেন আমায় আর না দেখিতে হয়।" ইহার পর এন্‌কে আর কখনও কেহ দেখে নাই।

গ্রেহাম নামক একজন ভদ্রলোক ওয়াকারের বাড়ীর প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বাস করিত। প্রাগুক্ত ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে একদা রাত্রিতে গ্রেহাম পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতেছিল, এমন সময় দেখিতে পাইল—একজন স্ত্রীলোক পথ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। গ্রেহাম সে স্থানে ঐ স্ত্রীলোকের দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। তখন রমণী উত্তর করিল,—"গ্রেহাম! আমি এনের প্রেতাত্মা। ওয়াকারের পরামর্শমতে সার্প আমাকে খনিত্রদ্বারা হত্যা করিয়াছে। আমার কঙ্কাল এখনও কয়লার খনিতে প্রোথিত আছে। আর আমায় যখন হত্যা করে তখন যে রুধির-ধারা নির্গত হইয়া তাহার বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিয়াছিল, সেই সকল বস্ত্রাদি ঐ কয়লার খাতের নিকটস্থ সেতুর নিম্নে রাখিয়াছে। তুমি এই হত্যাকাহিনী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে প্রকাশ করিয়া এবং ঐ সকল তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া আমার উপকার কর। প্রতিহিংসা বিষে আমি জ্বলিয়া মরিতেছি।" গ্রেহাম পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলে, কিন্তু প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট ভূতের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহেন না—শেষে নির্দ্দেশিত স্থানদ্বয়ে ঐ সকল দ্রব্যাদি পাইয়া আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করেন। পরে ১৬৩১ খৃষ্টীয়াব্দের

আগষ্ট মাসে ডার্হামের বিচারালয়ে ঐ মোকর্দ্দমার বিচার হয় এবং আসামীদ্বয় দোষ স্বীকার করায় চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভূতের বাড়ী।

চ—বাবু নিজে এক ভৌতিক বিপদে পতিত হয়েন, তিনি নিজেই একথা আমাকে বলেন। কিন্তু যখনকার ঘটনা, তখন ইহা লইয়া সংবাদ পত্রে খুব লেখালেখি চলিয়াছিল।

চ—বাবু বলেন, পল্লীগ্রামে—নিজ পৈতৃক বাসভবনে থাকিয়া নিজ গ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলে মাষ্টারি করিতেছিলাম, আর সংবাদপত্রে বিনা পয়সায় প্রবন্ধ লিখিতাম। সারারাত্রি জাগিয়া ইংরাজী কবিতার পুস্তক পাঠ করিতাম, বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ করিতাম। বিনা পয়সাতেই তাহা কোন কোন মাসিক পত্রে পাঠাইতাম; তাহার কোনটা ছাপা হইত, কোনটা বা ছাপা হইত না। না হউক—আমি লিখিয়া—পাঠাইয়া এবং ক্বচিৎ তাহার এক আধটা ছাপা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। কিন্তু আমার এই পদ্যময় জীবন অধিক দিন যে আর টিকিতে পারে না তাহা মনে মনে যেন অনুভব করিতে লাগিলাম। কেন না, ক্রমেই জীবন গদ্যময় হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আমি যখনই টেনিসখানা কোলের দিকে টানিয়া লইয়া তাহার কবিতার উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছি, আর অমনি গৃহিণী সম্মুখে আসিয়া বিরসবদনে বলিলেন, ওগো! খোকার বড় গা তপ্ত হইয়াছে; নয় ত—শ্যামা ঝী আ'জ আর আসেনি, এক রা'শ বাসন এই রাত্রে কে বা মাজে—কে বা কি করে! আর নয় ত রাখাল

আসিয়া কখন বলিয়া গিয়াছে, তার বুধীগায়ের বাছুরটা সন্ধ্যা অবধি আর পাওয়া যায় নি।—যাক্, সে সকলে তত বিচলিত হইতাম না, জীবনকে প্রাণপণে গদ্য হইতে পদ্যে পরিণত করিয়া রাখিতাম। এক কথায় গদ্যের বিশালোত্তাপ হইতে সারা জীবনটাকে পদ্যের গব্যরসে অভিষিঞ্চিত করিয়া রাখিতাম,—কিন্তু তাহা হইল না। সে দিন মেয়েটী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল—সে দিন নয় ত কি? সে আর ক'দিনকার কথা?—দেখিতে দেখিতে রাক্ষসী মেয়ে দশ বৎসর উত্তীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে,—এখন যে সর্ব্বনাশ! তার যে বিবাহ দিতে হইবে। চারিদিক দিয়া ঘটক আসে—চারিদিকে সম্বন্ধ জোটে—কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! কোথাও যে শো'র কথা শুনিতে পাই না,—কেবল হাজার! হাজার! কোথাও পাঁচ হাজার! কোথাও চারি হাজার! মেরে কেটে কোথাও না হয় তিন হাজার নয়শত নিরানব্বই টাকা পনের আনা তিন পয়সা! হাজার যদি শো হইত, তবে বুঝি আমাকে কবিতা-ফুল-শয্যায় মশার কামড় সহ্য করিতে হইত না।

কিন্তু আর চলে না। বড় জোর না হয়, আর একটা বৎসর বিবাহ না দিয়া রাখা চলিবে, তারপর? তারপর ত ঐ হাজারের হাঁক ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইব না। মনে মনে স্থির করিলাম; অন্য একটা চাকুরির চেষ্টা দেখিতে হইতেছে। গুরুমহাশয় গিরিতে মাসিক যে চত্বারিংশ মুদ্রা উপায় হয়, তাহাতে পেটের ভাত জোটে না—হাজারের হাঁক শুনিব কি করিয়া? এতদর্থে প্রত্যহ খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে চাকুরীখালি খুঁজিতাম। হঠাৎ একদিন দেখিলাম, পশ্চিম বঙ্গের * * * স্থানের রাজাবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী দরকার, মাসিক বেতন আশী টাকা। অভিজ্ঞ বন্ধু-বান্ধবেরা বলিলেন, জমীদারীর চাকুরীতে উপরি রোজকার অনেক। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না,—

ভদ্রলোক কেমন করিয়া গোপনে গোপনে উপরি রোজকার করে। যাই হোক্—দুর্গা বলিয়া একখানা সুপারিস্ সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত আবেদনপত্র লিখিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলাম। পনেরদিনের দিন উত্তর পাইলাম, "অবিলম্বে এখানে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।" চাকুরীপ্রিয় বাঙ্গালীর চাকুরী জুটিল, ইহা হইতে তার আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? গৃহিণীর নিকটে বিদায় চাহিলাম। উন্নতি হইল, টাকা বেশী পাওয়া যাইবে, গৃহিণী এজন্য আনন্দিত হইলেন; কিন্তু আজন্ম অবিরহে কাটাইয়া এখন দূরদেশে পাঠাইতে তাহার আকর্ণাবিশ্রান্ত চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সারারাত্রি দু'জনাতে মিশিয়া বিদেশে যাইবার উপযোগী দ্রব্যগুলি গুছাইয়া গাছাইয়া বাঁধিতে লাগিলাম। আজ ছেলেমেয়েগুলার চোখেও যেন নিদ্রা নাই—তারা ম্লান মুখে কাছের গোড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া প্রবাসগমনের ব্যথা আরও বাড়াইয়া দিতে লাগিল। তার পরে আহারাদি করিয়া শয়ন করা গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আমি গোযানে আরোহণ করিলাম—ছেলে মেয়েরা এবং ছেলে মেয়েদের মাতা ও আমার মাতাঠাকুরাণী একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন,—গোড়োয়ান গাড়ী খুলিয়া চালাইয়া দিল। গাড়ীতে বসিয়া বাড়ীর জন্য,—ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিয়া একখানা পুস্তক খুলিলাম, কিন্তু পড়া হইল না। ছেলেমেয়েদের ভার ভার মুখগুলি ও প্রবাসবাসের অকারণ আশঙ্কা আমার অন্তঃকরণের উপরে অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। আমি যতই তাহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করি, তাহারা সজোরে ততই আমার হৃদয়ে বসিয়া পড়ে।

ক্রমে গোযান গিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। গাড়ী

আসিবার সময় আর অধিক বিলম্ব নাই,—যাত্রিগণ টিকিট ক্রয় করিয়া প্লাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ভিড় পাকাইতেছে। জনকোলাহলের বৈচিত্রপূর্ণ উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমার ভাবনা চিন্তাও ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। আমি টিকিট কিনিয়া আনিয়া প্রস্তুত হইলাম,—গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে হাজির হইল। আমরা তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া বসিলাম,—বংশীধ্বনির সঙ্গে ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

সে দিবস সারা রাত্রি এবং তৎপর দিবস বেলা একটা পর্য্যন্ত গাড়ীতে থাকিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। রাজবাড়ী হইতে একজন লোক ও একখানা গাড়ী আসিয়া উপস্থিত ছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া বেলা চারিটার সময়ে রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

রাজাবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম,—অতি অল্পক্ষণের আলাপ পরিচয়ে বুঝিলাম, তিনি অতি উদার চরিত্রের লোক। ভাবে বুঝিলাম, আমার উপরেও যেন তিনি একটু সন্তুষ্ট হইলেন। তারপরে কথা উঠিল,—আমি কোথায় বাস করিব। সে কথা অবশ্য আমার সহিত নহে,—রাজাবাহাদুরের পার্শ্বস্থ বৃদ্ধ দেওয়ানের সহিতই হইতে লাগিল।

দেওয়ানজী বলিলেন, "রাজ-প্রাসাদ-সংলগ্ন কোন একটা কামরা উঁহাকে দেওয়া হউক। উঁহার সহিত পরিবার আদি নাই ত।"

রাজাবাহাদুর মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—আজ নাই, পরে ত আনিতে পারেন। বিষেশতঃ উঁহার গ্রন্থাদি পাঠ ও কবিতা লেখার সখ আছে। নিভৃত স্থলই উনি ভাল বাসেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম। তিনি কি করিয়া জানিলেন যে আমি কবিতা লিখি। আমার ভাব অবগত হইয়া রাজাবাহাদুর বলিলেন, যিনি আপনার জন্য সুপারিস দিয়াছিলেন—এ সকল বিষয় তিনি আমাকে লিখিয়াছেন এবং

যাহাতে আপনার কোন বিষয়ে অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

দেওয়ানজী বলিলেন, "দীঘিরপাড়ের বাড়ীটি বেশ হইত—ছোট খাট, অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—আবার চারি পাশে ফুলের বাগান নিম্নেই প্রকাণ্ড দীঘি।"

রা। কিন্তু তা ত আর হয় না,—উনি নূতন লোক।

আ। কেন, সেখানে কি।

রা। সে বাড়ীতে ভূত আছে।

আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"ভূত! সে জন্য ভয় করি না। আমাকে সেই বাড়ীটিই দিন। যে প্রকার বর্ণনা শুনিলাম, উহাই আমার মনোরঞ্জক হইবে।"

রা। আপনি জানেন না—নিশ্চয়ই সে বাড়ীতে ভূত আছে, অনেক লোক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে।

আ। ভুল! ভুল! ভূত নাই—ভূতের অস্তিত্বই নাই।

রাজাবাহাদুর তখন সেই বাড়ীই আমাকে দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দেওয়ানজী কয়েকজন ভৃত্যকে ডাকিয়া সেই বাড়ীটি পরিষ্কার ও ব্যবহারোপযুক্ত করিয়া দিয়া আসিতে বলিলেন।

রাত্রি নয়টার সময় আহারাদি করিয়া একজন ভৃত্যের সঙ্গে আমি সেই বাড়ীতে গমন করিলাম। বাড়ীটি বাস্তবিকই অতিশয় মনোরম। শুনিলাম, কোন একটি ভদ্রলোক পশ্চিমবাসের জন্য এই স্থানে আসিয়া বাড়ীটি প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাঁহার একটি কন্যা এই বাড়ীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছায় এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যান। বাড়ীতে একটা লোক মরিলেই আমাদের দেশের লোকে ভাবে ভূত। মনে এইরূপ চিন্তা আন্দোলন করিয়া সেই বাড়ীতে

গিয়া প্রবেশ করিলাম। সুন্দর বাড়ী—চারিদেকের বৃক্ষ হইতে কুসুম-গন্ধ আসিয়া সমস্ত বাড়ীখানিকে মুগ্ধ করিতেছে। দীঘির নীলজলে স্নান করিয়া ধীর সমীর কুসুমে কুসুমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। কেন না, এই কাব্যময় বাড়ীখানি বসবাসের জন্য আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া গেল।

আমি তাহার মধ্যস্থলে একটা গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলাম। সেখানে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি সুসজ্জিত ও সংরক্ষিত ছিল। টেবিলের উপরে একটা আলো জ্বলিতেছিল। ট্রাঙ্ক খুলিয়া টেনিসন বাহির করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িতে লাগিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার রাত্রি জাগিয়া গ্রন্থাদি পাঠ করা একটু কু-অভ্যাস। তার উপরে বিদেশে আসিয়াছি—বিশেষতঃ এ বাড়ীতে ভূত আছে, এরূপ একটা কথাও শুনিয়াছি, কাজেই শয্যায় গেলাম না। সেই স্থানে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলাম। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই—সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে। তখন লোকের ভৌতিক বিশ্বাসের কথা মনে হইয়া হাসি আসিল—আবার পাঠে মনঃসংযোগ করিলাম।

সহসা একি! একটা মানুষ যেন চম্ চম্ করিয়া আমার টেবিলের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। অধীত গ্রন্থে মনঃসংযোগ ছিল বলিয়া, ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই—এক্ষণে ঘাড় উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও কিছু নাই! একি মনের বিকার! বোধ হয় তাহাই হইবে। আবার গ্রন্থ পাঠ করিতে যাইতেছি—ঝনাৎ করিয়া আমার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠের দরজা খুলিয়া গেল। এ কি! তবে কি কেহ এই বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিয়া লোককে ভয় দেখায়? সাহসে ভর করিয়া উঠিলাম, —সেই উন্মুক্ত দরজা দিয়া পার্শ্বস্থ গৃহে প্রবেশ করিয়া আলোক দিয়া তন্ন

তন্ন করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোথাও কেহ নাই। আশে পাশে চারিদিকে খুঁজিলাম, কোথাও কেহ নাই। যেখানে বসিয়াছিলাম ফিরিয়া সেই-খানে আসিলাম। এ কি! একটি ষোড়শী সুন্দরী স্ত্রীলোক, আমি যে চেয়ারে বসিয়াছিলাম, তাহারই উপরে বসিয়া আছে। আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল,—চক্ষুর পলক ফেলিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আমারও কপাল ঘামিতে আরম্ভ করিল। আমি সেই চেয়ার খানিতে আর সাহস করিয়া বসিতে পারিলাম না, তাহার অপর দিকের চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—তবে কি সত্যই ভূত আছে? একি ভূত? ভূত না হইলে বা এত শীঘ্র সে রমণীমূর্ত্তি কোথায় যাইবে? যদি ভূত হয়, তবে আমি কেমন করিয়া এখানে থাকিব? ভৃত্য কোন্ ঘরে শয়ন করিল? কি ভয়ঙ্কর! ঠিক আমারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—বোধ হয় পাঁচ হাত তফাতে হইবে, সেই ষোড়শী রমণীমূর্ত্তি। মূর্ত্তিখানিতে বিষণ্ণ-তার ছবি যেন অঙ্কিত। মূর্ত্তি আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—

তুমি ভূত বিশ্বাস কর না,—তোমার ভুল। কিন্তু তোমার ভুলে আমার উপকার হইল। তোমার প্রাণে সাহস আছে বলিয়াই আমি আ'জ আমার প্রাণের কথা তোমাকে বলিতে পাইতেছি। এই কথা বলিব বলিয়া অনেক দিন ধরিয়া এই বাড়ীতে আছি। আছি কিন্তু বড় যন্ত্রণায়—বড় কষ্ট পাইতেছি। এত জ্বালা মরজগতে নাই। এ বাড়ী আমার বাপের ছিল, আমি বাপের আদর-সোহাগিনী কন্যা ছিলাম। কিন্তু তখন জানিতাম না, তাই পাপে মজিয়াছিলাম, সেই পাপের ফলে আমার গর্ভ হয়। আমি তারপরে ঔষধ সেবন করিয়া সেই গর্ভ বিনষ্ট করি,—বিধিলিপির অখণ্ডনীয় প্রতাপে এ হতভাগিনীরও তাহাতেই জীব-লীলার সাঙ্গ হয়। হায়! স্বপ্নেও জানিতাম না যে ভ্রূণ-হত্যাকারিণীর পরি-ণাম এইরূপ। যে সন্তান পিতামাতার জীবন ধন, যে সন্তান পিতামাতার

আশা ভরসা, যে সন্তান পিতামাতার জলপিণ্ডস্থল, হতভাগিনী আমি সেই সন্তান নষ্ট করিয়াছি। সংসারের সার ধন-সন্তান আমি স্বহস্তে বিনষ্ট করিয়াছি। উদর বিদীর্ণ হইয়াছে, যন্ত্রণায় প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, তাতে যত কষ্ট না হইতেছে, সন্তানের এই দুর্গতিতে ততোধিক কষ্ট হইতেছে। এখন মনে হইতেছে হায়! এখনও যদি পাই, তাহা হইলেও জীবনধনকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিয়া এই যন্ত্রণা নিবারণ করি। হায়! রক্ত-পিণ্ড-সন্তান শেষে হিংস্রক-জন্তুরূপ ধারণ করিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে! প্রাণ যে যায়! পাপিনী—কুলকলঙ্কিনী আমি, যথেষ্ট ফল-ভোগ করিতেছি। আমি যেরূপ ভ্রূণ অবস্থায় আপন সন্তান হনন করিয়াছি, সেও আমাকে তদ্রূপ যন্ত্রণা দিতেছে। উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইতেছে, নাড়ী চিবাইয়া—বুকের শোণিত পান করিয়া যথেষ্ট ফল দিতেছে। হায়! এখন উপায় কি? এ যন্ত্রণা কত দিনে ঘুচিবে? এ ভীষণ যাতনার হাত হইতে কত দিনে অব্যাহতি পাইব?"

আমি স্তব্ধনেত্রে দেখিতে পাইলাম, এই কথা বলিতে বলিতে সেই রমণী তাহার কক্ষদেশ হইতে মৃত্যু-বিবর্ণীকৃত একটি ক্ষুদ্র শিশু বাহির করিয়া আমার টেবিলের উপর রক্ষা করিল—তখন আমি "কানাই" বলিয়া এক চীৎকার করতঃ মূর্চ্ছিত ভাবে মাটিতে ঢলিয়া পড়িলাম।

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখিলাম, তখনও ভাল করিয়া ফর্সা হয় নাই। বাঞ্ছিতের বাহুপাশ-বিমুক্ত অভিসারিকার ন্যায় ঊষা তখন সবে মাত্র পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে। দিগ্বলয় কোলে বালভানু তখন নিদ্রিত। নীল আকাশ-গাত্রে তখনও মুঠা মুঠা তারা ছড়ান রহিয়াছে। কক্ষ মধ্যস্থিত উজ্জ্বল আলোক আসন্ন নির্ব্বাণের আশঙ্কায় স্ফটিকাবরণের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমি তখন রাজবাড়ীতে আনীত হইয়াছিলাম।

শুনিলাম, আমি যখন চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম তখনই রাজ-নিয়োজিত লোকজন গিয়া আমাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। তিনি পূর্ব্বেই আমার এ দশা হইবে জানিয়া কয়েকজন লোককে গৃহপার্শ্বেই থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

আজি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। সমস্ত দিন ভাল করিয়া রাজাবাহাদুরের সহিত কথা কহিতে পারি নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভৌতিক আবির্ভাব।

গুরু। আমি তোমাকে ভৌতিক আবির্ভাবের কথা শুনাইব। এই আবির্ভাব অর্থে মানবের নিকটে স্বপ্নে, যোগাবস্থায় বা সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শন, অথবা শ্রবণের উপযুক্ত অবস্থাতে যে ভৌতিক আবির্ভাব হইয়া প্রতি-হিংসা সাধন করে বা টাকাকড়ির কি অন্য কোন কথা বলিয়া দেয়, কিম্বা পরলোকের সংবাদ আনিয়া দেয়।

শিষ্য। বোধ হয়, এরূপ হয় এইজন্য যে মানুষ—অর্থাৎ আমাদের মত মানুষ সর্ব্বদা জড়ের দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও আবেষ্টিত থাকে, এতদবস্থায় সূক্ষ্ম দেহী তাহার সমান নহে বলিয়া সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে পারে না, যখন তাহাদের সমান ও উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই মনোরথ সিদ্ধ করিয়া লয়।

গুরু। হা, তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত করিয়াছ।

শিষ্য। যে সকল বিদ্রোহী পার্থিব আকর্ষণের বলে পৃথিবীর

নিম্নস্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারাই এরূপ করিয়া থাকে, কি যাঁহারা উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও এরূপে আসিতে পারেন ?

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ,—আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, যাহারা পৃথিবীর নিম্নস্তরে—হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বা বাসনার আগুন কিম্বা আসক্তির বহ্নিশিখা অথবা প্রতিহিংসার জ্বলন্ত-ছুরি লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা পৃথিবীর নিম্নস্তরে থাকিয়া সর্ব্বদাই বাঞ্ছিতের অনুগমন করে, কিম্বা ঈপ্সিত স্থানের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিম্বা রোদনের হাহাকার লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। সময় পাইলেই তাহারা নানারূপে নানা কৌশলে আত্মকার্য্য সংসাধিত করিয়া লয়। আর যাহারা উর্দ্ধস্তরে গিয়াছে,—তাহারা নিতান্ত ইচ্ছাশক্তির প্ররোচনায়—ক্বচিৎ আসিয়া বাঞ্ছিতের সহিত সাক্ষাৎ করে। এইরূপ শক্তি সকল আত্মিকেরই আছে। কিন্তু যে সকল মানব যোগাদি দ্বারা ইহ জগৎ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আরও উর্দ্ধলোকে গমন করেন এবং তাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই আসিয়া ভক্তদিগকে দর্শন দিয়া থাকেন।

শিষ্য। আপনি যে আবির্ভাবের কথা বলিলেন, তাহা কি পূর্ব্বে যেরূপ ভূতের কাহিনী বলিয়াছেন, সেইরূপ ?

গুরু। গল্পগুলি সেইরূপ,—তবে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

শিষ্য। সে পার্থক্য কি ?

গুরু। পূর্ব্বে যেগুলি বলিয়াছি, সে কাহিনীগুলির ঘটনা আমাদের মত জীবন্ত মানুষের জাগ্রত অবস্থার ঘটনা।

শিষ্য। আর এখন যাহা বলিবেন তাহা কোন্ অবস্থার ঘটনা।

গুরু। কাহারও স্বপ্নাবস্থার ঘটনা, কাহারও যোগাবস্থার ঘটনা, কাহারও আত্মিক অবস্থার সমান ও উপযুক্ত অবস্থার ঘটনা।

শিষ্য। সেগুলি ভৌতিক ঘটনা কি মনেরই বিকৃতি; তাহার স্থির করিবার উপায় কি?

গুরু। উপায় আছে।

শিষ্য। সে উপায়ের কথা শুনিতে চাহি।

গুরু। গল্পগুলি শুনিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তাহা মানস-বিকৃতির ফল নহে। তাহার মূলে কঠোর সত্য নিহিত আছে।

শিষ্য। আমি আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

গুরু। কি?

শিষ্য। যাহারা কাহারও দ্বারা অন্যায়রূপে নিহত হয়, আপনি বলিয়াছেন—তাহারা প্রতিহিংসার জ্বলন্ত-আগুন বুকে করিয়া, নিহন্তার নিকট ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যুগ হইতে যুগান্তরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া, তাহার জন্মের পর জন্ম—প্রতীক্ষা করিতে থাকে,—কেন, এমন হয় কেন? সেও তাহার কর্ম্ম জীবনের ফলাফল লইয়া অন্যের মত কেন চলিয়া যায় না?

গুরু। কামনা ও আসক্তির আকর্ষণে আত্মা পৃথিবীর নিম্নস্তর অতিক্রম করিতে পারে না। প্রেম বল, ভালবাসা বল, কোন কার্য্যাকার্য্যের আসক্তি বল, হিংসা বল, দ্বেষ বল,—মরণকালে যাহা ভাবিতে ভাবিতে আত্মা বহির্গত হয়, তাহার জন্যে আকর্ষণ থাকে। তাই আমাদের দেশে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে,—জপ তপ কর কি? মরণকালে সাবধান! তাহার অর্থ এই কালে যে ভাব বা আকর্ষণ থাকিবে—তাহার জন্য মানুষের পূর্ণ দায়িত্ব। তোমাকে কয়েকটি ভৌতিক আবির্ভাবের কাহিনীও শুনাইতেছি—তাহাতে এ তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করিতে পারি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

ভূতের খবর।

"জন্মান্তর-রহস্য" প্রকাশ হইবার পর, পারলৌকিক তত্ত্ব লইয়া বিশেষ একটা আন্দোলন-আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে—ইহা আমার সৌভাগ্য এবং পরিশ্রমের সার্থকতা বলিতে হইবে। আরও পরম সৌভাগ্য যে, এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক পদস্থ ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে কয়েকজন তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা জানাইয়া আমাকে বাধিত করিয়া গিয়াছেন।

একজন বলিয়াছিলেন,—আমার জীবনের একটি ঘটনা আপনাকে বলিব, ঘটনাটি কঠোর সত্য বলিয়া ধারণা করিবেন।

"আমার একটি বন্ধুকে ক্ষিপ্ত কুকুরে কামড়ায়। এই রোগের যে সকল চিকিৎসা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলিরই তিনি অধীন হইয়াছিলেন,—দুই মাস অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় মাসেরও কয়েকদিন গত হইল,—আমি মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইয়া থাকি, হঠাৎ একদিন শুনিতে পাইলাম, আমার বন্ধুটি কুক্কুর-দংশনজনিত জলাতঙ্ক রোগ হইয়াছে। তিনি জল পান করিতে পারিতেছেন না এবং যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। শ্রবণমাত্র তাঁহার নিকটে ছুটিয়া গেলাম।

আমাকে দেখিয়া তিনি হাহাকার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইব কি, আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"আমার উপায় কি?"

আমি। এ রোগের বিষয়ে কোন ভাল চিকিৎসা আছে কি না, জানি না। সকলই কর্ম্মফল,—যাহাই হউক, যে সকল প্রচলিত চিকিৎসা আছে, এখনও তাহার চেষ্টা করা যাউক।

ব। বৃথা চেষ্টা—নিষ্ফল পরিশ্রম! যতক্ষণ কিছু গিলিবার শক্তি ছিল, ততক্ষণ ঔষধের বিরাম হয় নাই,—যাক্, আমি তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না—অসহ্য! অসহ্য! কতক্ষণে মরিব বলিতে পার?

আ। এ রোগের রোগী আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই—সুতরাং কখন্ মরিবে বা কিরূপ অবস্থা হইলে মৃত্যু হইবে, তাহাও বলিতে পারি না।

ব। আর বড় অধিক সময় নাই—প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে।

আ। আপনাকে আর কি বলিব—এমন জীবনের অবসান সময়ে আপনার প্রিয় গায়ত্রী পাঠ করিবেন।

এস্থলে একটি কথা বলিতে চাহি। ঐ ব্যক্তি পৌরাণিক বা তান্ত্রিক গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। সে বিষয়ে কেহ তাঁহাকে মত করাইতে পারিয়াছিল না। তিনি বলিতেন, "আমি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের গায়ত্রী দীক্ষা হইয়াছে, আবার কেন? যাহাদের বেদ মন্ত্রে অধিকার নাই,—সেই স্ত্রী-শূদ্রদিগের জন্য পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রচলন হইয়াছে।" এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার সারা-জীবনে অপনোদিত হয় নাই এবং মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই,—কাজেই আমি তাঁহাকে গায়ত্রী পাঠ করিতে স্মরণ করাইলাম। তিনি বলিলেন,—"আমার তাহা উত্তমরূপে স্মরণ আছে। আমার জ্ঞানের একটু মাত্রও অপনোদন হয় নাই—তবে এক এক সময় হাপ লাগিয়া অস্থির করিতেছে মাত্র!"

আমি বলিলাম,—"আপনি কি বাঁচিবেন বলিয়া আশা করেন নাই?"

ব। আমি ত খোকা নই!—বড় জোর আর এক ঘণ্টা তোমাদের পৃথিবীতে আছি। আর একবার যখন ঘুরিয়া আসিবে—তখন আমি ঐ উঠানে কাপড় ঢাকা পড়িয়া থাকিব—তুমি আমার পার্শ্বে দাঁড়াইবে, কিন্তু আমার দেহ তখন কাঠ—আমি তখন কোথায়। কে জানে?

আ। বড়ই শোকাবহ ঘটনা।

ব। এমন শোকাবহ ঘটনা জগতের প্রত্যেক জীবের জন্যই ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে।

আ। যদি পরলোকের কথা—

বা। পরলোকের কথা জানিতে চাহ,—এই না?

আ। হা।

ব। যদি শক্তি থাকে,—সম্ভব হয়,—আমি তোমাকে বলিয়া যাইব। নিশ্চয় জানিও—আমার পরলোকে গিয়াও এ কথা মনে থাকিবে।

দুঃখের বিষয়, ঠিক তাহার এক ঘণ্টা পরেই—তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়, প্রাণবিয়োগ কালে আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলাম না। ঠিক তাঁহার কাপড় ঢাকা মৃতদেহ গিয়াই দর্শন করিতে হইয়াছিল।

তারপর প্রতিদিন আমি তাঁহার কথা স্মরণ করিতাম,—প্রতিদিন ভাবিতাম, আজি হয়ত কোন সময়ে তিনি আসিয়া পরলোকের কথা আমার নিকট বলিয়া যাইবেন। কিন্তু কেহ আসিল না, কোন কথা জানিতে পারিলাম না। ফলে তাঁহার শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেল।

একমাস উত্তীর্ণ হইল। তখন তাঁহার কথা—বা তাঁহার আসিয়া পরলোক সংবাদ বলিবার কথা বড় মনে হইত না—মায়াচ্ছন্ন জীব, অন্য কাযে ভুলিয়া গেলাম।

এক একদিন বোধ হইত, কি সাঁ করিয়া যেন মৃতবন্ধু আমার নিকট

দিয়া চলিয়া গেলেন।—মনে মনে স্থির করিলাম, উহা আমার মনের বিকার মাত্র। আরও এক মাস কাটিয়া গেল।

একদিন বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা ছিল, আমিই উপবাস করিয়া পূজা করিলাম। তারপর আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছি।

নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন তিনি আসিয়াছেন—সেই মূর্ত্তি, সেই রূপ, সেই কণ্ঠস্বর—কেবল সকলই উজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ। স্বপ্নে যে কোন পদার্থ দেখা যায়, তাহাই একটু উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

তিনি সেই পূর্ব্বস্বরে একটু মধুরভাবে বলিলেন,—আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি বলিয়া কতদিন তোমার নিকট আসিয়াছি—তোমাকে পরলোকের কথা বলিব বলিয়া কত চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু তুমি আমাকে দেখিতে পাও নাই বা আমার কথা শুনিতে পাও নাই। তোমাদের আশে পাশে কত বিদেহী—কত আত্মা তাহাদের মর্ম্মকাহিনী লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পিতা পুত্রের নিকট, পুত্র পিতার নিকট—স্ত্রী স্বামীর নিকট, স্বামী স্ত্রীর নিকট,—বন্ধু বন্ধুর নিকট তাহার প্রাণের কথা বলিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু তোমরা শুনিতে পাও না, ঐ ত দুঃখ।

শুনিতে পাও না কেন,—তাও বলি। আমাদের যে স্বর—তোমাদের স্বর তার চেয়ে স্থূল। স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সূক্ষ্মরাজ্যের—সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্য তোমরা পাইবে কি প্রকারে? তবে সাধনা দ্বারা যদি সূক্ষ্ম জগতে উপস্থিত হইতে পার—তবেই আমাদের কথা বুঝিতে পার।

ভূতে কথা কহিলে তোমরা শুনিতে পাও—কেমন করিয়া শুনিতে পাও,—তাও বলি শোন। ভূত বা নিকৃষ্ট জগতের বিদেহীগণ যখন নিজে কথা কহে, তখন শুনিতে পাও না, পাইবার সম্ভব নাই। কিন্তু

যখন কোন স্থূল পদার্থে বা মানবে আবিষ্ট হয়, তখন সেই স্থূলেন্দ্রিয় দ্বারা বাক্যাদি বলিলে তবে শুনিতে পাও।

আমি আসিয়াছি—তোমার অনুরোধে আসিয়াছি। তোমরা যখন ভ্রমণ কর, কাজ কর্ম্ম কর—তখন অনেক আত্মিকই তোমাদিগের সহিত কথা কহিতে আসে, কিন্তু তোমরা তাহাদের কথা শুনিতে পাও না বলিয়াই তাহারা ফিরিয়া যায়।

তুমি আমার পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, ঘণ্টাখানেক পরেই আমার মৃত্যু হয়। আমার মৃত্যু হইলেই আমার স্ত্রী-পুত্র সকলেই হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমি তাহা শুনিতে লাগিলাম,—আমি তখনও তাহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া—কিন্তু তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না,—তাহারা সেই পরিত্যক্ত জড়দেহ বেষ্টন করিয়াই কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। একটা কথা বলি শোন,—কথাটা বড় তোমাদের আশাপ্রদ,—মৃত্যুর পূর্ব্বে বোধ হয়, এই সকল পুত্র-কন্যা, এই সকল আত্মীয় স্বজন—এই সকল বিষয়-আশয় পরিত্যাগ করিয়া গিয়া হয় ত থাকা কষ্টকর হইবে; কিন্তু তা নয়,—এ সকলের উপর আর একটুও মায়া থাকে না। যেমন কোন দোকানদারের গৃহে পথিক রন্ধনাদি করিয়া আহার করিয়া চলিয়া আসিবার সময় তাহার উপর যে ভাব হয়, পার্থিব আত্মীয়-স্বজনের উপর তাহার অধিক হয় না। কেন হয় না,—তাও শোন। মানুষ যখন তাহার জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়, তখন সে জানিতে পারে—তাহার এমন গৃহ, এমন স্ত্রী-পুত্র অনেক হইয়াছে—অনেককেই পরিত্যাগ করিয়াছে। ও সমুদয় কিছুই নহে—একটা ক্ষণিকের ধাঁ ধাঁ মাত্র।

যাক্—তোমায় আমায় এই শেষ সাক্ষাৎ, আর হয় ত দেখা হইবে

না। মৃত্যুর পর আত্মা থাকে—সে কর্ম্মফলের অধীন হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে, একথা সত্য বলিয়া মনে রাখিও।

তুমি হয়ত প্রভাতে উঠিয়া অথবা নিদ্রা যদি ভাঙ্গে এই রাত্রেই ভাবিবে "স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অমূলক চিন্তা মাত্র" কিন্তু স্বপ্নও সময় সময় সত্য হয়। স্বপ্নও বেদের কাহিনীতে পরিণত হয়। তুমি স্বপ্ন বলিয়া আমার কথাগুলি মিথ্যা ভাবিও না। আমি প্রতিজ্ঞা পালনার্থ তোমার নিকট আসিয়াছিলাম,—ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া জানিও। যদি বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে আমার এত কষ্ট বৃথা যাইবে, তজ্জন্য একটা কথা বলিয়া যাই— * * * বাবুর নিকট আমার * * * বইখানা আছে, কল্যই সকালে সেখানা চাহিয়া লইয়া দেখিবে, তাহার মধ্যে সাদা এক টুক্‌রা কাগজে তোমার রচিত সেই আমার প্রিয় গানটি আমার হস্তাক্ষরে লেখা এবং তাহার তলায় আর একটি গানের একটি চরণ মাত্র লেখা আছে।

আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল, উন্মুক্ত জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি,—তখন রাত্রি আছে, তখনও সমস্ত প্রাঙ্গণে চাঁদের আলো ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কখনও মনে হইতেছিল, সত্যই তিনি আসিয়াছিলেন, আবার কখনও ভাবিতে-ছিলাম,—তাঁহার কথা মধ্যে মধ্যে ভাবনা করি, তাই এ দীর্ঘ স্বপ্নটা দর্শন করিলাম। কিন্তু স্বপ্নের শেষ ভাগে যাহা অবগত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার একটু একটু বিশ্বাসও হইতেছিল, মনে হইতেছিল— * * * বাবুর নিকট তাহার পুস্তক আছে, আমি কখনই তাহা জানি না—বাস্তবিকই তিনি আমার রচিত একটি গান প্রায় সর্ব্বদাই গাহিতেন, —তা আবার তাঁরই নিজ হস্তে এক টুক্‌রা সাদা কাগজে লেখা এ পুস্তক মধ্যে আছে,—তবে কি তিনি আসিয়াছিলেন, তবে কি নিশ্চয় তিনি স্বপ্নে কথা কহিয়াছিলেন।

কিন্তু মনে হইল যে—পুস্তক যথার্থ * * * বাবুর নিকট আছে কি না, যথা তাহাতে গান লেখা আছে কি না, না জানিয়া কি স্থির করিতে পারি। মনের চিন্তা সংস্কারে অমন একটা অদ্ভুত ব্যাপারও স্বপ্নে দৃষ্ট! কিন্তু * * * বাবুর নিকটে যাইবার জন্য মন অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইল। কিন্তু সে একটু পাড়ান্তরে বলিয়া রাত্রে আর যাওয়া হইল না।

প্রভাত হইতেই আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া * * * বাবুর নিকটে গমন করিলাম। তত প্রত্যূষে তাঁহার বাড়ীতে আমাকে দেখিয়া তিনি ব্যগ্রতাসহ গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিলাম। শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—হাঁ, আমার নিকট তাঁহার * * * পুস্তক আছে।” তিনি তখনই তাড়াতাড়ি তাঁহার আলমারী হইতে সেই পুস্তক খানি বাহির করিলেন, খুলিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম,—ঠিক সেই পুস্তকের মধ্যে সাদা কাগজে তাঁহারই হাতের লেখার সেই গানটি লেখা আছে।

আমরা উভয়েই গলদশ্রু-লোচনে বন্ধুর আত্মার শান্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

-ঃ*ঃ

কারাগারে ভূত।

গুরু। বর্ত্তমানে আমি যে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সত্য ঘটনাটির উল্লেখ করিব, তাহা বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার এডোয়ার্ড বিন্‌স এম, ড়ি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “এনাটমী অব শ্লীপ” (Anatomy of Sleep) নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং এই ঘটনা উক্ত ডাক্তার যখন

জ্যামেকাতে ছিলেন তখনই ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহার বন্ধু ও স্থানীয় গভর্ণর স্যার চার্লস মেট্‌কাফ সাহেবের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই—

জ্যামেকা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপমালার কণ্ঠ-বিচ্যুত ও দূর-বিক্ষিপ্ত মধ্যমণির ন্যায় কারিব সাগরে অবস্থিত। এই স্থান পূর্ব্বে স্পেনের অধিকারে ছিল, বর্ত্তমানে রত্নাকরতরঙ্গ-বিলাসী রত্নভোগী বৃটিশরাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

এই জ্যামেকার এক পাদপ-বহুল পল্লীগ্রামে ডন্‌কান নাম্নী এক কোয়াদ্রুণ যুবতীর বাস ছিল। কোয়াদ্রুণ যুবতী ডন্‌কান শৈশবেই পিতা মাতা হারা হইয়াছিল—এবং পিতৃতুল্য কোন আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে বসতি করিত। ডন্‌কানের দেহে যৌবনশ্রী ষোলকলায় প্রস্ফুটিত। অনেকেই তাহার কুসুম কোমল লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু সরলা ডন্‌কানের উপরে যে যৌবন চাপিয়া বসিয়াছে, সে সংবাদ তাহার নিকট তখনও ভাল করিয়া পৌঁছে নাই,—সে বালিকার ন্যায় সরল প্রাণে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিত এবং সকলের সঙ্গেই অকৃত্রিম সরল ব্যবহার করিত, কাজেই সকলেই তাহাকে স্নেহ করিত —ভালবাসিত।

একদিন প্রভাতে ডন্‌কানের গৃহ শূন্য দেখিয়া প্রতিবাসিগণ তাহার অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কেহই সন্ধান পাইল না। ক্রমে বেলা হইল, তথাপিও সে গৃহে ফিরিল না,—তখন সকলেই তাহার বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল, কিন্তু ব্যর্থ অনুসন্ধান, কেহই তাহার বিষয়ে কিছুই অবগত হইতে পারিল না।

কিছুকাল পরে একদা পুলিশে সংবাদ পৌঁছিল যে, বড় রাস্তার অদূরে একটা নিভৃত স্থানে ডন্‌কানের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। পুলিশ

তখনই ছুটিয়া গিয়া মৃতদেহ কুড়াইয়া আনিয়া করোণার আফিসে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

ডন্‌কানের শব পরীক্ষা করিয়া করোণার ও ডাক্তার স্থির করিলেন যে, কোন বলবান্ ব্যক্তি বলপ্রয়োগে ডন্‌কানের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং সেই পাশব অত্যাচারের অসহ্য ক্লেশে যুবতীর মৃত্যু হইয়াছে। পুলিশ সবিশেষ চেষ্টায় অপরাধীকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিলেন,—ডিটেক্‌টিভগণ নানারূপ কৌশলজাল বিস্তার করিলেন, কিন্তু ডন্‌কানের সর্ব্বনাশকারী নরাকার পশু কিছুতেই ধৃত হইল না,—পুলিশ কোন প্রকারেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

ক্রমে ক্রমে সকলেই ডন্‌কানের কথা ভুলিয়া গেল,—পুলিশ অনুসন্ধানে ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন। ক্রমে ক্রমে আরও কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল।

এই সময়ে পেণ্ড্রিল ও চিতি নামক দুইটি নিগার যুবক বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ করিয়া বিভিন্ন স্থানের কারাগারে প্রেরিত হইল। পেণ্ড্রিলের এক অপরাধ—চিতির অন্য অপরাধ। পেণ্ড্রিলের জেল হইল কিংষ্টনের সংশোধিনী কারাগারে, আর চিতি ফেলমাউথের কারাগারে আবদ্ধ হইল,—উভয় স্থানের ব্যবধান আশী মাইল।

দণ্ড দীর্ঘ দিনের নহে—ক্রমে ক্রমে তাহাদের মুক্তির দিন নিকট হইয়া আসিল,—আর কয়েক দিন পরেই তাহারা কারামুক্ত হইয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিবে। সহসা একদিন রাত্রে আশী মাইল দূরে উভয়ে কারাগারে থাকিয়া পেণ্ড্রিল ও চিতি একই সময়ে—একই কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কাহাকেও যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া—কাহার ভীষণ মূর্ত্তি যেন সম্মুখে দেখিয়া তাহারা কথা কহিয়াছিল—উভয়েই বলিয়াছিল, —"ডন্‌কান,—তুমি ডন্‌কান্।" ক্ষমা কর—অব্যাহতি দাও—রক্ষা

কর। তুমি দেবতা হইয়াছ,—আমি সেই পশুই আছি—ক্ষমা কর—রক্ষা কর—তোমার অনলের হাতে আমাকে ধরিও না।”

এই ঘটনা—এই চীৎকার একদিন নহে, দুই দিন নহে—ক্রমাগত কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার চলিতে লাগিল, ক্রমে প্রহরীগণ, তারপর কর্ত্তৃপক্ষগণ ব্যাপার অবগত হইতে পারিলেন,—তারপর উভয় জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ক্রমে ক্রমে—সম্ভবতঃ কয়েকদিন অগ্র পশ্চাতে কারাগারের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট যে রিপোর্ট করিলেন ;—উভয় রিপোর্টেই লেখা ছিল,—“একজন বন্দী (একস্থান হইতে বন্দীর নামের স্থলে পেণ্ড্রিল এবং অপর স্থান হইতে চিতি) প্রায় প্রত্যহই নিদ্রাকালে ডন্‌কান রক্ষা কর—তুমি দেবতা হইয়াছ—তোমার অনলের হাত, পোড়াইয়া মারিও না,—ইত্যাদি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক স্বরে কথা বলিয়া থাকে।”

উপরিতন কর্ম্মচারী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন,—কেননা, উভয় জেলের উভয় বন্দী এক প্রকারের কথা বলিয়া থাকে—এবং সময়াদিরও মিল একই। তিনি এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

পুলিশ ডন্‌কানের নাম শুনিয়াই ভাবিলেন, হয়ত ডন্‌কানের হত্যার সহিত এই ঘটনার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। আগ্রহ ও যত্নের সহিত অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন।

এদিকে প্রতি রাত্রিতে নিদ্রাবেশে ডন্‌কানের অনল মূর্ত্তি দর্শন ও বিবিধ বিভীষিকা দর্শন করিয়া পেণ্ড্রিল ও চিতি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তদুপরি পুলিশের প্রশ্নপীড়নে পেণ্ড্রিল ও চিতি উভয়েই ডন্‌কানের হত্যার অপরাধ স্বীকার করিল এবং সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

বিচারকের বিচারে চিতি ও পেণ্ডিল কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গাছে ভূত।

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে আড়ংঘাটা ষ্টেশনের ক্রোশ খানেক দূরে সুবিস্তৃত একটী মাঠের মধ্যে বহু পুরাতন এক বটবৃক্ষ আছে। বৃক্ষটির বয়স কত, তাহা ঠিক অনুমান করা যায় না—কত দীর্ঘ দিন হইতে সে জনশূন্য ময়দানে তাহার শাখা-বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা বলা যায় না।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, একটী ভদ্রলোক একদা দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপবেশন করিয়া হস্তস্থিত ব্যাগটী বৃক্ষমূলে রক্ষা করিলেন।

ফাল্গুন মাস,—সূর্য্যকিরণ প্রখর হইয়াছে, মুখভাব অত্যন্ত ম্লান। বোধ হইতেছে, পথিক অনেক দূর হইতে আসিতেছেন, এবং কপালের শিরগুলি স্ফীত ও কুঞ্চিত, বোধ হইতেছে, তাঁহার কোন যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। ফাল্গুনের সুমৃদু সমীরণ পথিকের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

পথিক ক্রমে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে অব্যক্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"এর চেয়ে মরণ ভাল! এই দারুণ রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কত পাপ করিয়াছিলাম, তাহারাই দণ্ড স্বরূপ এই কালোপম শূল ব্যথা হইয়াছে। শুনিলাম শান্তিপুরের একজন ভাল ঔষধ জানে, তাই মরণ স্বীকার করিয়া এতদূর পথ অতিক্রম করিয়া সেইস্থানে গিয়াছিলাম এবং পনর দিন তাহার বাড়ী পড়িয়া থাকিয়া ঔষধ সেবন করিয়া দেখিলাম

কিছুই হইল না। যে যন্ত্রণা লইয়া গিয়াছিলাম,—সেই যন্ত্রণা লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। হা ভগবান! পাপের কি অবসান নাই, যন্ত্রণার কি শেষ নাই? আর কতদিন হতভাগ্যকে অনল যন্ত্রণা দিবে?"

তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহির্গত হইতে লাগিল এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র নীরব—নিস্তব্ধ। কেবল দূরে লোহিত কুসুম-ভূষিত শিমূল বৃক্ষের শাখাগ্রে বসিয়া এক কোকিল ডাকিয়া বসন্তের আবির্ভাব জানাইয়া দিতেছিল।

ক্রমে বেদনার একটু উপশম হইল,—যন্ত্রণার একটু লাঘব হইল; পথিক উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার চক্ষুর জল শুকায় নাই, তখনও সে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে প্রশান্ততা ফিরিয়া আইসে নাই।

সহসা তাঁহার সম্মুখে বৃক্ষ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি পদার্থ পতিত হইল। প্রথমে ভাবিলেন, বৃক্ষের ফলাদি কি হইবে! কিন্তু তৎপরে দেখিতে পাইলেন, সে বৃক্ষের ফল নহে। ঔষধের বটিকা। বটিকার সংখ্যা সাত আটটি।

রোগাক্লিষ্ট পথিক বৃক্ষের দিকে চাহিলেন, কেহ কোথাও নাই—কেবল বসন্তের বাতাস সেই বৃক্ষের নব পল্লবের মধ্যে ধীরে ধীরে খেলা করিতেছিল।

পথিক ভাবিলেন, দেবতা দয়া করিয়া তাঁহার জন্য ঔষধ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বটিকা কয়টি কুড়াইয়া আনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার একটি সেবন করিলেন। আগুনে জল দিলে তাহা যেমন নিবিয়া যায়, একটি মাত্র বটিকা সেবনে তদ্রূপ তৎক্ষণাৎ তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা উপশম হইল।

পথিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। কোথা হইতে ঔষধ পড়িল, কে তাঁহাকে প্রদান করিল জানিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অবগত হইতে পারিলেন না; তৎপরে পথিক ঔষধের বটিকাগুলি লইয়া চলিয়া গেলেন—তৎপরে ক্রমে ক্রমে বটিকাগুলি সেবনে রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইলেন।

তিনি আরোগ্য হইলে, ক্রমে তাঁহার আরোগ্য-সমাচার ও আরোগ্যের উপায় চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তখন দলে দলে নানাবিধ রোগের রোগী আসিয়া বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ রোগের কথা জানাইতে লাগিল—এবং যে কেহ রোগের কথা জানাইত, তাহারই জন্য ঔষধ পতিত হইত। অনেক লোক এইরূপে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল,—ক্রমে লোকসংখ্যা এতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, সেইখানে একটা 'বার' বসিয়া গেল।

অনেক লোক গাছ হইতে পতিত ঔষধ কুড়াইয়া লইয়া রোগ হইতে আরোগ্য হইতে লাগিল। তারপর, কিছুদিন পরে ঔষধ পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

প্রেততত্ত্ববিদেরা অনুমান করিলেন,—কোন চিকিৎসকের আত্মা চিকিৎসাকার্য্যের প্রবল আসক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং সেই আসক্তির আকর্ষণে পার্থিবস্তরে বিচরণ করিতেছিলেন, তৎপরে ঔষধাদি প্রদান করিয়া সে আসক্তির আগুন নির্ব্বাপণ করিয়া ঊর্দ্ধস্তরে গমন করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভূতের বার।

বঙ্গদেশের যশোহর জেলায় বনগ্রাম সবডিবিসনের অধীন হাজরাখালি একটি পল্লীগ্রাম। এই পল্লীগ্রামে একটি ষোড়শবর্ষীয় পুত্র লইয়া এক

দরিদ্রা বিধবা বাস করিত। সে ইতর জাতীয়,—ছেলেটি গ্রামের বিশ্বাসবাড়ীর গরুর রাখাল ছিল, মাসিক খোরাক পোষাক ও নগদ একটি টাকা বেতন পাইত। দরিদ্রা, পুত্রের উপার্জ্জিত সেই একটি রজত মুদ্রা এবং নিজের কাঠ বেচিয়া, ঘুঁটে বেচিয়া যাহা করিত, কোন প্রকারে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

অগ্রহায়ণ মাস,—ভীষণ ম্যালেরিয়ায় পল্লীগ্রাম উৎসন্নের মুখে যাইতে বসিয়াছে। বাড়ী বাড়ী রোগী—বাড়ী—বাড়ী জীর্ণ-শীর্ণ মানব মানবী ম্লান মুখে কুইনাইন খাইতেছে, আর সময় মতে শয্যায় শুইয়া কম্পজ্বরের প্রবল তাড়না সহ্য করিতেছে। কাঙ্গালিনীর ছেলের নাম "ঝড়ো"। ঝড়োও এরমধ্যে দুইবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। তার পরে একটু একটু জ্বরও থাকিত, চাষার ছেলে নাইয়া ধুইয়া ভাত খাইয়া গরুর পাল লইয়া মাঠে যাইত,—যেদিন মাঠে গিয়া জ্বর আসিত, সেদিন সঙ্গীগণের উপরে গোরক্ষার ভার দিয়া, কোন পত্র বহুল বৃক্ষতলে শুইয়া জ্বরের তাড়না ভোগ করিত,—শেষ সন্ধ্যার সময় গরু লইয়া মনিব বাড়ী গরু পৌঁছিয়া দিয়া বাড়ী যাইত। এইরূপ করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষাবস্থা,—হঠাৎ একদিন কাঁপিতে কাঁপিতে ঝড়ো গৃহে আসিল, তাহার আর কথা কহিবার শক্তি নাই। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। ছেলের চেহারা দেখিয়া মায়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—তখনই ময়লা কাঁথাখানি গায়ে জড়াইয়া, একটা ছিন্ন মাদুরে পুত্রকে শয়ন করাইয়া দরিদ্রা তাহার শিয়রে বসিল। ঝড়ো কিন্তু আর কথা কহিতে পারে না, ঘন ঘন জল খাইতে লাগিল, আর রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, ঝড়োর জ্বর সারিল না,—কাঙ্গালিনী পুত্রের শিয়রদেশে বসিয়া বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিল।

প্রভাত হইলে পাড়ার দয়ালু দাদাঠাকুরকে ডাকাইয়া দরিদ্রা পুত্রের হাত দেখাইল। দাদাঠাকুর হাত দেখিয়া অপ্রসন্নমুখে বলিলেন,—অবস্থা ভাল হয় নাড়ীতে বিকার ধরিয়াছে. দরিদ্রা ব্যাকুল হইল। দাদাঠাকুরের উপদেশমতে ডালিমের শিকড় শিউলী পাতার রস, আদা ও চূণের জল দিয়া দুই তিন বার খাওয়াইয়া দিল ; কিন্তু ঝড়ো আর কথা কহিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ঝড়োর ভুল বকুনি আরম্ভ হইল, তারপরে কালরাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে কাঙ্গালিনীর মাথায় বজ্রপাত হইল। তাহার প্রাণপাখী জন্মের মত পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল।

বিধবা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। দিবানিশি কেবল হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিতে দিগন্ত কাঁপাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দরিদ্রা তাহার মেটে ঘরের দাবায় বসিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে আর শোকের উদাস নয়নে বাহিরের দিকে চাইয়া আছে। সহসা তাহার সম্মুখের কচার বেড়ার তিন চারিটা কচা গাছ দমিয়া পড়িয়া কাঁপিয়া উঠিল। একটা মানুষ বসিলে যতখানি যায়গা কাঁপিয়া নড়িয়া পড়ে, ততখানি যায়গা কাঁপিয়া উঠিল। কোথাও একটু বাতাস নাই—সমস্ত নিস্তব্ধ, বেড়ার একটু অল্প স্থান লইয়া অমন করিয়া কিসে নড়িল ?—দরিদ্রার তাহা মনে হইল, কিন্তু তাহার প্রাণ তখন বড় শোকাকুলিত, বড় অবসন্ন—এই সময়ে তাহার সোণার ঝড়ো মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মা বলিয়া ডাকিত। হায়! আর সে আসে না কেন? কাজেই সে বিষয়ের আর অনুসন্ধান লইল না। কিন্তু একটুখানি পরেই স্পষ্ট—অতি স্পষ্টতররূপে দরিদ্রা শুনিতে পাইল, তাহার হৃদয়ের স্নেহকরুণা মাখান সেই ঝড়োর স্বরে মা বলিয়া ডাকিতেছে। সে উত্তমরূপ লক্ষ্য করিয়া শুনিল, স্বর সেই কচার বেড়ার উপর হইতে আসিতেছে। কিন্তু কেহ কোথাও নাই—এবং দূর হইতে

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। দরিদ্রার অত্যন্ত ভয় হইল। সে সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই পুরাণ কণ্ঠ স্বরে-- ঝড়োর সেই মধুমাখা স্বরে বলিল,—"মা; তুই ভয় পেয়ে উঠে যাচ্ছিস কেন? আমি যে তোর ঝড়ো। আমি মরেছি—তোদের কথায় আমি মরেছি। কিন্তু মা; তোর ভাবনায় আমি যেতে পারিনি,—মরণকালে তোর ভাবনাই আমার বড় হ'য়েছিল—তাই তোর কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্চি! মা, অত কাঁদিস্ না। কে কার মা? তোকেও ত আস্‌তে হবে। তুই ব'সে ব'সে কাঁদিস্—আমার বুক ফেটে যায়।"

দরিদ্রা ভীত-কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"তুই কি আমার ঝড়ো? বাবা আমার যে ভয় ক'চ্চে!"

ঝড়োর প্রেতাত্মা বলিল—"তোর ভয় নেই মা; আমি তোর ঝড়ো, তুই আর কাঁদিস্ না। তোর কান্নায় আমার ভারি কষ্ট হয়।"

দ। বাবা, আমায় ফেলে কোথায় গেলি?

ঝ। যাওয়া আসা কারো স্বাধীন ইচ্ছা নয় মা!

দ। বাবা,—তুই যে দেশে গিয়াছিস্ আমাকে সেই দেশে ডেকে নে বাবা?

ঝ। আমার তাতে কি কোন ক্ষমতা আছে মা?

দ। তবে তোর শোক বুকে ক'রে কেমন করে দিন কাটাব বাবা?

ঝ। শোক কি মা? মরণ কারো নাই—তবে অবস্থান্তর প্রাপ্তি। তুই চাষার মেয়ে, সে সকল বুঝিতে পার্ব্বিনে।

দ। তুই আমার রোজগারে বেটা ছেড়ে গেলি,—আমি কি খেয়ে থাক্‌বো? তোকে হারিয়ে আমার বুকখানা যে খালি পড়েছে—আর ত কোন কাজ কর্ম্মও কর্‌তে পাচ্চি না।

ঝ। মরণকালে ঐ ভেবেই ত সর্ব্বনাশ করেছি মা,—ওর বাঁধনেই ত ঘুরে বেড়াচ্চি মা! তা আমি এক মতলব ঠাউরিছি—শোন! আমার বাড়ীর পিছনে ঐ যে কুলগাছটা আছে—তুই ঐখানে বস্। আমি গাছে থাক্‌বো। তোর বার হ'বে, রোগী এলে আমি গাছ থেকে অষুদ বলে দেব প্রায়শ্চিত্ত ব'লে দেব। তাহ'লে লোকে তোকে বিশ্বাস ক'র্ব্বে, আর মানসার টাকা পয়সা দিয়ে যাবে। তখন আর খাওয়ার ভাবনা থাক্‌বে না। এইরূপ কিছুদিন গেলেই তোর অনেক টাকা হবে, তখন আমি তোর ভাবনা ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধরাজ্যে যেতে পারব।

তাই হইল। দরিদ্রা তাহার বাড়ীর পশ্চাতস্থ কুলবৃক্ষের তলায় বার তুলিয়া বসিল। পল্লীগ্রামে এরূপ বার হয় এবং বারে অনেক লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হয় ও রোগাদির কথা জানিয়া থাকে। দরিদ্রা ঐরূপ রোগী আসিলে কুলগাছের দিকে চাহিয়া রোগ হইবার কারণ ও সারিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিত। ঝড়োর প্রেতাত্মা তাহা তদ্দণ্ডেই বলিয়া দিত। লোকে কাহাকেও খুঁজিয়া পাইত না, অথচ স্বর শুনিতে পাইত। তার পর লোকের রোগও আরোগ্য হইতে লাগিল—অল্প-দিনের মধ্যে হাজরাখালির বার জাঁকিয়া বসিল। দরিদ্রা অল্পদিনের মধ্যে হাজার হাজার টাকা সঞ্চয় করিল।

এইরূপ এক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহার পরে আর ঝড়োর প্রেতাত্মা কথা কহিল না। দরিদ্রা তাহাতে শোকাকুলিত হইল,—সে বুঝিতে পারিল, তাহার ঝড়ো তাহাকে এই অর্থ সঞ্চয় করাইয়া দিয়া তাহার কথিত ঊর্দ্ধরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকের সাক্ষাতে তাহা আর প্রকাশ করিল না।

কুলগাছের উপর হইতে কথা বলা বন্ধ হইয়া গেল। লোকের রোগও

আর সারে না। কিন্তু বার ভাঙ্গিল না। এখন পর্য্যন্ত সে বার আছে কি না, জানি না। তবে দশ বার বৎসরের কথা হইল, আমরা সে বার দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তখন সে দরিদ্রা ছিল না, তৎপর বৎসরে সে তাহার পুত্রের দেশে চলিয়া গিয়াছিল। দরিদ্রার এক দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী—সেই বারের দেয়াসিনী পদাভিষিক্তা হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভূতের জল খেলা।

আজ কয়েক বৎসর গত হইল, কলিকাতার বহুবাজারের বাড়ী ভাড়া লইয়া কন্‌ট্রোলার পোষ্টাফিসের একজন কেরাণী বসবাস করিতেছিলেন। তিনি নিজ মুখে আমাদের নিকট যে গল্পটী করিয়াছিলেন, এস্থলে অবিকল তাহাই প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আমি যে বাড়ীতে ছিলাম, উহা দ্বিতল—নিম্নের তলে জলের কল, চৌবাচ্চা, রান্নাঘর প্রভৃতি, উপরে শয়ন ঘর। একদিন আফিসের কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে একটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি টানিয়া তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন এবং কিঞ্চিৎ জল সেবনের যোগাড় করিলেন। জলযোগাদি সমাপ্তে গল্প গুজব করিয়া বাসায় ফিরিতে আমার একটু রাত্রি হইয়াছিল। আমি বাসায় গিয়া দেখি, নিম্নতলে কেহ নাই, ভাবিলাম রান্না আদি করিয়া সকলে উপরে গিয়াছে,—প্রায় বেলা থাকিতেই আমাদের রান্না হইত।

আমি উপরে গেলে আমার স্ত্রী বলিল,—"আজি আর রান্না হয় নাই, আমরা ভয়ে নীচে যাইতে পারি নাই।" ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়,

আমার স্ত্রী ও ঝি বলিল, চৌবাচ্চায় জল ধরা ছিল—প্রায় এক চৌবাচ্চা, কিন্তু একটু এক্টু বেলা থাকিতে আমরা উপর হইতে শুনিতে পাইলাম, চৌবাচ্চার জলে ভয়ানক শব্দ হইতেছে,—যেন ঐ জল লইয়া কে ছিনাইতেছে,—আন্দোলন করিতেছে। উপর হইতে চাহিয়া দেখিলাম, নীচের জন প্রাণী বা কিছুই নাই। ভিতর হইতে দরজা যেমন বন্ধ করিয়া আমরা উপরে আসিয়াছিলাম, তেমনই বন্ধ করা ছিল। তারপরে শব্দ থামিলে ঝি নিচেয় গিয়া দেখিয়া আসিল, যেমন জল তেমনই আছে—একবিন্দুও পড়ে নাই। আমি বলিলাম, ও কিছুই নহে। বোধ হয় ড্রেণে কোন প্রকার শব্দ হইয়া থাকিবে। পাড়াগেঁয়ে মানুষ দুইটি তাহাই বিশ্বাস করিল,—ভাবিল ড্রেণে বুঝি ঐরূপ শব্দ হয়। আমারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেদিন আর রান্না হইল না—কারণ রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল—বাজার হইতে খাবার আনিয়াই সে রাত্রি চালান গেল।

তৎপর দিবস রাত্রি দেড় প্রহরের সময় আমরা সকলেই নিদ্রিত হইয়াছি,—যথারীতি দরজা বন্ধ ছিল। সহসা ঝী চীৎকার করিয়া উঠিল,—তাহার চীৎকার-ধ্বনি শ্রুত হইয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিলাম। ঝী বলিল,—বাবু ঐ শোন, আজি আবার সেই প্রকার চৌবাচ্চার জলে শব্দ হইতেছে,—আমিও সে শব্দ স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলাম, তাড়াতাড়ি নীচেয় গেলাম। গিয়া দেখি, কোথাও কিছু নাই—চৌবাচ্চার জল নিশ্চল।

তারপর প্রায় রাত্রেই শব্দ শুনিতে পাইতাম। কারণানুসন্ধানে বাড়ীর একটি লোক বলিল,—"মহাশয় আপনার পূর্ব্বে যাঁহারা ঐ বাড়ীতে ছিলেন, তাঁহাদের একটি এক বৎসরের ছেলে জলপূর্ণ ঐ চৌবাচ্চার জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়াছিল।" তারপরে অনেকের মুখেই

সেই কথা শুনিলাম, আমিও চারি পাঁচ দিনের মধ্যে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলাম।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভূতের আবেশ।

খুলনা জেলার একগ্রামে একঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা ধনে মানে সে পল্লীর মধ্যে নিতান্ত নগণ্য নহেন। কলিকাতা ঘেঁসা কোন বৰ্দ্ধিষ্ণু পল্লীতে সেই ব্রাহ্মণের এক পুত্রের বিবাহ হয়। পুত্রবধূ আধুনিক সভ্যতানুযায়ী শিক্ষিতা, কিন্তু নববধূ যখন শ্বশুরবাড়ী গমন করেন, তখন তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালাদেশে বিবাহ হইয়াছে—সে দেশের যেমন আচার, যেমন ব্যবহার, যেমন চালচলন, সব দেখিয়া শুনিয়া কাজ-কৰ্ম্ম করিবে, যেন দক্ষিণ দেশের মেয়ে বলিয়া ঠাট্টা না করে।

শ্বশুরবাড়ীর নিম্ন দিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া নদী বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। নববধূকে সেখান হইতে জল আনিতে হইত। একদিন সে জল আনিতে গিয়া কি দেখিয়া যেন মহা ভীতা হইল,—ভয় অত্যন্ত অধিক। সেই দিন হইতে তাহার ঘাটে যাইতে আর সাহস হইত না। কিন্তু পাছে দক্ষিণ দেশের মেয়ে কাজে অপটু বলিয়া কেহ ঠাট্টা করে ঐ একটি ভয়ের বায়না লইয়া জল আনিতে চাহিতেছে না বলিয়া কেহ তিরস্কার করে, এই ভয়ে সে কোন কথা না বলিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে জল আনিতে যাইত, কিন্তু ঘাটে গেলেই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত।

একদিন বৈকালে সে জল আনিতে গিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া, তীরে

কলসী ফেলিয়া ছুটিয়া বাড়ী আসিল এবং মূৰ্চ্ছিতা হইয়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেল।

বাড়ীর লোক সকলেই মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পাড়ার আর দশজন আসিয়া ছুটিয়া পড়িল—তখনই ডাক্তার, কবিরাজ ও ভূতের ওঝার ডাক হ'ল, সকলেই আপন আপন অভিজ্ঞতা ও মত চালাইতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন ভূতাবেশ বলিয়াই সকলের বিশ্বাস হইল।

ঐ গ্রামের একটু দূর গ্রামে একজন বিখ্যাত ওঝার বাস। তাঁহাকে আনিতে লোক গেল। তিনি আসিয়া ঝাড়ান কাড়ান করিতে—ভূত কথা কহিল। রোগীর মুখে ভূত বলিল,—"আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরই সেজো ছেলে হরিদাস। আমি অনেক দিন মরিয়াছি, কিন্তু আমার গতি হয় নাই। ঘাটের ধারে ধারে বেড়াইতাম। আমার মেজদাদার বউটি দেখিতে বেশ, আমার বড় পছন্দ হয়। তাই ওকে আমি পাইয়া বসিয়াছি।" তারপরে ওঝা ভূত তাড়াইয়া দেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আত্মার শান্তি।

রুষ সাম্রাজ্যের চতুর্থ নগরী ওদেসা (odessa) শ্যামসাগরের তটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালার উপরে অবস্থিত। ওদেসার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা তিন লক্ষেরও উপরে। সমুদ্রের তটে দরিদ্রগণের বাস এবং সমুদ্র হইতে একটু দূরে—পরিস্কৃত ও স্বাস্থ্যপূর্ণ স্থানে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ বসবাস করিয়া থাকেন।

ওদেসা নগরী কাষ্ঠের কারবারের জন্য বিখ্যাত,—অনেক ধনী ও মহাজনের বিস্তৃত কাষ্ঠের আড়ত ওদেসায় সংস্থাপিত। তাহারই এক কাষ্ঠের গোলায়—সেখানে রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠসকল স্তূপীকৃত করা থাকিত, সেই কাষ্ঠের উপরে বসিয়া প্রত্যহ একটি বৃদ্ধ, পথিকদিগের নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিত। দয়াপরবশ হইয়া পথিক-গণ—কেহ কেহ তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করিয়া যাইতেন—কেহ বা হাসিয়া কেহ বা টিটকারী দিয়াও ভিক্ষুককে আপ্যায়িত করিয়া গৃহে ফিরিতেন। ভিক্ষুক বয়সে বৃদ্ধ ও দুই চক্ষু হীন। অনেকে সেই অন্ধ ভিক্ষুকের সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচার করিয়া বেড়াইতেন—অনেকে বলি-তেন, বৃদ্ধ ভিক্ষুক বয়সকালে একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গুলি গালিয়া তাহার চক্ষু দুইটী অন্ধ হইয়া যায়। বৃদ্ধও সে গল্প শুনিত, কিন্তু তাহার প্রতিবাদে কখনও মনঃসংযোগ করে নাই—কাহাকেও সে কথা সত্য বলিয়া জ্ঞাপন করে নাই। সে সারাদিন ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিত। কোন কোন দিন ভিক্ষালব্ধ পয়সায় সামান্য আহার জুটিত, কোন দিন বা কেবল এক পয়সার সামান্য খাদ্য লইয়া গৃহে যাইত, তদ্দ্বারাই উদরজ্বালার কথঞ্চিত নিবৃত্তি করিয়া আত্মীয় স্বজনহীন ক্ষুদ্র কুটীরে নিশি যাপন করিত। এবং প্রভাতে উঠিয়া আসিয়া ভিক্ষার্থে সেই রাস্তার ধারে কাষ্ঠের উপর বসিত। জগতে তাহার অন্য কেহ ছিল না—যদি একটী ক্ষুদ্র বালক কিম্বা বালিকাও থাকিত, তবে তাহার হাত ধরিয়া নগরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিলে, সে হয় ত যাহা ভিক্ষা পাইত, তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ভোজন করিতে পারিত।

একদিন ঐরূপ সন্ধ্যার সময় অন্ধ বৃদ্ধ ভিখারী সামান্য কিঞ্চিৎ আহার্য্য লইয়া তাহার পর্ণকুটীরে ফিরিয়া আসিল। সে দিন অত্যন্ত শীত

পড়িয়াছিল—সে দেশের শীত—আমাদের দেশের লোকে অনুভবই করিতে পারে না। রুসিয়ার শীতে নদী জমিয়া যায়, স্ফটিক-নির্ম্মিত বিশাল-পরিসর রাজপথের মত শোভা পায়। জীবশরীরের শিরায় শোণিতের গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়,—দুঃসহ শৈত্যের মারাত্মক শীতল নিশ্বাসে মানুষের গায় ফোস্কা পড়ে। বৃদ্ধ কাষ্ঠের গোলা হইতে কতকগুলি কুচা ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কুটীর মধ্যে তাহাই জ্বালাইয়া বসিয়া শীতের রাত্রি কাটাইয়া দিতেছিল। সহসা সে শুনিতে পাইল—তাহার সেই কুটীরদ্বারে বালিকার কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত—অতি ক্ষীণ করুণ রোদনধ্বনি হইতেছে,—বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি দ্বারের নিকটে আসিয়া ডাকিয়া কাহারও সাড়া পাইল না,—তখন হস্ত বুলাইয়া দেখিল—এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারিল; একটী বালিকার অনাবৃত ও কঙ্কালসার দেহ ভূপতিত রহিয়াছে। শীতের অসহনীয় ক্লেশে তাহার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিতেছে—পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাইল না। বৃদ্ধ বুঝিল, তাহারই মত কোন হীনাবস্থা ব্যক্তির স্নেহের নিধি পথে পড়িয়া শীতের যন্ত্রণায় তনুত্যাগ করিতে বসিয়াছে—এবং অভাগিনী আশ্রয়ের জন্য তাহার দুয়ারে আসিয়াছে। বৃদ্ধের অন্ধ-নয়নে করুণার অমৃতধারা প্রবাহিত হইল,—সে বালিকাকে কোলে করিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া গেল—অগ্নির তাপে সেঁকিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ অগ্নির নিকটে রাখিয়া সেঁকিতে সেঁকিতে বালিকার দেহে বলসঞ্চার হইল,—দুঃখিনী বৃদ্ধের যত্নে জীবন লাভ করিল।

তৎপরদিবস বৃদ্ধ বালিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বালিকা তাহার পরিচয় দিল। সে বলিল,—বালিকার নাম পৌলেস্কা (Powleska); আমার বয়স দশবৎসর মাত্র। আমি পিতৃ-মাতৃ-বিহীনা—অন্নাভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই, কল্য কিছু যোটে নাই, পেটেও কিছু পড়ে নাই

—অধিকন্তু শীতের নিদারুণ প্রকোপে আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া মরিয়া যাইতেছিলাম,—আপনি দয়া না করিলে আমি মরিয়া যাইতাম। বৃদ্ধ একটি কথার কাঙ্গালী ছিল,—বালিকাকে পাইয়া অপত্য স্নেহে তাহার পর্ণ কুটীরে আশ্রয় প্রদান করিল। বালিকাও পিতৃস্নেহের কাঙ্গালিনী—সেও বৃদ্ধকে 'বাবা বাবা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং ক্রমে উভয়ে স্নেহ ভক্তির পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ আর কাষ্ঠের গোলার কাষ্ঠস্তূপের উপরে বসিয়া পথিকের নিকট ভিক্ষা করিত না,—বালিকাও পথে পথে ফিরিয়া উদরের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিত না। সে প্রত্যহ সকালে উঠিয়া বৃদ্ধের যষ্টি ধারণ করিয়া নগর মধ্যে লইয়া যাইত এবং উভয়ে ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিত; উভয়ে মিলিয়া রন্ধনাদি করিয়া আহার করিত এবং নিস্তব্ধ রজনীতে উজ্জ্বল অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া উভয়ে গল্প করিত—এবং প্রয়োজন হইলে সুখনিদ্রায় রজনী যাপন করিত,—এইরূপে তাহাদের পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

সহসা তাহাদের সুখের মন্দিরে আগুন লাগিল,—তাহাদের ভাগ্য-দেবতা আর এক খেলা খেলিয়া বসিলেন। একদিন বৃদ্ধের শরীর অসুস্থ হওয়াতে বালিকা একাকিনীই ভিক্ষার্থে গমন করিয়াছিল—এমন সে মধ্যে মধ্যে যাইত। সে দিন সে যে বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেই দিন সেই বাড়ীতে চুরি হইল। পুলিশ গৃহস্বামীর কথা অনুসারে পোলেস্কাকে ধৃত করিল এবং তাহার নিজের ঝুলি হইতে গৃহস্বামিনীর অপহৃত দ্রব্য বাহির করিল,—তাহার পরে চুরির প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইল বলিয়া, পুলিশ পোলেস্কাকে লইয়া হাজতে রাখিল। বৃদ্ধ পোলেস্কার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু সেই দিন হইতে অন্ধ ভিখারীকে কেহ দেখিতে পাইল না। ইহাতে পুলিশ অনুমান করিলেন,—অন্ধ ভিখারীও চোর। হয় ত এ চুরি

সেও করিয়াছে—এবং এরূপ অনেক চুরি ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। বালিকার দ্বারা সেই সকল চুরির কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কা করিয়া বৃদ্ধ গা-ঢাকা দিয়াছে। বৃদ্ধ কোথায় গিয়াছে বা কোথায় যাইবার সম্ভব ; সম্ভবতঃ পৌলেস্কা তাহা জানিতে পারে, তাহার নিকটে সে সন্ধান পাইলে তাহাকে ধৃত করা যাইবে—এই স্থির করিয়া পুলিশ পৌলেস্কাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে অন্ধভিখারীর বাড়ী ছিলে তাহার নাম কি ?

পৌ। লোকে তাঁহাকে মাইকেল বলিত।

ম্যা। সে কোথায় আছে বলিতে পার ?

পৌ। সে নাই।

বালিকা তিন দিন অবধি হাজতে আছে এবং তাহাকে যখন মাইকেলের বাড়ী হইতে আনয়ন করা হয়, তখন মাইকেল সেখানে উপস্থিত ছিল, একথা পুলিশ কর্ম্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে জানাইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"সে নাই কি বলিতেছ ?"

পৌ। হাঁ,—সে নাই, সে মরিয়াছে।

ম্যা। তুমি যখন তাহার বাড়ী হইতে আসিয়াছ বা পুলিশ যখন তোমাকে তাহার বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে তখন সে সেখানে উপস্থিত ছিল.—তারপর তুমি হাজতে আছ, তবে কি প্রকারে জানিতে পারিলে সে নাই ? তোমায় কে বলিল যে, সে মরিয়াছে ?

পৌ। কেহ বলে নাই।

ম্যা। তবে জানিলে কি প্রকারে যে সে মরিয়াছে ?

পৌ। আমি দেখিয়াছি।

ম্যা। হয় তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ, না হয় তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

পৌ। আপনার অনুমান ভুল হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

ম্যা। যদি প্রকৃতিস্থ ভাবে সত্য কথা বলিতেছ, তবে ইহা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? তুমি হাজতে থাকিয়া তাহা দেখিবে কি প্রকারে?

পৌ। তথাপি আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি। আমি সত্য ভিন্ন কখনও মিথ্যা বলি নাই এবং আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছি—ইহাও আপনি বিশ্বাস করুন।

ম্যা। তবে তোমার কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না কেন? ভাল করিয়া কথাটা বুঝাইয়া বল দেখি।

পৌ। আমি ভাল কথায় কিছু বলিতে পারিব না। তবে এই কথা সত্য বলিতেছি যে, তাঁহাকে হত্যা করিতে আমি দেখিয়াছি।

ম্যা। কি প্রকারে, কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা হত্যা হইয়াছে বলিতে পার?

পৌ। আমাকে যখন ধরিয়া আনে, তাহার একঘণ্টা পরে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।

ম্যা। ইহা অতি অসম্ভব কথা! তোমাকে ধরিয়া আনিবার একঘণ্টা পরে তাহাকে হত্যা করিলে, তুমি তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? তুমি ত তখন হাজতে। যাক্ সে কথা—তুমি কি চুরি করিয়াছিলে?

পৌ। আমি চুরি করিব কেন?

ম্যা। তোমার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে যে, চোরা মাল পাওয়া গিয়াছে?

পৌ। সে বিষয়ও আমি কিছু জানি না। কিন্তু মাইকেলের হত্যা আমি ভালরূপই জানি।

ম্যা। মাইকেল হত হইলে, তাহার মৃতদেহ পাওয়া যাইত ?

পৌ। আপনারা বোধ হয়, তাঁহার মৃতদেহের অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহার মৃতদেহ ত পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে পড়িয়া আছে।

ম্যা। কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, বলিতে পার ?

পৌ। হাঁ পারি,—একটি স্ত্রীলোক। আমাকে ধরিয়া আনিলে বৃদ্ধ মাইকেল দুঃখিত মনে পথ দিয়া জাহাজঘাট অভিমুখে চলিয়া যাইতেছিল, —ঐ স্ত্রীলোকটী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। তারপর, কিছু দূরে যাইয়া মাইকেল যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়াছেন,—আর অমনি ঐ স্ত্রীলোকটী একখানা ধূসর বর্ণের কাপড় দ্বারা মাইকেলের মুখ আচ্ছাদন করিয়া ফেলে এবং আট যায়গায় নিষ্ঠুররূপে ছুরির আঘাত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। তার পরে মৃতদেহ টানিয়া লইয়া পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে।

ম্যা। বাছা! বল দেখি, তুমি এ সকল কি প্রকারে জানিতে পারিলে ?

পৌ। তা বলিতে পারি না,—কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, ইহা নিশ্চয় সত্য। আপনারা পয়ঃপ্রণালীতে লোক পাঠাইলে মাইকেলের মৃতদেহ দেখিতে পাইবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট দেখিলেন, এ পরীক্ষা অতি সহজ। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তিনি তখনই পয়ঃপ্রণালীতে লোক পাঠাইয়া দিলেন।

রুষ রাজ্যের ড্রিষ্টার (Driester) নামক নদী ওদেসা নগর হইতে সপ্তবিংশতি মাইল দূরে অবস্থিত। ড্রিষ্টার হইতে Aqueduct অর্থাৎ পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা জল আনয়ন করা হয়, ওদেসাবাসিগণ ঐ জল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রেরিত লোক পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বালিকার

কথিতমত ধূসরবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত মাইকেলের মৃতদেহ দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ জানাইল।

মৃতদেহের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হইল,—পরীক্ষায় স্থির হইল উপর্য্যুপরি আট যায়গায় ছুরিকার ভীষণ আঘাত করিয়া মাইকেলকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলেন। বালিকাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি সত্য করিয়া বল, কি করিয়া এ সকল অবগত হইতে পারিলে।"

বা। তাহা আমি বলিতে পারি না, যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি।

ম্যা। ভাল, যে হত্যা করিয়াছে তাহার নাম বলিতে পার?

বা। তাহার নাম বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে স্ত্রীলোক তাঁহার দুইটী চক্ষু নষ্ট করিয়াছিল, সেই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।

ম্যা। যে মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করিয়াছিল, সেই রমণীই আবার তাহাকে হত্যা করিয়াছে? সেই পিশাচী কে? কিছুতেই কি তাহার নামটি বলিতে পারিবে না?

বা। আজ আর বলিতে পারিব না,—কা'ল পারিব।

ম্যা। কাল কি করিয়া বলিতে পারিবে?

বা। আজ রাত্রে সব কথা খুলিয়া বলিবেন বলিয়াছেন।

ম্যা। তিনি কে?

বা। কেন মাইকেল।

ম্যাজিষ্ট্রেট আর কোন কথা না বলিয়া বালিকাকে হাজতে পাঠাইয়া দিলেন। এবং বালিকা জানিতে না পারে, এরূপভাবে প্রহরীগণকে

বালিকার প্রতি বিশেষ সতর্কভাবে সারা রাত্রি প্রহরণাকার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। প্রহরীগণ সারা রাত্রি জাগিয়া বালিকার অলক্ষ্যে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিল।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন প্রহরীগণ দেখিতে পাইল, বালিকা যেন আধ ঘুমন্ত, আধ জাগন্ত, এলাইয়া পড়িল। এবং নানাবিধভাবে অঙ্গ সঞ্চালনাদি করিতে লাগিল। নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিয়া মানুষ এরূপ করিয়া থাকে। আর কিছুই কেহ জানিতে পারিল না। সকালেই প্রহরীগণ ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে উত্তমরূপে রিপোর্ট পাঠাইয়া দিল।

যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বালিকাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে রমণী মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করিয়াছে, তারপরে পাশবিক—অত্যাচারে নিহত করিয়াছে,—তাহাকে কি তুমি জানিতে পারিয়াছ? তাহার নাম কি, এখন বলিতে পারিবে কি?"

বা। হাঁ, তা পারিব।

ম্যা। তবে, আমি এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি তার উত্তর দাও।

বা। তাহাই হউক।

ম্যা। যে রমণী মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করিয়াছিল, মাইকেল জীবিত থাকিতে, কখনও তাহার নাম তুমি তাহার নিকটে শুনিয়াছিলে কি?

বা। না একদিন তিনি ঐ ঘটনা আমাকে বলিবেন বলিয়াছিলেন—তাহাতে ত এই বিপদ ঘটিয়াছে।

ম্যা। যে মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করিয়াছে, তারপরে এইরূপ পৈশাচিক ভাবে হত্যা করিয়াছে, তাহার নাম কি?

বা। তাহার নাম ক্যাথেরিণ। ক্যাথেরিণ মাইকেলের স্ত্রী। ল্যাকুই মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করে,—যে দিন মাইকেল তাহার ঐ কষ্টের কথা

আমার নিকট বলিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, সেইদিন ল্যাক্ লুকাইয়া তাহা শুনিয়া গিয়াছিল—আমরাও তখন দেখিতে পাইয়াছিলাম—একটা লোক যেন শাঁ করিয়া চলিয়া গেল।

ম্যা। চুরি—তোমার চুরির বিষয় কি?

বা। আমি চুরি করি নাই—চুরির বিষয় কিছু জানিতামও না। ল্যাক্ই ষড়মন্ত্র করিয়া এই বিপদে ফেলিয়াছে।

ম্যা। বটে,—আর কি জান, তুমি তাহা ভাল করিয়া বল।

কোর্টের সমস্ত লোকই নিস্তব্ধভাবে—বালিকার কথা শুনিতে লাগিল,—

"ক্যাথেরিণ মাইকেলকে পরিত্যাগ করিয়া অপর আর এক পুরুষের ভজনা করিয়াছিল তাহার নাম ল্যাক্। ক্যাথেরিণ ল্যাকের সহিত পলায়ন করিয়া দুজনে ওদেসায় বসতি করিতেছিল। সন্ধান পাইয়া মাইকেলও এখানে আগমন করেন এবং তাহাদের নামে অভিযোগ আনয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ক্যাথেরিণ একদিন মাইকেলকে দেখিতে পায়। দুষ্টা মনে করিল, মাইকেল নিশ্চয় তাহার সন্ধান পাইয়াছে এবং তাহাদেরই নামে অভিযোগ করিবার আয়োজন করিবে। তখন ক্যাথেরিণ ল্যাকের সাহায্যে মাইকেলকে অন্ধ করিয়া দিল। একদা মাইকেল নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময় ল্যাক্ দগ্ধ শলাকাদ্বারা তাঁহার চক্ষু দুইটি পোড়াইয়া দেয় এবং তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্থানে রাখিয়া আইসে।

তারপর তিনি অন্ধ ভিখারী হইয়া যখন ওদেসায় পরিচিত হইলেন, তখনও ল্যাক্ ও ক্যাথেরিণ তাঁহার উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিল,—মাইকেল যে দিন আমাকে তাঁহার অন্ধ হইবার কারণ বলিবেন বলিয়াছেন, সেই দিবস উহারা ঐ কথা জানিতে পারে—এবং তাহাই বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ হয়। ঐরূপ কথোপকথনের পরে আমি ভিক্ষা করিতে ক্যাথে-

রিণের বাড়ী যাই,—ক্যাথেরিণ আমাকে মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়া এবং কৌশলে আমার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে তাহার পাত্র পূরিয়া দিয়া আমাকে হাজতে পাঠায়,—তারপরে পিশাচী স্বহস্তে মাইকেলকে হত্যা করে। যেরূপে হত্যা করে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।”

ম্যা। এ সকল কথা কি সত্য সত্যই মাইকেল তোমাকে বলিয়াছেন ?

বা। হাঁ, মাইকেল ভিন্ন আর কে বলিবে? মাইকেলই বলিয়াছেন। আমি যে দিন হাজতে আসি, সেই দিনই তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, —তিনি দেখা দিয়াছিলেন। কাল রাত্রেও দেখা দিয়া সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম তিনি বড় কাতর! মুখ পিঙ্গলবর্ণ,—সমস্ত শরীর রক্তমাখা। তিনি তাঁহার হত্যার কথা আপনাকে বলিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—বলিয়াছেন ল্যাক্ ও ক্যাথেরিণ দণ্ড পাইলে তবে আমার শান্তি হইবে।

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে ল্যাক্ ও ক্যাথেরিণ ধৃত হইয়া বিচারালয়ে আনীত হইল। প্রথমে তাহারা অপরাধ স্বীকার করে নাই,—অবশেষে নিতান্ত পীড়াপীড়িতে তাহারা অপরাধ স্বীকার করিল। সাক্ষী দ্বারা প্রকাশ পাইল,—খারসান নামক স্থানে ক্যাথেরিণের সহিত মাইকেলের বিবাহ হইয়াছিল এবং ক্যাথ্যেরিণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য ক্যাথেরিণ ও ল্যাক্ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দায়রা সোপর্দ্দ হইল এবং জুরিগণের বিচারে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ভূতের চেয়ার।

মার্চ্চ মাস,—১৬১৭ খৃষ্টীয়াব্দ। উইটেনবার্গ সহরের পূর্ব্বপার্শ্বে এক পান্থশালায় কয়েকজন লোক বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিল,—রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সে দিন ভারি শীত,—পথে তুষার পড়িয়া রাস্তায় গমনাগমন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তত রাত্রে আর কোন পথিক আসিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া তাহারা পান্থনিবাসের দরজা বন্ধ করিয়া গল্প গুজব করিতেছিল। এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া সদর দরজায় আঘাত করিতে লাগিল।

পান্থনিবাসের অধিকারী হারম্যান্ বয়সে বৃদ্ধ ও সৌজন্যে প্রসিদ্ধ। দরজায় আঘাত-শব্দ শ্রুত হইয়াই তিনি একজন ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য দরজা খুলিয়া দিয়া আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিল। আগন্তুকের নাম মিঃ সিমসন্। সিমসন্ বলিলেন,—"আমার চেয়েও আমার ঘোড়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে,—আগে উহাকে যত্ন করিবার প্রয়োজন।" ভৃত্য সে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সিমসন্‌কে সঙ্গে লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

সিমসন্ একজন ধনীর সন্তান—এবং সম্ভ্রান্ত। হারম্যান্ তাঁহাকে চিনিতেন।

হারম্যান্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এতরাত্রে কোথা হইতে।"

সিমসন্ বলিলেন শীতে বড় ক্লান্ত হইয়াছি। একটু বিশ্রাম না করিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছি না।

হারম্যান্ তখনই ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট সুরা ও খাদ্য আনিতে আদেশ

করিলেন। ভৃত্য আদেশ পালন করিলে, পানভোজন করিয়া সিমসন্ বলিলেন,—"এখন একটু সুস্থ হইয়াছি। আমি কোমবার্গে বিশেষ প্রয়োজন জন্য গমন করিয়াছিলাম; এবং বিশেষ কার্য্য জন্য আমাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইতেছে।"

হারম্যান্ বলিলেন,—"বোধ হয়, আপনার সমধিক ক্লান্তি জন্মিয়াছে। শয়ন করিবেন কি ?"

"হাঁ—আমাকে একটু নিভৃত স্থান দিতে হইবে।" সিমসন্ এই কথা বলিলে হারম্যান্ একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—"আজ আমার হোটেলে লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—খালি ঘর আর নাই।"

সিমসন্ বলিলেন,—"আমি আপনাকে এক গিনি দিব, একটি ঘর চাই।"

ভৃত্য বলিল, "কেন দশ নম্বর ঘর খালি আছে।" হারম্যান একটু বিরক্ত হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন,—"তোর কথায় কাজ কিরে? আমি তোকে পুনঃপুনঃই বলি, তুই আমার কথায় কথা কহিস্ না,—কিন্তু তা তুই শুনিস্ না।"

সিমসন্ জিদ করিলেন,—"দশ নম্বর ঘরই আমাকে দিতে হইবে। না হয়, দুই গিনি লইবেন।"

হারম্যান্ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দশ নম্বর ঘর খুলিয়া সিমসন্‌কে শয্যা দেখাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—এই ঘরের ঐ কোণের চেয়ার খানার কাঠ কি রমক খারাপ আছে—রাত্রে মধ্যে মধ্যে কট্‌কট্ করিতে থাকে, ভরসা করি আপনি তাহাতে বিচলিত হইবেন না।

সিমসন্ হাসিয়া বলিলেন, "কাঠের কট্‌কট্ শব্দে ভীত হইব, আপনি আমাকে এতই ভীরু বলিয়া ভাবেন।" হারম্যান্ বলিলেন, অনেকে ভয় পান কি না,—তাই কথাটা বলিয়া রাখিলাম।"

হারম্যান্ চলিয়া গেলে সিমসন্ শয়ন করিলেন। পথশ্রান্তি বশতঃ শীঘ্রই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল,—কিন্তু চেয়ারের শব্দে সিমসনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। সে শব্দ ভীতি-জনক করুণা গাথা।

সিমসন্ উঠিয়া বসিলেন,—এক দৃষ্টে চেয়ারের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দেখিলেন,—চেয়ারখানি পুনঃপুনঃ নড়িতে লাগিল ও সেই প্রকারের শব্দ করিতে লাগিল।

সিমসন্ প্রেততত্ত্বে আস্থাবান ছিলেন। তিনি চেয়ারের অতি সন্নিকটে গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে বলিলেন—"আপনি বোধ হয় কোন মুক্তাত্মা, দয়া করিয়া আপনি আপনার পরিচয় বলুন ?"

চেয়ার হইতে মানুষ কণ্ঠস্বরে কথা কহিল,—"কেহ এতদিন এ কথা সুধায় নাই। কত জনের নিকট এমন করিয়াছি। তুমি দীর্ঘজীবী হও—আমি একজন ধনী য়িহুদী। আমি এই পান্থনিবাসে আশ্রয় লই,—হারম্যান্ আমাকে হত্যা করিয়া, আমার দলিল-পত্র লইয়া উহা চারি নম্বর লৌহসিন্ধুকে রাখিয়াছে, কেবল সেই গুলির জন্য আমি আবদ্ধ আছি,—আমার অনেক টাকা আছে, টাকার দলিলপত্র আমার নিকটে ছিল,—সেইগুলি লইবার জন্য হারম্যান্ আমাকে হত্যা করে,—হারম্যান্ এমনি কাজ মধ্যে মধ্যে করে। এই চেয়ারে আমি বসিয়াছিলাম—এই চেয়ারে বসিয়াই আমি নিষ্ঠুররূপে নিহত হই। হারম্যান্ চেয়ারখানিকে কতদিন ফেলিয়া দিয়াছে,—আমি আবার লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে সিমসন্; আমার একটা অনুরোধ রাখ,—তুমি ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই সংবাদ জানাও। সিন্ধুকে আমার দলিল পত্র সমস্ত পাইবে। আর এই হোটেলের ভিতর ফলের বাগানের মধ্যে আমার মৃতদেহ একটা নিচুগাছের তলে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। পুলিশ আমার অনুসন্ধানে লিপ্ত আছে, মোটে ছয়মাস আমাকে নিহত করিয়াছে,—এখনও পুলিশের সন্ধান শেষ হয় নাই

বলিয়া হারম্যান্ আমার দলিলপত্র বাহির করিয়া টাকা লইতে পারিতেছে না। আমার টাকাগুলি তুমি লইও,—টাকা আসল সয়তান, একজনের ঘাড়ে চাপাইয়া গেলে বড় টান থাকে—বল সিমসন্! টাকাগুলি তুমি লইবে? টাকাও কম নয়,—তিনটা বাক্সে দুই কোটি টাকা আছে, কিন্তু আমার কেহ নাই।

সিমসন্ বলিলেন,—"আপনার সমস্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। কিন্তু টাকা আমাকে দিবেন কেন? আমিত আপনার উত্তরাধিকারী নহি।"

চেয়ার হইতে আবার কথা হইল,—হারম্যানের সিন্ধুকে যে দলিল আছে, তাহার মধ্যে আমার উইল আছে, উইলে লেখা আছে, আমার লিখিত স্বহস্ত-খোদিত তাম্রফলক যে দেখাইবে, সেই আমার উত্তরাধিকারী। ঐ ফলকখানি আমার বাড়ীতে আমার শয়ন কক্ষের পশ্চিম কোণে পোঁতা আছে,—তুলিয়া আনিও। আমার বাড়ী উইটানবার্গে—আমার পার্থিব নাম * *।"

সকম্পিত হৃদয়ে সারারাত্রি জাগিয়া সিমসন্ সাহেব প্রত্যূষে উঠিয়া পান্থশালা হইতে বিদায় লইলেন এবং যথাসময়ে আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক হারম্যান্‌কে ধরাইয়া দিলেন। য়িহুদীর দেহ পাওয়া গেল,—দলিলগুলি মিলিয়া গেল, কিন্তু প্রমাণাভাবে হারম্যান্‌কে খুনের দায়ে দণ্ডিত হইতে হইল না।

সিমসন্ য়িহুদীর উইল সূত্রে টাকা বাহির করিয়া লইয়া একটি ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই অবধি আর কেহ সে চেয়ারের কোন শব্দ শুনিতে পায় নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রেতাদি দর্শন।

শিষ্য। পরলোকগত আত্মার দর্শন এবং মৃত্যুকালে সূক্ষ্ম দেহীর বাহির হইয়া যাওয়া কি প্রকারে দৃষ্ট হয়?

গুরু। আমাদের এই স্থূল চক্ষে তাহা দৃষ্ট হইবার নহে। তাহার জন্য অধ্যাত্ম চক্ষু লাভ করার প্রয়োজন। কারণ স্থূল পদার্থই স্থূল পদার্থ দ্বারা দেখা যায়। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শন করিতে চাহিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—তোমার স্থূল চক্ষু স্থূলই দেখিতে পাইবে। অধ্যাত্ম চক্ষু লাভ না করিলে কেহই অধ্যাত্ম বিষয় দর্শন করিতে পারে না।

> ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা।
> দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ গীতাঃ—:৬৷৮॥

তুমি স্বীয় চক্ষুদ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করি; তুমি তদ্দ্বারা আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর।

এই দিব্য বা অধ্যাত্ম চক্ষু লাভ করিতে না পারিলে, অধ্যাত্ম জগতে কোন কার্য্যই দর্শন করা যায় না।

শিষ্য। কি প্রকারে দিব্য চক্ষু লাভ করিতে পারা যায়?

গুরু। যোগ-সাধনা দ্বারা মানবগণ এই ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। সে যোগ-সাধনা কি প্রকারে হয়?

গুরু। তাহা এখানকার আলোচ্য নহে; তবে এই কথা জানিয়া রাখ যে, যোগ অভ্যাস দ্বারা অশেষবিধ অদ্ভুত, অসাধ্য ও অভাবনীয় শক্তি জন্মে। যোগ সিদ্ধ হইলে বাক্‌সিদ্ধি, সূক্ষ্মদেহের ইচ্ছানুসারে গমনাগমন, দূর-দৃষ্টি, দূর-শ্রবণ, অতি সূক্ষ্ম-দর্শন, ভূঃ ও স্বর্গলোকের সমস্ত পরিদর্শন, অপরের শরীরে প্রবেশ, অন্তর্দ্ধান, অন্তর্য্যামিত্ব, শূন্যপথে অবিরোধে ও অনায়াসে ভ্রমণ, কায়-ব্যূহ-দেহ-ধারণ, অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি-প্রাপ্তি, দেব-তুল্যতা ও মৃত্যুঞ্জয়ত্ব-লাভ ইত্যাদি—ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডে যোগীর অসাধ্য আর কিছুই থাকে না।

শিষ্য। তবে আমাকে সেই যোগ শিক্ষা দিন।

গুরু। পরে দিব।

শিষ্য। তবে এক্ষণে পরলোকের সংবাদ আদি কিছুই পাওয়া যাইতে পারিবে না?

গুরু। কেন পারিবে না?

শিষ্য। কি প্রকারে পারিব?

গুরু। যোগিগণ যে সকল সহজ নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, সেই নিয়মে—সেই কৌশলে প্রেতদিগকে দেখা, নামান ও কথা শ্রবণ প্রভৃতি করা যাইবে। কিন্তু এই সমুদয় করিতে হইলেও সাত্ত্বিক আহারের এবং সদাচারের প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন সুচারুরূপে এ সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অতএব অম্ল, রুক্ষ, কটু, লবণ, সর্ষপতৈলাদি দ্রব্য, অধিক

ভ্রমণ, পরস্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গ বা অধিক স্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবন, বহু আলাপ-করণ, অতিশয় ভোজন, তাম্বূল ভোজন, মৎস্য-মাংসসেবন ইত্যাদি একেবারে বর্জ্জন করিবে। পরনিন্দা, কুৎসা, পরের প্রতি রাগ-দ্বেষ, পরের মনে ব্যথা দেওয়া প্রভৃতি একেবারে বর্জ্জনীয়। ঘৃত, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, রম্ভা, আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি ভোজন করিবে এবং বিষাদ বিরহিত, সদানন্দিত, হৃষ্ট, সর্ব্বদা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানরত, পাপবর্জ্জিত কার্য্যাদিসম্পন্নশীল হইতে হয়।

শিষ্য। আপনি কি মেস্‌মেরিজম্, ক্লারিভয়েন্স, হিপ্‌নটিক প্রভৃতির কথা বলিতেছেন?

গুরু। হাঁ, তাহাও বলিতেছি। তদ্ভিন্ন আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে আরও সরল ও সহজ উপায় সকল আছে, সে সমুদয় যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত। তবে এই দেখায়, আর দিব্য চক্ষুতে দেখায় প্রভেদ এই যে, স্থূল চক্ষুতে দেখিতে হইলে, কোন বস্তু বা মনুষ্য প্রভৃতির উপরে প্রেতকে আবিষ্ট করিয়া পরোক্ষভাব দর্শন করিতে হয়, আর দিব্য চক্ষুতে আমাদের আশে পাশে অসংখ্য আত্মিকের গমনাগমন দেখা যায়।

শিষ্য। ভাল, যে সকল ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ এই সকল বিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহারাও কি আপনার কথিতমত সাত্ত্বিক আহারাদি করিয়া থাকেন?

গুরু। নিশ্চয়ই, নতুবা এ শক্তি লাভই হয় না।

শিষ্য। এক্ষণে তবে মেস্‌মেরিজম্ প্রভৃতি কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব।

Philosophy of Psychology.

গুরু। সে বিষয় জানিবার আগে, মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শুনিয়া রাখ। অসংখ্য পদার্থ সংযোগে মনুষ্যদেহ গঠিত হয়। অনেকগুলি আধ্যাত্মিক শক্তি সমবেত হইয়া, এই সকল জড়কে আপনার ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যের উপযোগী করিয়া গঠিয়া লয়। দৈহিক উপাদান সমূহ এক একটি সম্পূর্ণ মণ্ডল হইলেও পরস্পরের নিকট পরস্পর নির্ভরত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। অস্থি, পেশী, স্নায়ু, রক্ত প্রভৃতি আপন আপন কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও সমবেত বা সাকল্য দেহ-ধর্ম্ম সাধনে পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে এবং নিম্নতর দেহবৃত্তি সকল উচ্চতর দেহবৃত্তির অধীন ও আজ্ঞাবহ হইয়া কার্য্য করে। এইরূপে মানবের সমগ্র দেহবৃত্তির ভিতর পরস্পরের শক্তি ও প্রভাবের আদান প্রদান পরিলক্ষিত হয়।

ভালবাসা, বাসনা, অনুভূতি, কল্পনা, তুলনা, বিচারশক্তি প্রভৃতি বৃত্তি মনুষ্যের মৌলিক অধিকারিণী। মানুষ বা অন্তরাত্মা বলিলেই আমরা পূর্ব্বোক্ত গুণ বা বৃত্তি সম্পন্ন কোন সত্বাকে বুঝাইয়া থাকি। এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবকে দেহের সহস্র বর্ত্ম দিয়া প্রধাবিত হইতে দেখা যায়। দেহ জননের পূর্ব্বে ঐ শক্তি ভ্রূণের অস্থি বা তাদৃশ কোন ধাতুগত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার পর ক্রমবিকাশ সূত্রের বশবর্ত্তী হইয়া স্নায়ুপেশী প্রভৃতিরূপে গঠনকারী জীবনীশক্তিতে পরিণত হয় ও তাহার পর দৈহিক জড়াত্মিক তত্ত্বের ঊর্দ্ধতর সকল অবলম্বন করিয়া, অনুভব-যন্ত্র অনু-

ভূতি ও অনুভূত বাহ্যিক জগতের সৃষ্টি করিয়া দেয়। দেহের অস্থি পেশীর বন্ধন,—আত্মার ভালবাসার বন্ধন; তাই তাহাকে খুলিতে পারা যায় না। যে সকল তত্ত্ব উপাদানে মনুষ্যদেহ গঠিত হয়, সেগুলি শুধু যে, অন্তরাত্মার বা ভিতরের মানুষের ইচ্ছাশক্তি ক্রমে বিকশিত হয়, এরূপ নহে; সে গুলি আজীবনই অন্তরাত্মার শাসনকর্তৃত্ব মানিয়া চলে। সুতরাং মনুষ্য-দেহকে পরমাত্মাপ্রণোদিত ব্রহ্মাণ্ডের অনুকরণে জীবাত্মাচালিত অপর একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। মনুষ্যদেহ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত সার। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর একটি পূর্ণ পূর্ণায়ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড।

জীবাত্মা পূর্ণভাবে স্বাধীন সত্ত্বা হইলেও পিতৃ-পিতামহ বা বংশপর-ম্পরাগত সংস্কারের হাত ছাড়াইতে পারেন না। পিতা মাতার চরিত্র-লক্ষণ কিছু না কিছু সন্তানে প্রতিফলিত হইবেই হইবে। যে সন্তানে পিতৃ-পিতামহগত কোন বিশিষ্ট বৃত্তি অসামান্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, আমরা তাহাকে ক্ষণজন্মা বলিয়া থাকি। কবি জ্যোতিষী বা গণিতশাস্ত্রবিদ্‌গণের সিদ্ধি-সাধনা দেখিলে, আমরা তাঁহাদিগকে অনৈসর্গিক মানুষ বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। কালিদাস—ভারতীয় বরপুত্র, এ কথাটা এদেশে পারিবারিক সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাবিয়া দেখিলে, জগতে অপ্রাকৃতিক বা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সন্ধান করিলে সকল বিষয়েই খুব প্রাকৃতিক স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কার্য্যকর কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি, ভ্রূণাবস্থায়ও মনুষ্যদেহ আধ্যাত্মিক শক্তির সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। এক্ষণে মানবের অপর একটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিব। অনেকেই দেখিয়াছেন, কোনরূপ প্রক্রিয়া বিশেষের গুণে মানুষের একরূপ বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়,

অথচ তাহার আভ্যন্তরিক জ্ঞান পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মানুষ তখন দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দেয়, হাসে, গান গায়। এই অবস্থার নাম আধ্যাত্মিক নিদ্রা বা (Somnambulism) বহুদিনের জীর্ণ ব্যাধি ভোগ করিলে এ অবস্থার উদ্রেক হইতে দেখা গিয়াছে। বহুদিনের পীড়ায় স্নায়ুমণ্ডলী এত সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত হইয়া উঠে যে, মানবের অনেক সময় দীর্ঘকালস্থায়ী অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে।

এই অবস্থায় দেহ আংশিকভাবে মনের ও আংশিকভাবে বাহ্য জগতের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। এই অবস্থা উৎপাদন করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বা গুরু-সাহায্যের প্রয়োজন হয়। শিষ্যের মনোবৃত্তি যে জাতীয় হইবে, গুরুর তাহার বিপরীত হওয়া চাই। যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের তাড়িৎ-শক্তির সংযোগ না হইলে, তাড়িৎ ক্রিয়ার সঞ্চার হয় না, সেইরূপ দুইটি বিভিন্ন জাতীয় আধ্যাত্মিক শক্তির মিলন না হইলে, এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উন্মেষ অসম্ভব। এই অবস্থায় মানব অপরের কথা জানিতে পারে। বহুকাল-বিস্মৃত ঘটনাবলী মনে জাগিতে থাকে, এমন কি সে গৃহে সে সময়ে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের মনোভাব সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিবার তাহার ক্ষমতা জন্মায়। কিন্তু এ সকল ক্ষমতা বা সমবেত মণ্ডলীর প্রভাব জন্য। গুরু বা উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী যে সময়ে যে সকল বা যেরূপ চিন্তা করেন, কোন অজ্ঞেয় সূক্ষ্মানুভূতির বলে যোগ-নিদ্রিত (Somnambulist) ব্যক্তি তাহাই আবৃত্তি করেন। এই জন্যই, এ অবস্থায় এক বিষয়ের বৃত্তান্ত বা বিবরণ কোন দুই জন নিদ্রিতের প্রায় সমান দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বায়ত্ত বা স্বাধীন যোগনিদ্রা (Voluntary Somnambulism). খুব অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ইহা সকল প্রকৃতির লোকের হইতে পারে না। যে মানুষ সুস্থশরীরে স্বচ্ছন্দ মনে ঈশ্বরের নিয়ম

প্রতিপালন করেন, তিনিই কেবল এ শক্তির অধিকারী। দুই প্রকার উপায়ে এই নিদ্রার আবির্ভাব করান যাইতে পারে ;—

প্রথমতঃ—নিরন্তর এই গূঢ় ক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইলে ক্রমশঃ চিত্তের একাগ্রতা ও প্রশান্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং এরূপ একাগ্রতার চরম উন্নতি হইলে বাহ্য স্মৃতি লুপ্ত হইয়া আভ্যন্তরিক স্মৃতির বিকাশ হইয়া থাকে ; এবং সেই জন্যই ভিতরকার মানুষের জীবন-ইতিহাসে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। জীবাত্মা কোন জন্মে যাহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করেন নাই, এমন কোন বিষয় এ অবস্থায় তাঁহার স্মরণারূঢ় হয় না।

দ্বিতীয়তঃ—চিত্ত, স্বাস্থ্য ও আনুসঙ্গিক ব্যোম (Ether) এ অবস্থায় উপযোগী হইলে, চিত্ত এইরূপ নিয়ত সাধনায় অত্যন্ত মার্জ্জিত হইয়া উঠে। এ অবস্থায় জীবাত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া দেহ ও দেহাতীত সূক্ষ্ম কারণের রাজ্যে যুগপৎ অবস্থিতি করিতে পারেন এবং মন ও শরীর, অনুভূতি ও ভাব পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া, জীবাত্মা মনুষ্য শরীরের যাহা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অতীন্দ্রিয় অবস্থায়ও স্মৃতিপথে জাগিতে থাকে। মনুষ্যজন্মে জীবাত্মার শরীরানুযায়ী অনুভূতি হয়। সুতরাং যোগনিদ্রায় আত্মা দেহ ভেদিয়া ঊর্দ্ধরাজ্যে পরিভ্রমণ করেন বলিয়া, জড়াত্মিক দেহের একরূপ ক্ষণিক ধ্বংস হইয়া থাকে এবং অনেক অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জীবাত্মার প্রত্যক্ষানুভূত হয়।

সকল দেশে সকল সমাজেই এইরূপ শক্তিশালী মানব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এ ক্ষমতা মনুষ্য মাত্রেরই বর্ত্তমান আছে। মানুষ মনে করিলেই উপযুক্ত শিক্ষার বলে, এ শক্তির পূর্ণবিকাশ করিতে পারে। ইহাতে কোন দৈবী আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন করে না। ঈশ্বরের মানস-পুত্র হইলেও সাধারণ মানব অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

এ কথার সমর্থনার্থে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা অপ্রয়োজন। নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে ;—

১। মনুষ্য-শরীর একটি সম্পূর্ণ মণ্ডল বলিয়া তাহার সমস্ত নিয়তত্ত্ব-গুলির তাড়িৎ, চৌম্বকিক ও সহানুভূতিক ব্যাপারের ভিতর পরস্পর নির্ভরত্ব লক্ষিত হয় এবং তাহার মানসিক জগতেও সেই নিয়ম। সুতরাং দেহের প্রাথমিক অবস্থায় সমস্ত ভ্রূণশরীর, চিত্তের দ্বারাই চৌম্বকিক শক্তি পূর্ণ হয় ; এবং সকল দৈহিক অবস্থায়ই মন বা চিত্ত হইতে চৌম্বকিক শক্তির উদ্ভব ও বিকাশ হইয়া থাকে।

২। স্বকীয় জন্ম, পিতৃ-বংশ, জীবনের ঘটনা ও মানসিক চিন্তা অনুসারে যেমন আভ্যন্তরিক বা জীবনী সত্তার পরিবর্ত্তন হয়, সেইরূপ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায় মনের সহানুভূতি ও চৌম্বকিক শক্তির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং এইরূপ পরিবর্ত্তন বা আধ্যাত্মিক নিদ্রাকালে বাহ্য ঘটনায় চিত্তের চৌম্বকিক স্রোতের পরিবর্ত্তন হয়।

৩। দেহ ও মন যেমন ক্রমান্বয়ে বাহ্য পদার্থের সহিত চৌম্বকিক ও সহানুভূতির শৃঙ্খলে দৃঢ় বদ্ধ, সেইরূপ বাহ্যিক ঘটনা ও আধ্যাত্মিক বা প্রেত সত্বা (যাহা এককালে মনুষ্যজন্ম উপভোগ করিয়াছে) মনের উপর চৌম্বকিক শক্তির বলে কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের অনুভূতির সহিত কর্ম্মীর মনও সহানুভূতি করিয়া থাকে। যে সকল প্রভাবে এই উন্নত অবস্থায় মনের উচ্চ সহানুভূতি বা চৌম্বকিক ক্রিয়া সংসাধিত হইতে থাকে, তাহা স্বাধীন, পবিত্র এবং দেবাত্মিক।

১। তাহার পর আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বিভাগেই যখন সমস্ত তত্ত্ব পরস্পরের মুখাপেক্ষী, যখন তাহাদের পরস্পরের অন্তর্নির্ভরত্ব আছে, তখন "স্বাধীন" এই শব্দটি অনেকটা নিরর্থক। মানুষের প্রকৃতি-

গত ভেদ আছে বলিয়াই সমবেত বৃত্তি বা ক্ষমতাগত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপ ক্ষমতাগত সত্ত্বেও সকল মানবেরই উন্নতজীবন লাভ করিবার ক্ষমতা আছে।

২। আধ্যাত্মিক নিদ্রা (Somnambulism) গুরু বা অপরের কর্ত্তৃত্ব সাপেক্ষ বলিয়া, সে অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি যাহা বলেন, তাহা সকল সময়ে অভ্রান্ত সত্য না হইতে পারে। কারণ, সে অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি গুরু বা কর্ম্মীর মনোভাব সকলই ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

৩। সমস্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তির চরমোৎকর্ষ না হইলে উন্নত যোগনিদ্রার আবির্ভাব হয় না। এ অবস্থা লাভ করিতে হইলে সমস্ত পশুবৃত্তি দমন করিয়া ভিতরের বা যথার্থ মানুষকে পরিস্ফুট করিতে হইবে। যোগীর মনোবৃত্তি অনুসারে এ অবস্থায় অলৌকিক শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। কেহ রোগ নিবারণ করিতে শিখেন, কাহারও ভবিষ্যৎ বাণীর ক্ষমতা হয়, কেহ বা আধ্যাত্মিক পুরুষগণের সংসর্গ লাভে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয়েন।

এ অবস্থায় উপস্থিত হইলেও মানুষ ক্রম-বিকাশ-বিধির অতীত হইতে পারে না। যোগ সাধনা করিয়া প্রথম সমাধি অবস্থায় মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া যতই এ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই আত্মার আধ্যাত্মিক সত্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়,—ততই তাহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকে। যাঁহারা স্বীয় পবিত্রতার বলে সমাধি-সিদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সে সকল গূঢ়তত্ত্ব প্রয়োগক্ষেত্রে যোগীর আত্মাগত চরিত্র ও প্রকৃতির বিকাশ এবং আত্মিক উন্নতির উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা সংস্কারের মধ্যে

অনেক প্রভেদ। প্রথমাবস্থায় চিত্রের একাগ্রতা বলে মনকে বাহ্য জগৎ হইতে অপসৃত করিতে হয়। এইরূপ করিলে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ হইতে একরূপ সূক্ষ্ম আলোক পদার্থ বিনির্গত হইয়া, বিশ্বাবরক তাড়িতালোকের সহিত মিশিয়া যায়। সূর্য্যালোক ভিন্ন যেমন দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে পারে না, সেইরূপ আলোক অভাবে মানস বা আধ্যাত্মিক চক্ষুর ক্রিয়াও তুল্যরূপে অসম্ভব। মনে কর, কর্ম্মীর ইচ্ছা হইল গৃহে বসিয়া তাঁহার কোন দূরস্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। চিত্তের একাগ্রতা হইলে, সেইরূপ মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ নিঃসৃত আলোক, বিশ্বব্যাপী তাড়িতালোকের সহিত মিলিয়া অভীষ্ট ব্যক্তির উপর পতিত হয়। তখন তাঁহার সমুদয় কার্য্য কলাপ চর্ম্মচক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। অন্য পক্ষে, আধ্যাত্মিক সংস্কার যৌগিক অবস্থায় বাহ্যবস্তু হইতে মনকে পূর্ণরূপ আকৃষ্ট করিয়া সংসাধিত হইলেও, আধ্যাত্মিক আলোক-চ্ছটা মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ হইতে উত্থিত না হইয়া মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ হইতে উত্থিত হইয়া থাকে এবং তাহা কেবল পৃথিবীস্থ স্থানের উপর প্রেরিত না হইয়া ঊর্দ্ধাকাশব্যাপী আধ্যাত্মিক আলোক সাগরে নিমগ্ন হয়। এই আধ্যাত্মিক আলোক সংস্কার দেবতা বা আত্মিক পুরুষবর্গের সমবেত জ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা সকল জ্ঞানের পরিণামভূমি। সুতরাং এই জ্ঞানালোকের সহিত আপনার বুদ্ধিবৃত্তিমূলক সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক-চ্ছটা মিশাইতে পারিলেই, মনুষ্য জ্ঞানাতীত বিষয় সকল অনুভব করিতে পারে।

এই তথ্য সম্বন্ধে ডাক্তার এণ্ড্রু ডেভিস্ জ্যাক্সন্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে নিম্ন বৃত্তান্তটী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন,—আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের নিম্নতম স্তর হইতে আমি অতি শীঘ্রই ঊর্দ্ধতন স্তরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি চিকিৎসা ব্যবসায় করিতাম, সুতরাং নিদান, শরীরতত্ত্ব

প্রভৃতির চর্চ্চায় আমার দিন অতিবাহিত হইত। এইরূপ অর্দ্ধ-সমাধির অবস্থায় এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে আমি অনেক অনুভব করিতে পারিতাম। কিন্তু সে অবস্থা নষ্ট হইলে আমার সে সকল স্মৃতিও বিলুপ্ত হইত। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেল। তাহার পর আমি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে দিন কয়েক বর্ত্তৃতা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার পর আমার শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমি পুকিপ্সি গ্রামে কিছুদিনের জন্য বেড়াইতে গেলাম। ভাবিলাম, অবসর সুখে মনের শ্রান্তি-অবসাদ ঘুচিবে।

একটি ভদ্রমহিলার বাটীতে আমি বাসা লইলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি অজীর্ণ, শ্বাস ও উত্তমাঙ্গের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন। রোগটী শরীরের যন্ত্রগত না হইলেও যান্ত্রিক ক্রিয়ার ব্যভিচার জন্য বটে। বহু চিকিৎসা বহু ঔষধ নিস্ফল হইয়াছে। সে সময় তিনি যে ঔষধ ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহাতেও পীড়ার কোন উপসম হইতেছিল না। সমাধি (Clairvoyance) অবস্থায় ইহার কোন প্রতিকার দেখিতে পাইলেও জাগ্রত অবস্থায় আমার তাহা মনে আসিত না। আমার প্রাণ-পণ যত্ন, তাঁহাকে কিসে আরোগ্য করিতে পারি, কিন্তু কোন উপায়ই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না।

এইরূপে দিন কাটিয়া যায়। একদিন (১৬ই মে, ১৮৪৭ খ্রীঃ) রাত্রে আমি ঘুমাইয়া আছি, কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়া আমায় জাগাইয়া দিল। আমি উঠিলাম। দেখিলাম, আমার মস্তক হইতে একরূপ অপার্থিব তরল, সর্ব্বত্র ধাবিনী রশ্মি-চ্ছটা নিঃসৃত হইতেছে। দেবতার মাথায় যেমন কিরণ চ্ছটা থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপ। আমার মনে একরূপ অবোধপূর্ব্ব আনন্দ আসিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আমার রোগিনীর কথা মনে পড়ে। এই আলোক সাহায্যে, তাঁহার অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার অত্যন্ত

ঔৎসুক্য জন্মিল। ইচ্ছা মাত্রেই সেই আলোক-চ্ছটা দেওয়াল বিদীর্ণ করিয়া রোগিনীর মুখে নিপতিত হইল। আমি সেই যোগ বা আধ্যাত্মিক আলোকে তাঁহার দেহমধ্যস্থ সকল অবস্থা দেখিতে পাইলাম। রোগ ও রুগ্ন শরীরের যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমি সকলই দেখিলাম। ঔষধ স্থির করিতে বিলম্ব হইল না, তৎক্ষণাৎ তাহা লিখিয়া রাখিলাম। তাহার পর সেই আলোক ক্ষীণ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল; এবং দেখিতে দেখিতে আমার শরীরাভ্যন্তরে অন্তর্হিত হইল।

সেই সময় পার্শ্বস্থ কক্ষে আর একটী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার সে রাত্রে নিদ্রা হয় নাই। আমার সমস্ত কার্য্যকলাপ তিনি দেখিতেছিলেন; তিনি বলেন, "আমি দেখিলাম, ডাক্তার ডেভিস্ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। টেবিল ও চেয়ারের পার্শ্ব দিয়া বুককেসের নিকট গেলেন। গৃহটি অন্ধকার হইল, আমি আর দেখিতে পাইলাম না। আমি শুনিলাম তিনি আলমারি খুলিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লিখিবার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। দুই চারি মিনিটের মধ্যে তাঁহার লেখা শেষ হইল, তিনি শয্যায় আসিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শুনিলাম, তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে।"

আমার কিন্তু এ সকল কথা কিছুই মনে ছিল না। নিদ্রা ভঙ্গে চাহিয়া দেখি, পার্শ্বে বাতি জ্বলিতেছে এবং সেই ভদ্রলোকটী বসিয়া কি পড়িতে-ছেন। রাত্রি তখন তিনটা কুড়ি মিনিট হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়ের কি প্রয়োজন?" তাহাতে তিনি সেই ঔষধের ব্যবস্থা লেখা কাগজখানি আমায় পড়িয়া শুনাইলেন। তখন আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর হইতে আমি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে এরূপ আংশিক সমাধি লাভ করিতে পারি এবং সমাধিভঙ্গে সে অবস্থার স্মৃতিও আমার আর বিলুপ্ত হয় না।

এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, এরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিতে হইলে, কিরূপ জীবনের প্রয়োজন? কিরূপ আচরণ করিলে, মানুষ এই আধ্যাত্মিক-জ্যোতির বহির্বিকাশ দেখিতে পায়? কিরূপ আহার, কিরূপ অভ্যাস, কিরূপ আচার, কিরূপ অধ্যবসায়ে এ আত্মিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে? আপনার ভিতরকার বিসম্বাদ ঘুচান ভিন্ন এ রাজ্যের অন্য কোন সরল প্রশস্ত বর্ত্ম নাই।

"বাপ্‌কা বেটা" এই কথাটী আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেমন খাটিয়া থাকে, এমন অন্য কোন স্থলে নহে। বালকের পিতামাতার মত প্রবৃত্তি সংস্কার হইয়া থাকে। সুতরাং শারীরিক বা আধ্যাত্মিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে কোন পিতামাতাই আত্মবীর সন্তান লাভ করিতে পারেন না। অনেকে বলেন, আধ্যাত্মিক নিয়ম জানিব কি করিয়া? এ কথা স্মরণ রাখিলেই চলিবে যে, যাহা নিয়ম, যাহা ধর্ম্ম, যাহা প্রতিপালন করিলে মঙ্গল হয় তাহাই মানুষের স্বভাবতঃ প্রথমে মনে আইসে। যাহা অবিকৃত মনে চাহে না, তাহাই শ্রেয়ঃ। সকল হৃদয়েই এই স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা, এই শান্তি, সামঞ্জস্য বা স্বর্গীয় আলোকের বুভুক্ষা বিদ্যমান আছে। যাহাতে বালকের এই সকল আকাঙ্ক্ষা, এই সকল স্পৃহা বিলুপ্ত না হইয়া পরিপুষ্ট হয়, প্রত্যেক পিতামাতারই তাহাতে অবশ্য দৃষ্টি রাখা উচিত। গৃহাশ্রমে পৌর্ব্বতন নিয়ম সংযম ফিরিয়া আসিলে, জগতের আবার ব্যাস বাদরায়ণ জন্মাইতে পারেন।

এই আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করিতে গেলে আহার বিহারের সংযম আবশ্যক। এমন কোনরূপ দ্রব্য আহার করা উচিত নহে, যাহাতে শারীরিক বা মানসিক উদ্বেগ জন্মাইতে পারে। পবিত্র পান ভোজনের মত পূর্ণ স্বাস্থ্যের (দৈহিক ও মানসিক) উপায় নাই। সুতরাং তাহা ধর্ম্মবৎ প্রতিপালন করা উচিত। তারপর, অত্যন্ত শারীরিক শ্রম,

ব্যায়াম, এক কালে বহু পর্য্যটন প্রভৃতি একেবারে নিষিদ্ধ। শরীরের সকল অঙ্গের সকল পেশী, সকল স্নায়ু-মণ্ডলীর চালনা আবশ্যক। তাহার পর কর্ম্মীর ধর্ম্ম জ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকা আবশ্যক। পূর্ণ সত্য, পূর্ণ ন্যায়, পূর্ণ-ব্রহ্মে অগাধ বিশ্বাস থাকিলে চলিবে না, তাঁহাতে জীবন্ত প্রীতি-ভালবাসা চাই,—তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

যাহাদের প্রকৃতি নিতান্তই দ্বন্দ্বশীল, জীবনে যাহাদের হৃদয়ে ক্ষমা-মার্জ্জনা নাই, যাহারা কখন শিষ্যত্ব করিতে পারে না, তাহাদের ভাগ্যে এ ত্রিদিবকল্যাণ চিরদিনই অসম্ভব। এরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশে সর্ব্বদা এই জ্বলন্ত-জীবন্ত আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই যে, আমি পূর্ণ সত্য, পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা ও পূর্ণ দেবত্ব দেখিব। সে সত্য বা দেবত্বাদি কেবল এ পৃথিবীগত নহে, আমাদের সৌর জগতের বৃত্ত। তাহার পরিধি হইতে পারে না। তাহা দেশব্যাপ্তি কালের অতীত। তাহা অখণ্ড ও অসীম। বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ কর, তাহা হইলে নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ছাড়িয়া অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ, সত্যময় জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যরাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে। মর্ত্ত্য তখন অমৃতে লুকাইয়া পড়িবে। অনন্ত আসিয়া এই ক্ষুদ্র কাল, এই ক্ষণিক মুহূর্ত্তের সমষ্টিকে কোলে করিয়া বসিবে। দেবত্ব আসিয়া নরত্বের হাতে ধরিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

স্থূল বস্তুতে প্রেতের আবির্ভাব।

গুরু। তুমি বোধ হয় অবগত আছ, পাশ্চাত্য প্রদেশের আমেরিকাতে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়। কেমন করিয়া

প্রথম এ বিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত হয়,—তাহা তুমি অবগত আছ কি ?

শিষ্য। আমেরিকায় এই বিদ্যালোচনার পূর্ব্বে কি পাশ্চাত্য প্রদেশে আত্মতত্ত্ব বা ভৌতিক বিদ্যা কেহ জানিত না? ভূত কি কেহ মানিত না?

গুরু। ভূত মানিত। বর্ত্তমানে আমাদের বঙ্গদেশে যেমন কেহ কোন বিষয়ে আলোচনা করে না, কোন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে না—নিজ কল্পনার বলে কেহ বলে ভূত আছে, কেহ বলে নাই। কেহ চাক্ষুষ দেখিয়া গল্প করিলেও অনেকে নিজে "মরুব্বি আনা" বুদ্ধির জোরে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়—পূর্ব্বে পাশ্চাত্য প্রদেশেও সেইরূপ ছিল। কিন্তু সে দেশের লোক এখন সর্ব্ব বিষয়ে সমুন্নত, তাঁহারা প্রথমে একটু সূত্র প্রাপ্ত হইয়া, এখন ইহার উন্নতিকল্পে যতদূর সম্ভব চেষ্টা-চরিত্র করিতেছেন। এখন বিজ্ঞানের মধ্যে,—প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের মধ্যে ইহা আনিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের দেশেরও যখন সৌভাগ্য ছিল, দেশে মানুষ ছিল, মানবের মনে বল ছিল, হৃদয়ে বুদ্ধি ও প্রতিভা ছিল, তখন এই বিদ্যার চরমোৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছিল।

শিষ্য। আমেরিকায় প্রথমে এই বিদ্যার প্রচলন কিসে আরম্ভ হয়, আমি তাহা জানি না।

গুরু। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্যদেশে আগে সকলে এ তত্ত্ব রহস্য অবগত ছিল না—কাজেই কেহ বড় একটা মানিত না। মানিলেও প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিত না। আমেরিকায় নিউইয়র্ক নগরের প্রান্তভাগে একটা পরিত্যক্ত বাড়ী ছিল,—বাড়ীটী অনেকদিন খালি পড়িয়াছিল; শেষে সুবিধামত অল্প ভাড়ায় প্রাপ্ত হইয়া ফক্স নামক এক ব্যক্তি উহা ভাড়া লইয়া দুইটী কন্যাসহ তথায় বসতি করিতে

আরম্ভ করেন। ফক্সের বড় মেয়েটির বয়স তখন দশ বৎসর,—নাম কেট বা (Kate Fox) ছোট মেয়েটির বয়স তখন আট বৎসর।

ফক্স কার্য্যব্যপদেশে দিবসের প্রথম ভাগেই বাড়ী হইতে নগরমধ্যে গমন করিতেন এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিয়া আসিতেন। অবস্থা সচ্ছল না থাকায় গৃহে এমন অধিক দাসদাসী থাকিত না—বালিকা কেট ও তাহার অষ্টমবর্ষীয়া ভগিনী গৃহে থাকিত।

ঐ পরিত্যক্ত বাড়ী ভাড়া লইয়া বসবাস আরম্ভ করিলে প্রথম প্রথম বাড়ীর নানা স্থানে তাহারা ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ প্রভৃতি শব্দ শুনিতে পাইত। তাহারা কেহ প্রেতযোনী বিশ্বাস করিত না, কাজেই সে শব্দের জন্য কেহ ভীত হইত না,—ভাবিত, বায়ু প্রভৃতি কোন ভৌতিককাণ্ড হইবে।

একদিন ফক্স বাড়ীতে নাই। কেট ও তাহার ভগিনী গৃহমধ্যে বসিয়াছিল। সহসা তাহারা দেখিতে পাইল, গৃহ-মধ্যস্থ একখানা টেবিল চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই কাঠের টেবিল গৃহের চারিদিকে সচেতন পদার্থের ন্যায় চলিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবোধ বালিকা-হৃদয় ইহাতে বিচলিত হইল না,—সে ভাবিল, আমাদের মত টেবিলের বুঝি গমনাগমন শক্তি আছে। তখন বালিকা ক্রীড়াপরায়ণ হৃদয়ে টেবিলকে স্থির হইতে বলিল,—টেবিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আবার চলিতে বলিলে, টেবিল চলিতে লাগিল। আবার স্থির হইল।

যথা সময়ে বালিকা কেটের পিতা বাড়ী আসিলে, কেট তাহার পিতাকে ঐ সমুদয় জ্ঞাত করাইল। ফক্স তখন গৃহে গিয়া টেবিলের গমনাগমন শক্তি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন, ইহার অবশ্যই একটা চৈতন্য-শক্তি-সত্তা জন্মিয়াছে। তখন ফক্স ও কেট পরামর্শ করিয়া বলিল, যদি এই টেবিলে জ্ঞান-সত্ত্বা থাকে, তবে "হাঁ" হইলে একটা

ঠক্ শব্দ এবং "না" হইলে দুইটা ঠক্ শব্দ হইবে। এই কথা বলিয়া কেট জিজ্ঞাসা করিল, টেবিল! তোমার কি জ্ঞানশক্তি আছে? যদি থাকে, তবে একটা ঠক্ শব্দ কর, আর যদি না থাকে, তবে দুইটা ঠক্ শব্দ কর। টেবিল হইতে একটা ঠক্ শব্দ হইল।

তারপর ফক্সের পরামর্শে নানা কথার পরে কেটের দ্বারা ঐ টেবিলের সহিত সাঙ্কেতিক শব্দ এ, বি, সি (A. B. C.) প্রভৃতিতে যাহা 'আত্মার' (টেবিলস্থিত আত্মার) বক্তব্য হয়, সেইটাই ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক্ ইত্যাদি শব্দে বাহির হইতে লাগিল। তখন সে সকল অক্ষর সংযোগ করিয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে নানা অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়ের উত্তর পাওয়া যাইতে লাগিল। *

এই বালিকা কেট হইতেই আমেরিকায় অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিদ্যা ও প্রেততত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার আরম্ভ হয়। তারপরে এক্ষণে এই সম্বন্ধে বহুল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয়ের সত্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে। আশা করা যায়, সে দেশে যেরূপভাবে এই বিদ্যার আলোচনা ও আবিষ্কার হইতেছে, তাহাতে পরিণামে আত্মিকের সাক্ষাৎ সকলেই সর্ব্ব সময়ে লাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। এই স্থলে আমার একটি প্রশ্ন আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কোন আত্মা নিজেই আসিয়া দর্শন দান করে, আবার কাহাকেও বা শক্তিচালনা বা মন্ত্র তন্ত্রাদির দ্বারা আনিতে হয়। কেহ কেহ বা পথে-ঘাটে আপনিই কাহাকেও পাইয়া বসে। তবে কি আত্মিকগণ আপন ইচ্ছায় যাতায়াত করিতে সক্ষম, না আনাইলে আইসে?

গুরু। কোন শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। সকল আত্মিক সমান শক্তিসম্পন্ন নহে। কেহ অপত্যস্নেহের আকর্ষণে

* Vide Allen Ka red's Mendiumos' Book. P. 62.

আইসে, কেহ উপকারীর প্রত্যুপকার-ইচ্ছাশক্তিতে আইসে, কেহ প্রতি-হিংসার অনল আকর্ষণে আইসে, কেহ পার্থিব জীবনের স্বভাববশতঃ পরের অনিষ্ট করিতে আইসে, কেহ পার্থিব-জীবনের কৃতকর্ম্মের চিন্তা-শক্তির আকর্ষণে আইসে, কেহ কেহ বা আসিতে পারে না। আবার কেহ বা পৃথিবীর মানুষের শক্তি-চালনাদ্বারা আসিয়া থাকে।

শিষ্য। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে ভাবে আত্মিকগণকে পৃথিবীতে আনা হয়, সে সকল কৌশল, সে সকল উপায়, আপনি অবগত আছেন কি?

গুরু। হাঁ,—কতক কতক জানি। তবে আমার মতে আমাদের হিন্দুগণের আবিস্কৃত নিয়ম সকল সরল ও সহজসাধ্য।

শিষ্য। আগে পাশ্চাত্য প্রদেশের নিয়মগুলি আমাকে বলুন, তৎপরে আমাদের দেশীয় নিয়মগুলিও শিক্ষা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ইয়োরোপীয় প্রণালীতে মিডিয়ম করা।

গুরু। ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রেততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যে প্রকার উপায়ে আত্মিকের আবির্ভাব করান ও তদ্দ্বারা যে প্রকারে প্রশ্নাদির উত্তর লাভ করিয়া থাকেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যে সকল লোকের প্রতি ঐরূপ আত্মিকগণের আবির্ভাব ঘটে, তাহার দ্বারাই নানা উপায়ে প্রশ্নের উত্তর জানা যায়। ঐ সকল ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া উত্তর প্রচার করে বলিয়া উহাদিগকে মিডিয়ম (Medium) বলে।

শিষ্য। যাহাদিগের উপরে আত্মিকের আবির্ভাব হয়, সেই কি মধ্যবর্ত্তী থাকে?

গুরু। থাকে না? প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে সেই প্রথম, উত্তর করে আত্মিক সে তৃতীয়। আর মাঝামাঝি থাকে আবিষ্ট বা মোহিষ্ণু ব্যক্তি। তাহার নিজের ইচ্ছা বা শক্তিতে কোন কার্য্যই হয় না বটে, তথাপি সে মধ্যবর্ত্তী।

শিষ্য। হাঁ, বুঝিলাম। এক্ষণে—মিডিয়ম কত প্রকার, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। মিডিয়ম নানাপ্রকার—তাহার মধ্যে সচরাচর প্রচলিত ও ফলপ্রদ কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর।

লেখক মিডিয়ম—ইহারা চক্রে বসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এবং হস্তে পেন্সিল দিয়া তাহার নীচে কাগজ ধরিলে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

কথক মিডিয়ম—ইহারা আপন ভাষায় এবং কখনও বা আত্মিকের ভাষায় উত্তর দেয়। যে ইংরাজী জানে না, গান গাহিতে জানে না, সেও ইংরাজীতে কথা বলে বা গীত বাদ্য করিতে থাকে।

শব্দকারী মিডিয়ম—ইহারা ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করতঃ প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেমন ফক্সের টেবিল।

আরোগ্যকারী মিডিয়ম—ইহারা অচৈতন্য হইয়া গেলেও নানাপ্রকার ঔষধের আদেশ করে বা রোগীকে স্পর্শ করিয়া রোগ আরাম করিয়া দেয়।

সর্ব্বজ্ঞ মিডিয়ম—ইহারা অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করে।

ফটোগ্রাফি মিডিয়ম—ইহারা বিদেহীর ছায়া-ছবি তুলিয়া দিতে পারে। মার্কিনদেশের প্রেসিডেণ্ট নিল্‌কনলের মৃত্যুর পরে বিবি নিল্‌কনল্ এইরূপে তাঁহার স্বামী পুত্রের ছবি তুলিয়া লইয়াছিলেন।

বার্ত্তাবহ মিডিয়ম—কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পত্রাদি লিখিয়া

শীলমোহর করিয়া দিলে, উহার পৃষ্ঠায় অবিকল সেই মৃত ব্যক্তির হস্তাক্ষরে যথার্থ উত্তর পাওয়া যায়। নিউইয়র্ক নগরে মাষ্টার সার্ল্‌স্‌ফিল্ড প্রথমে এইরূপ মিডিয়ম হন।

ছায়ামূর্ত্তি মিডিয়ম—মিডিয়ম অজ্ঞান হইলে, আত্মিক তাহার দেহস্থ শক্তি লইয়া ছায়ামূর্ত্তি রূপে চক্রের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। মৃতব্যক্তির ছায়ামূর্ত্তি এতদ্দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। হোসেন খাঁ নামক একব্যক্তি কলিকাতার রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীর তেতালা ঘরে বসিয়া, দর্শক-গণকে নানাবিধ মদ খাইতে দিয়াছিল। হীরালাল শীলের বৈঠকখানায় চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়া, উইলসনসাহেবের হোটেলে চারিজন লোকের উপযুক্ত খাদ্য দিতে বলা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে হোসেন খাঁ বাহিরের লোকদিগকে ঐ খানা খাইতে দেয়। ঐ সকল ডিসে উইলসনের নাম পর্য্যন্ত অঙ্কিত ছিল। আমেরিকাবাসী ডিভনপোর্ট ব্রাদার ও প্রফেসর ফর্ এ দেশে আসিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিল। ইহারা হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় থাকিত এবং অন্ধকার ঘরে দর্শকগণের মস্তকের উপরে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া বেড়াইত।

শিষ্য। যে সকল মিডিয়মের কথা বলিলেন, কিপ্রকারে ঐরূপ মিডিয়ম হয়, কিরূপ প্রণালী অবলম্বনে উহা করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। নানাবিধ উপায়ে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, সচরাচর যে সকল সহজ ও সরল প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

একটা টেবিলের চারিদিকে চৌকী (কেদারা Chair) সাজাইতে হয়। গদি আঁটা কেদারা, না হয় বেত দিয়া ছাওয়া হইলেই চলিতে পারে। কিন্তু কাঠ আঁটা চেয়ারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

তিনজনের কম ও দশজনের অধিক লোক চক্রে বসিবে না।

সকলেই কেদারায় স্থিরভাবে বসিবে। একজনের দক্ষিণ হস্ত ও অপরজনের বাম হস্ত যেন সংলগ্নভাবে অবস্থিত থাকে।

পুরুষ ও স্ত্রী, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, মোটা ও কৃশ, নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমান, অলস ও পরিশ্রমী প্রভৃতি বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তি পাশাপাশি হইয়া বসিবে।

মন হইতে সাংসারিক চিন্তা এবং কাম ক্রোধ ও লোভাদি বিতাড়িত করতঃ পরস্পর ধর্ম্মালাপ করিবে, অথবা ধীরে ধীরে একজন কোনও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে থাকিবে বা অনুচ্চ মিষ্টস্বরে ধর্ম্মগাথা গাহিতে থাকিবে।

যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট আত্মাকে আনিতে হয়, তবে তাহাকে একমনে ভাবিতে হইবে। যে কোনও আত্মা আনিতে হইলে, চরিত্র চিন্তার প্রয়োজন নাই। কাহাকেও চিন্তা না করিলে, চক্রস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি যাহার অধিক, তাহারই আত্মীয় প্রায় আসিয়া থাকে।

চক্রে যাহারা বসিবে, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের হিংসা ঘৃণা বা ধর্ম্মবিষয়ে মতানৈক্য না থাকে।

সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া চক্রে বসা না হয়।

নাস্তিক ও পাপকর্ম্মরত ব্যক্তিকে চক্রে স্থান দিবে না।

চক্রে বসিলেই যে আত্মার আবির্ভাব হয়, তাহা নহে।

দশ পনর দিন বসিতে বসিতে মিডিয়ম স্থির হয়। তবে যাহারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহারা যে দিন বসে সেই দিনই আত্মিকের দর্শন লাভ করিয়া থাকে।

যতদিন মিডিয়ম স্থির না হয়, ততদিন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বসা কর্ত্তব্য। মিডিয়ম স্থির হইয়া গেলে আর স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় না।

চক্রের একজন কর্ত্তা বা চক্রপতি হওয়া আবশ্যক। তিনিই প্রশ্ন করিবেন, অন্যের আবশ্যকীয় প্রশ্নও তাঁহারই মুখ দিয়া হওয়া কর্ত্তব্য।

ঐ চক্রকর্ত্তা মিডিয়মের সম্মুখে বসিবেন।

ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, অতি শীত বা অতি গ্রীষ্ম, ম্যাদ-মেদে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে চক্র করিবে না।

স্থান পরিবর্ত্তন বা লোক পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে, তাহা অবশ্য করিবে।

চক্রগৃহ আবর্জ্জনা শূন্য ও পবিত্র রাখিবে।

রাত্রিই চক্রের সময়। চক্রগৃহে অন্ধকার বা অতি ক্ষীণ আলোক রাখিবে, কিন্তু আলো জ্বালিবার সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত রাখিবে।

চক্রে বসিবার পূর্ব্বে ভগবানের নিকট কৃতকার্য্যতার জন্য প্রার্থনা করিবে।

মিডিয়ম যদি ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে থাকে, তবে এক শব্দে হাঁ, দুই শব্দে না ইত্যাকার শব্দ ধরিয়া কথা স্থির হয়। এই ভৌতিক শব্দজ্ঞানকে পাশ্চাত্য ভাষায় (Alphabetical Typology) বলে। একবার ঠক্ করিলেই হাঁ, দুইবার ঠক্ করিলেই না ইত্যাদি সঙ্কেতে যে কথা বার্ত্তা চলে, প্রশ্নের দোষে অনেক সময়ে উহার উত্তরের সার্থকতা থাকে না। উহা হইতে আরও সহজ ও সরল সাঙ্কেতিক জ্ঞান আছে; তাহা এইরূপ যে, একজন এ, বি, সি, (A. B. C.) ধীরে ধীরে পাঠ করিয়া যাইবে, যে অক্ষর আত্মিকের বক্তব্য, তাহাতেই ঠক্ করিয়া শব্দ হইবে এবং তখনই আর এক ব্যক্তি ঐ অক্ষর লিখিয়া রাখিবে। এইরূপে কতকগুলি অক্ষর লেখা হইলে, তখন উহার একত্র যোগে উত্তর হইবে।

যদি মিডিয়মের হাত পা কাঁপিতে থাকে, তাহা হইলে মিডিয়মের হাতে পেন্সিল দিবে এবং পেন্সিলের নিম্নে মসৃণ ও পুরু এক খণ্ড কাগজ

রাখিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলে, মিডিয়ম তাহাতে উত্তর লিখিয়া দিবে। আর এক প্রকার ভৌতিক লিখন (Pneumatography) প্রণালী আছে। ইহাতে মিডিয়মের প্রয়োজন হয় না, আত্মিক স্বয়ং একখানা কাগজে উত্তর লিখিয়া দেয়। কোনও আত্মিকের উদ্দেশে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠায় অবিকল ঐ মৃত ব্যক্তির হস্তাক্ষরে লিখা উত্তর পাইবে। পরলোক ও আত্মিক বিশ্বাস স্থাপনপক্ষে শত সহস্র বাধা থাকিলেও ইহাতে আর অবিশ্বাস বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবার উপায় বা অন্য পথ নাই। আমেরিকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ঐরূপে অনেকগুলি পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মিডিয়ম যদি জড়তা পূর্ণ স্বরে কথা কহে, তবে বুঝিবে অল্পক্ষণ পরেই সে কথা দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিবে। আত্মিকগণ পার্থিব শব্দ সকল অতি চমৎকাররূপে অনুকরণ করিতে পারে। শব্দসাধন Pneumtaphony) আর্য্যদিগের পঞ্চমুখী শব্দসাধন ভালরূপ আছে।

এক্ষণে এতৎসম্বন্ধীয় মূলতত্ত্ব কতকগুলি তোমাকে শ্রবণ করাইব। ঐগুলি ভালরূপে না বুঝিতে পারিলে, এ সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। আরও একটি কথা এস্থলে বলিয়া রাখি। আমি ইহার পরে, এই সকল কার্য্য-সাধন-উপায়-বিবৃতির সময় যে সকল কথা বলিব, তাহাতে হয় ত তুমি বুঝিবে, কেবল মৃত বা কেবল জীবিত মনুষ্যের আত্মার দ্বারাই কাজ হয়,—তাহা ভুল। মৃত বা জীবিত মনুষ্যের আত্মার বিশেষ পার্থক্য নাই। কেবল দেহ বিভেদ। যে সকল কার্য্য জীবিত মনুষ্যের আত্মাদ্বারা সাধিত হয়, তাহা আবার মৃত ব্যক্তির আত্মাদ্বারা সাধিত হইয়া থাকে; এইটি স্মরণ রাখিও,—নতুবা অনেক স্থলে ভ্রমে পতিত হইবে

অষ্টম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যোগনিদ্রা।

Hypnosis.

আমাদের দেশে মোহন, স্তম্ভন, বশীকরণ প্রভৃতি কথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও অগোচর নাই। অবস্থা ও প্রক্রিয়া বিশেষের বলে, মানুষে মানুষের উপর মনের পূর্ণ রাজত্ব করিতে পারে। কোন অজ্ঞেয় শক্তির বলে অনেকে শুধু হাত বুলাইয়া অনেক ব্যাধির উপশম করিতে সক্ষম হয়,—এ সকল বিষয় আমাদের দেশে ধর্ম্মবিশ্বাসের অন্তর্গত। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, বৃক্ষের কোন উচ্চডালে একটি ক্ষুদ্র পাখী বসিয়া আছে, তল-ভূমে এক অজগর সর্প দানবী দীপ্তি-পূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পাখীটি দুই চারিবার সেই মৃত্যুময় দৃষ্টি হইতে তাহার দৃষ্টি অপসৃত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহা সরাইয়া লইতে পারিল না, অবশেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া স্বপ্নমুগ্ধের ন্যায় অজগরের মুখবিবরে আপনা আপনি পড়িয়া গেল।

বাঙ্গালার সুন্দর বনে যাহারা আবাদে বা কাঠ কাটিতে যায়, তাহাদের মুখে শুনা গিয়াছে, ব্যাঘ্রের দৃষ্টিতে একবার পড়িলে, মানুষের যেন আর নড়িবার ক্ষমতা থাকে না, একরূপ যেন ভেল্কি লাগিয়া যায়। চোখের মোহিনী শুধু ভাবিনী-চোখেই নাই, জীবনমাত্রেরই তাহা সহজ অধিকার।

এই শক্তির উৎপত্তি, স্বরূপ, উদ্বোধন ও পরিচালন প্রভৃতিই এ প্রসঙ্গের আলোচ্য। কেমন করিয়া একজন 'অপরের ইচ্ছাশক্তিকে ঘুম পাড়াইয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তীভূত করিতে পারে, এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে, এই নিদ্রা কিরূপে উৎপাদিত হইতে পারে। দেহ ও আত্মা লইয়া মানুষ। তাহারা পরস্পর ভিন্ন-ধর্ম্মশীল হইলেও একজন অপরকে ছাড়িয়া কার্য্য করিতে পারে না। শরীরের ভিতর দিয়া জীবাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়। আত্মিক অবস্থার একটি বাহ্যিক বা শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এই প্রক্রিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট মল, নিম্নলিখিত পরীক্ষা গুলির কথা বলিয়াছেন ;—

১। একটি প্রায় কুড়ি বৎসর বয়স্ক যুবককে লইয়া আমি প্রথমে পরীক্ষা আরম্ভ করি। আমি তাহাকে আমার সম্মুখীন একখানি চেয়ারে বসাইয়া, হাতে একটি বোতাম দিলাম, বলিলাম একদৃষ্টে এই বোতামের দিকে চাহিয়া থাকুন। প্রায় চারি পাঁচ মিনিটের পরেই দেখিলাম যুবকের চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা খুলিতে পারিতেছেন না। হাত হইতেই বোতামটী পড়িয়া গেল এবং হাত দুখানিও জানুদ্বয়ের উপরে ধীরে ধীরে বিন্যস্ত হইল। আমি বলিলাম "আপনার হাত আপনার জানুর সহিত আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে, আপনি তাহা নিশ্চয়ই

তুলিতে পারিবেন না।" যুবক কিন্তু হাত তুলিল। আমি তাহার সহিত কথাবর্ত্তা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম, ভিতরে তাহার পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ই সুপ্ত। আমি তাহার একটি হাত ধরিয়া ঊর্দ্ধে উঠাইলাম।—কিন্তু ছাড়িবামাত্রেই আবার তাহা পড়িয়া গেল। আমি তাহার চক্ষুতে ফুঁ দিলাম। যুবকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পরীক্ষা কালে আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, সকলই তাহার স্মরণ আছে। কেবল কোন ক্রমেই তিনি চক্ষু খুলিতে পারিতেছিলেন না। একটু শ্রান্তি বোধ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ শারীরিক ক্লেশ তাঁহার নাই।

দ্বিতীয় উদাহরণ।—বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা প্রায় তিপ্পান্ন বৎসর বয়স, আমার সম্মুখে চেয়ারে বসিলেন। আমি তাঁহার মস্তকের ব্রহ্মতল হইতে বক্ষাস্থির তলস্থ গর্ত্ত পর্য্যন্ত আল্‌গা ভাবে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। আমার করতল তাঁহার দেহ হইতে প্রায় দুই হইতে চার সেন্টিমিটার (Centimeter) দূরে চলিতে লাগিল। পাকস্থলীর উদরস্থ গর্ত্তের উপর হস্ত আসিলেই আমি ফাঁক করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার মস্তকের উপর হইতে ঘন ঘন সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। প্রায় দশমিনিট কাল এইরূপ করার পর, বৃদ্ধার চক্ষু মুদিয়া আসিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। আমি তাঁহাকে হাত তুলিতে বলিলাম, তিনি তাহা করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনার হাত তুলিতে ক্ষমতা নাই, বিস্তর চেষ্টাতেও তিনি তাহা পারিলেন না। আমি বলিলাম, আপনি বোবা হইয়া গিয়াছেন, বৃদ্ধা অনেক চেষ্টাতেও কথা কহিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, কেমন সুন্দর সঙ্গীত হইতেছে, শ্রবণ করুন। বৃদ্ধা যেন কোন মধুর সঙ্গীতের তালে তালে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। আমি ঠিক পূর্ব্বের মত নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। এবার করতলের পৃষ্ঠভাগ তাহার দিকে রহিল। বৃদ্ধা জাগরিতা হইলেন।

তৃতীয় উদাহরণ।—এবারকার পরীক্ষার পাত্র একজন ষোড়শ-বর্ষ-বয়স্ক বালক। আমি তাহাকে বলিলাম, একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে চাহিয়া থাক। বালক তাহাই করিল। তার পর, দুই হস্তে তাহার দুই হস্ত ধারণ করিয়া, আমি তাহাকে আমার সম্মুখদিকে টানিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ টানিয়াই আমি হস্ত ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় একদৃষ্টেই বালকের চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর আমি আমার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলাম, বালক তাহাই করিল। আমি বাম হস্ত উত্তোলন করিলাম, বালক তাহাই করিল। আমি অঙ্গুলির ইঙ্গিতে বালককে ভূমে বাহু পাতিয়া বসিতে বলিলাম, সে তাহাই করিল। উঠিবার জন্য বালক বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু যতক্ষণ আমি তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম, ততক্ষণ সে উঠিতে পারিল না। আমি শুইয়া পড়িতে ইঙ্গিত করিলাম, বালক তাহাই করিল। অবশেষে আমি অন্য দিকে চাহিবামাত্রই তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

চতুর্থ উদাহরণ।—মিঃ এক্স নামক এক ব্যক্তি বয়স অনুমান এক-চল্লিশ বৎসর, আমার সম্মুখে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। আমি বলিলাম আপনি ঘুমাইয়া পড়িতেছেন, এ কথা ভিন্ন অপর কোন কথাই যেন ভাবিবেন না। দুই চারি সেকেণ্ড পরেই আমি বলিলাম, আপনার চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিতেছে। আপনার সর্ব্বাঙ্গে ক্রমে ক্রমে তন্দ্রাভাব প্রবেশ করিতেছে, আপনি এইবার নিদ্রালু হইয়াছেন,—যান এইবার নিশ্চিন্তে ঘুমান। তাঁহার চক্ষু মুদিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আর চক্ষু খুলিতে পারেন কি? তিনি অনেক চেষ্টাতেও তাহা খুলিতে পারিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ঘুমাইতেছেন কি? উত্তর হইল হাঁ,—প্রাগাঢ় নিদ্রা! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পাখীর গান শুনিতেছেন কি? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ!

আমি একখানি কাল রঙ্গের বস্ত্র তাহার কোলে দিয়া বলিলাম, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, কেমন সুন্দর কুকুরটি। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কুকুর মনে করিয়া কাপড়খানাকে আদর করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, দেখুন আপনি পশুশালা দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি তত্রস্থ বিবিধ জন্তুর বিশদ বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। আমার সকল কথা তিনি শুনিতে পাইতেছেন, অথচ তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্তীভূত। আমি বলিলাম আপনি জাগিয়া উঠুন, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ বা প্রক্রিয়া গুলি ভাবিয়া দেখিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, দুই উপায়ে মানুষের এইরূপ যোগ বা জাগ্রত নিদ্রা উৎপাদিত হইতে পারে। প্রথমটি শারীরিক, দ্বিতীয়টি জড়াত্মিক। কোনরূপ বাহ্য বস্তুর সাহায্যে মনের একাগ্রতা হইলে সেই বস্তু সংস্পৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের ক্লান্তি উৎপাদিত হয় ও তজ্জন্য একরূপ সর্ব্বাঙ্গীন তন্দ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় মনের নিদ্রা হয় না বলিয়া, গুরু বা কর্ম্মী তাহাকে আপনার মানস-অনুসারে পরিচালিত করিতে পারেন। অন্যপক্ষে কোনরূপ বাহ্যবস্তুর সাহায্য না লইয়া, বিষয়ী বা পরীক্ষিত ব্যক্তির মনে কোনরূপ তীব্র কল্পনা জাগাইতে পারিলে তন্ময়ত্ব জন্য বাহ্যিক বা শারীরিক তন্দ্রা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়টি তাড়িৎশক্তি, আলোক, নৃত্য, গান, শব্দ প্রভৃতির দ্বারা এইরূপ অবস্থা উৎপাদিত করা * Hellbuld Gab-

* ওয়েল্টার (Welter Stard) শ্রেঙ্ক নোঝিং (Schrenk Notzing) প্রভৃতি আচার্য্যেরা বলেন, ক্লোরোফর্ম্ম মরফিন, হাশিশ (সিদ্ধি ও ভাঙ্গ) ঈথর প্রভৃতির সাহায্যে, যোগনিদ্রা উৎপাদন করা যায়। মোল বলেন, ক্লোরো হাইড্রেট নামক পদার্থের সাহায্যে, তিনি অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। Hypnotism (Contemporary Science) P. 45.

riel Hue প্রভৃতি আচার্য্যেরা বলেন, তিব্বতের বৌদ্ধ অর্হৎগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে এরূপ যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হয়েন যে, সে অবস্থায় তীক্ষ্ণ শূল বা শাণিত তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র তাহাদের বক্ষঃ, নাসা বা কর্ণ প্রভৃতির ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে তাঁহাদের তাহা অনুভূত হয় না। যে নিদ্রা যে উপায় দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গাইতে হইলে, সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ জড়াত্মক ভাবে উৎপন্ন নিদ্রা জড়াত্মিক প্রক্রিয়ায় ও মানসিক প্রক্রিয়ায় সংসাধিত নিদ্রা মানসিক উপায়েই ভাঙ্গান প্রয়োজন।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, হিপ্‌নোটাইঝ বা যোগনিদ্রা উৎপাদন করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া ও বিধানগুলির মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। উত্তরে আমরা বলিব, জগতে দুইজন লোক এক প্রকৃতির নাই। প্রকৃতি ও অবস্থানুসারে যেটি যেখানে বিশেষ উপযুক্ত মনে হইবে সেইটিই অবলম্বন করা বিধেয়। অনেকে মনে করেন, দুর্ব্বল চিত্তের লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও এরূপ অবস্থায় লইয়া যাওয়া যায় না। ভাবিয়া দেখিলে এরূপ ধারণা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। চিত্ত একাগ্র করিতে হইলে, মনকে অন্য সকল বিষয় হইতে অপসৃত করিয়া, এক বিষয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখিতে অনেকটা সরল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। দেশ, জাতি ও বাসস্থান ভেদে, এ প্রবণতার তারতম্য হয় না। দুর্ব্বল সবল সকলকেই এইরূপ তন্দ্রাবস্থায় নিক্ষিপ্ত করা যায়। অভ্যাসের সহিত এ নিদ্রাপ্রবণতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরীক্ষার সময় বিষয়ী বা পরীক্ষিত ব্যক্তির খুব শান্ত ও নিরুদ্বেগ মনে থাকা আবশ্যক। কোনরূপ কোলাহল বা অন্যমনস্কতার কারণ থাকিলে, অনেক সময় গুরু বা কর্ম্মী কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। বলা বাহুল্য, মনুষ্য চরিত্রে যাহার ভূয়োদর্শন আছে, এক্ষেত্রে তাঁহাকেই আচার্য্যত্বে বরণ করা উচিত।

অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়,—ক, খ, ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারাই হিপনোটাইজ হয়েন না। তাহার অর্থ—খ, ক এর চরিত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব যেরূপ অবগত আছেন, অপর কেহই সেরূপ নাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেককে এরূপ নিদ্রিত করান যাইতে পারে। আচার্য্য হেডেনহেন একবার কতকগুলি সৈনিককে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিদ্রিত করেন।

যোগনিদ্রায় স্বভাবতঃ তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় তন্দ্রা ও শারীরিক জড়তা আইসে। বিষয়ী বহুকষ্টে গুরুর আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন। দ্বিতীয় বা সম্মোহন অবস্থায় চক্ষুর্দ্বয় মুদিত হয় এবং বহুকষ্টেও তাহা খুলিতে পারা যায় না। বিষয়ী সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যের সকল আদেশ প্রতিপালন করেন। তৃতীয়টির নাম স্বপ্নপ্রাপ্তি (Somnambulism) অবস্থা। এ অবস্থা ভগ্ন হইলে, পরীক্ষা কালে বিষয়ী যে সকল কার্য্য করেন, তাহার স্মৃতি আমূল বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু স্মৃতি ধ্বংস হইলেও, নিদ্রাকালীন আচার্য্যের অনেক আদেশ, বিষয়ী জাগ্রত অবস্থায়ও প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

জৈবিক চৌম্বকত্ব
বা
Animal Magnetism.

ইউরোপীয় জগতে মেস্মার এই শক্তির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা হইলেও ভারতের ঋষিরা বহুকাল হইতে এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন। ইহাদের মতে. একরূপ ব্যোম (Ether) হইতেও সূক্ষ্মতর পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডময় পরিব্যাপ্ত

আছে। সুদূর গ্রহ উপগ্রহের পরস্পর আকর্ষণ, এক সূক্ষ্ম পদার্থের আণবিক ঝঙ্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সূক্ষ্ম পদার্থের ঝঙ্কারের সাহায্যেই এক জীবদেহ অপর জীবদেহের উপর এতটা প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে। ইহার নাম জৈবিক বা দৈহিক চৌম্বক শক্তি।

গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর শেষভাগে এলব্রেট ভন্ হেলার (Albrecht Von Heller) নামক একজন প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ অনেকটা অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে মনুষ্যের স্নায়ুবর্গের ভিতর এমন একরূপ সূক্ষ্মগতি আছে, যাহা অঙ্গচালনার দ্বারায় উদ্বোধিত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এ ভন্ হম্বোলট্ (A Von Humbolot) বলিতেন, মানুষের এই স্নায়বিক শক্তির কার্য্য কতকটা দূর হইতেও অনুভব করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এডোয়ার্ড ভন হার্টমানও এ তত্ত্বের অনুমোদন করিয়া থাকেন। ওঝা বা ঋষিরা বলিলে, আমরা না হয় এ কথা অবিশ্বাস করিতে পারিতাম, আজ যখন বিজ্ঞ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা, সেই প্রাচীন আর্য্যবিজ্ঞানের কণামাত্র লইয়া মানবের মহান্ অদৃষ্টতত্ত্ব নূতন করিয়া বুঝিতে বসিয়াছেন, তখন এ কথায় আর অবিশ্বাস করা চলে কি ?

তবে দেখা গেল তোমার আমার এমন অজ্ঞাত শক্তি আছে,—যাহার বলে আমরা পরস্পরের ভাগ্য বিধাতা হইতে পারি, জগতে অনেক নূতন সুখ বা দুঃখ সৃষ্টি করিয়া আপন আপন মনুষ্যজন্ম সার্থক বা অশান্তিময় করিতে পারি। দীর্ণ প্রাণ, জীর্ণ দেহ সুস্থ সবল করিতে, দুর্ব্বলের অশ্রু প্রবলের অত্যাচার নিবারণ করিতে, তোমার আমার যদি অধিকার থাকে; তবে সে ঈশ্বরত্বে কে সাধ করিয়া বঞ্চিত থাকিতে চাহে ?

সাধনার উপায়,—এ কথা সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পার, কি উপায়ে এই অধিকার করা যায় ? উত্তরে বলি, এ সকল বিষয় একান্তই

গুরু-উপদেশ সাপেক্ষ হইলেও, কতকটা দূর পর্য্যন্ত স্বয়ং সাধনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা 'ঝাড়্ ফুক' দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, যোগনিদ্রা সম্বন্ধে যে সকল সাধনার উপায় বর্ণিত হইয়াছে, মেস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধেও সেগুলি তুল্যরূপে প্রযোজ্য। প্রথমতঃ—যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হইবে, তাহাকে আপনার সম্মুখে বসাইয়া, তাহার মস্তকের উপরিভাগ হইতে বক্ষাস্থির শেষভাগ পর্য্যন্ত, গাত্র স্পর্শ না করিয়া দেহের যতদূর নিকট সম্ভব হয়, এমনভাবে হস্ত সঞ্চালন কর। মেস্‌মেরাইজ করিবার কালে, আপনার করতল বা হস্তের চেটো যেন সে ব্যক্তির দেহের দিকে থাকে। তাহার পর, বক্ষাস্থির শেষ ভাগের উপর পর্য্যন্ত হস্ত আসিলে ধীরে ধীরে তাহাকে ফাঁক বা বিস্তৃত করিয়া লও এবং পুনরায় রোগীর বা লোকটির দুই পার্শ্ব দিয়া দুই হাত উপরে উঠাইয়া লইয়া, পুনরায় তাহার মস্তক হইতে বক্ষাস্থির মূল পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবে হস্ত সঞ্চালন কর। হস্ত পদাদি অথবা কোন পীড়িত অঙ্গ বিশেষকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হইলে শুধু সেই পীড়িত অঙ্গের উপরেই ঐরূপ হস্ত সঞ্চালন করা আবশ্যক। মেস্‌মেরাইজম্ ভাঙ্গাইতে হইলে, বিপরীত ভাবে অর্থাৎ বক্ষাস্থির তল হইতে মস্তকের উপর পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদিকে হস্ত সঞ্চালন করিতে হইবে এবং অঙ্গুলির পৃষ্ঠভাগ রোগীর বা পীড়িত অঙ্গের দিকে থাকিবে। ইহাকেই পাস দেওয়া বলে।

দ্বিতীয় উপায়টি—একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা। যাঁহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হইবে, তাঁহাকে সম্মুখে বসাইয়া একদৃষ্টে তাঁহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকিবে, এবং তিনিও সেইরূপ তোমার চোখের উপর দৃষ্টি সংস্থাপন করিবেন। এরূপ স্থলে মেস্‌মেরিজম্ ভাঙ্গাইতে হইলে রোগীর বা আপনার শিষ্যের চক্ষু হইতে আপনার দৃষ্টি অপসৃত করিলেই চলিবে।

তৃতীয় উপায়—ফুঁক বা ফুঁ দেওয়া। এ ক্ষেত্রে আচার্য্য একাগ্রচিত্তে

এবং আপনার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, শিষ্য বা রোগীর মুখে ফুঁক দিবেন। ইহা বিশিষ্টরূপে উপদেশ ও অভ্যাস-সাপেক্ষ।

চতুর্থ উপায়টি চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধি। আচার্য্য রোগী বা শিষ্যকে বলিবেন, মনকে অন্য সকল বিষয় হইতে অপসৃত করিয়া, কোন একটি বিষয়ে সংযুক্ত কর। এইরূপে চিত্তের একাগ্রতা হইলে মনে তন্ময়ত্ব আসিবে। তন্ময়ত্ব আসিলেই এই অবস্থা উপস্থিত হইবে। মনে কর একজন লোক কোন উৎকট ব্যাধি ভোগ করিতেছে। রোগ নিবারণ জন্য তাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হইলে, তাহাকে বলিতে হইবে, তুমি কেবল তোমার পীড়ার আরোগ্যের কথা চিন্তা কর। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রোগীর মনে তন্ময়ত্ব আসিলে বাহ্য জগৎ তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইবে এবং বাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিবৃত্ত হইলে, তাহার আভ্যন্তরীণ বা প্রকাশক সাত্ত্বিকতত্ত্বের উদয় হইবে বলিয়া তাহার ঔষধ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এইরূপ ঔষধ প্রাপ্তি, চিত্তের একাগ্রতা ও তন্ময়ত্বের বিশেষ সাপেক্ষ করে। যাহার এইরূপ একাগ্রতা হয় না, তাহার আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি বা আলোক বিকশিত হয় না বলিয়া, অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই দেবতার দ্বারে হত্যা দিয়া কেহ বা ঔষধ পায়, কেহ বা পায় না।

চুম্বকের বিভিন্ন কেন্দ্রের (Poles) মত শরীরে বাম ও দক্ষিণ ভাগ ভেদে চৌম্বকিক কেন্দ্রের বিভিন্নতা আছে। অর্থাৎ চুম্বকের নিবর্ত্তক (Negative) ও প্রবর্ত্তক (Positive) কেন্দ্রের যেরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, মনুষ্য শরীরে বাম ও দক্ষিণ ভাগে সেইরূপ কার্য্য হয়। সুতরাং মনুষ্যদেহের বামভাগে নেগেটিভ্ বা নিবর্ত্তক, দক্ষিণ ভাগে পজিটিভ্ বা প্রবর্ত্তক শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। জড় চুম্বকের ন্যায় জৈবিক চুম্বকশক্তিও এক বা সমান জাতীয় চুম্বকশক্তিকে অপসারিত

বা বিতাড়িত করিয়া দেয় এবং ভিন্ন জাতীয় শক্তিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ দুইটি প্রবর্ত্তক জাতীয় চুম্বক শক্তি পাশা-পাশি রাখিলে, তাহারা মুখ ফিরাইয়া রাগে অভিমানে ভিন্ন মুখে চলিয়া যায়। কিন্তু একটি প্রবর্ত্তক ও একটি নিবর্ত্তক জাতীয় চুম্বক শক্তিকে পরস্পর সন্নিহিত করিলে, দুই জনে গলে গলে আলিঙ্গন করিয়া ধরে। এইরূপ দৈহিক ও মানসিক বিরোধ নিবারণ জন্য হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীকে স্বামীর বামপার্শ্বে বসাইবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে আচার্য্যগণ বহুকাল হইতে এই তত্ত্ব অবগত আছেন বলিয়া, তাঁহারা মেস্‌মেরাইজ বা ঝাড় ফুঁকের কালে রোগীর বাম বা দক্ষিণ অঙ্গ ভেদে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন। ভারতের ঋষিগণ অনেক ব্যাধিতে চুম্বক প্রয়োগ করিতেন, ইহা বর্ত্তমান যুগের অনেক ইংরাজ বৈজ্ঞানিকও স্বীকার করিয়া থাকেন।

অনেক সময়, রোগী বা শিষ্যকে সাক্ষাৎ ভাবে স্পর্শ না করিয়া তাহার দৈহিক চুম্বক শক্তি উদ্বোধিত করিতে পারা যায়। আচার্য্য আপনার দেহ হইতে এই শক্তি, জল, পুষ্প, অলঙ্কার প্রভৃতিতেও প্রবিষ্ট করিয়া তৎস্পর্শেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইতে পারেন। জগতে সজীব নির্জীব সকল পদার্থের ভিতরই সহানুভূতি চলিতেছে। মনুষ্য জন্মের নব দেবীবর, মহামান্য চার্লাস ডারুয়িণের মত লোক পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মধুর সঙ্গীতের দ্বারা বৃক্ষ লতাদির উৎপাদিকা ও জীবনী শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আজ যখন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, তখন জলপড়া ফুলপড়া শুনিলে তোমরা তোমাদের প্রাজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎ নাসিকা বাহাদুরকে একটু অল্প ফুৎকার করিতে অনুরোধ করিবে কি?

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যোগনিদ্রা (Hypnosis) ও

মেস্‌মেরিজম্ বা চুম্বকাবেশে প্রভেদ কি? চুম্বকাবেশ জাগ্রত অবস্থায়, এমন কি দূর হইতে সংসিদ্ধ করিতে পারে। একরূপ আংশিক বা বাহ্যিক নিদ্রা না হইলে, যোগনিদ্রা সংসাধিত হইতে পারে না। এই শক্তির সাহায্যে ডাক্তার লুটঝ্ যখন দূর হইতে কলেরারোগী আরোগ্য করিতে পারেন, তখন এদেশে ওঝা বা মালবৈদ্যেরা গৃহে বসিয়া সর্পদষ্ট রোগীকে আরাম করিতেন, একথা অবিশ্বাস কেন?

এই অবস্থায় আরও দুইটি অসাধারণ ক্ষমতার কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। এ অবস্থায় রোগী এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারে। হেডেন্‌হেন বলেন,—তাঁহার একজন শিষ্য এরূপ অবস্থায় পাকস্থলীর উপরস্থ গর্ত্ত দিয়া শুনিতে পাইতেন। এইরূপ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বিনিময় বিষয়ে অন্যান্য সাক্ষীরও অভাব নাই। অনেকে শুধু পুস্তক স্পর্শ করিয়াই পড়িতে দেখা গিয়াছে। মোল্ বলেন, তিনি একজন লোককে তাহার নাসিকার অগ্রভাগ দিয়া প্রায় দুই তিন ফিট দূরস্থ একখানি পুস্তক পড়িতে শুনিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে তাহার চক্ষুর্দ্বয় পটি দিয়া আঁটিয়া তাহার উপর কাপড় বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ক্ষমতা,—দূরানুভব শক্তি। আচার্য্য শিষ্যকে মেস্‌মেরাইজ করিলেন। শিষ্য গৃহের ভিতরে রহিলেন। এ অবস্থায় গুরুকে কেহ স্পর্শ করিলে, শিষ্য তাহা গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া অনুভব করিতে পারেন। দূরস্থ আত্মীয় বন্ধুর বিপদে যে আমরা অনেক সময়, সে বিপদের ঘটনা যেন চক্ষে দেখিতে পাই, তাহা এই শক্তির ক্ষণিক বিকাশের জন্য।

তৃতীয়টি,—ভাবানুমান ও ভাব চালন। একজনকে মেস্‌মেরাইজ করিয়া আপনার মত ভাবাইতে পারিবেন বা তাহার মনের সকল ভাব পুস্তক পাঠের মত স্পষ্ট পড়িয়া যাইতে পারিবেন। এ সকল বিষয়

আমাদের সময়ান্তরে আলোচনা করিবার সঙ্কল্প রহিল। এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ আচারে মনুষ্যের এই শক্তি উন্মেষিত হয় ।

এস্থলে আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা না বলিয়া এই বলিব যে, শুদ্ধ সাত্ত্বিক অনুগ্র আহারই এ সকল তত্ত্বানুসম্বন্ধীয় পক্ষে প্রশস্ত। পানীয় জলে চুম্বক ডুবাইয়া রাখিয়া তাহাই পান করা বিধেয়। তাহার পর মনঃ সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, চিত্তের একাগ্রতা সাধন ও দৃষ্টি সাধন প্রভৃতি আবশ্যক ।

প্রকৃতি বিশাল ; মনুষ্যজ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। সুখে হাসি কেন, দুঃখে কেন অশ্রু আইসে, এ সকল সামান্য দৈনন্দিন বিষয়ের মীমাংসা কোথায় পাওয়া যাইবে ? অতি ক্ষুদ্র নির্জীব রজঃকণা হইতে এমন দেবোপম মনুষ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এ রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিবে ? জগতে কোন ঘটনার যুক্তি-তর্ক তুমি খুঁজিয়া পাইয়াছ ? তবে অযৌক্তিক অসম্ভব বলিয়া চীৎকার কর কেন ? মানুষ যদি প্রত্যহ স্বপ্ন না দেখিত, তবে তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারা যাইত কি ? বুঝিতে পারি না বলিয়া, তাহার ভিতর ডুবিতে মজিতে ছাড়িব কেন ? গ্রন্থ অপেক্ষা জ্ঞান বড়, জ্ঞান হইতে প্রকৃতি বড়, প্রকৃতি হইতে পরমেশ্বর বড় । তুমি আমি ভুলিয়া যাইব কেন, আমরা জগতে বড় মানুষ হইতে আসিয়াছি, ধনী মানুষ হইতে আসি নাই ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

—:*:—

মিস্‌মেরিজ করিবার সহজ প্রণালী ।

শিষ্য। মিস্‌মেরিজ করিবার আরও সহজ প্রণালী আছে কি না ? যদি থাকে,—আমাকে শিক্ষা দিন।

গুরু। এই সকল অধ্যাত্মবিদ্যা পর্য্যালোচনা করিতে হইলে যেরূপ শুদ্ধাচারী হওয়ার প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

নিত্য নূতন নূতন ব্যক্তিকে নিদ্রিত করিতে হইলে, সর্ব্বত্র সফলকাম হওয়া যায় না। কিন্তু যাহাদিগকে দুই এক দিন নিদ্রিত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে সহজেই নিদ্রিত করা যায়।

নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী, অবিশ্বাসী, নাস্তিক, মাদকসেবী প্রভৃতিকে নিদ্রা-ভাজন মনোনীত করিবে না।

সমস্ত বিষয়গুলি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

প্রথমে বিড়াল প্রভৃতি পশুর উপরে এই কার্য্য প্রয়োগ করিবে। যখন দেখিবে সহজেই তাহাদিগকে নিদ্রিত করিতে পারিতেছ, তখন মানুষের উপরে ইহা প্রয়োগ করিবে। বলা বাহুল্য যে, পশুর নিকট কখনই কোন প্রশ্ন করিবে না, তাহার বাক্‌শক্তি নাই, কাজেই সে উত্তর দিতে পারে না।

বিশেষ সাবধানতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, কারণ, শক্তির অধিক নিদ্রাভাজনকে নিদ্রিত করিয়া রাখিলে তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

নিদ্রাভাজনের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে যদি একটু বিলম্ব হয়, তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন করে না। নিদ্রাভঙ্গ করিবার যে সকল নিয়ম অতঃপর বলিয়া দিব, সেই প্রকার করিলেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাইবে।

মেস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মনি, ও ফ্রান্স নিবাসী অনেক পণ্ডিত অনেক পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বহুল উপদেশ ও প্রক্রিয়া লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ডাক্তার গ্রেগরি (Doctor Gregory) ডাক্তার জে, বোবী ডড্‌স (Doctor J. Bovee Dods)

কাপ্তেন জন্ জেমস্ (Captain John James) আডলভ ডিডিয়ার (Adolphe Didiar) প্রভৃতি মনীষিগণ যে সকল সহজ প্রণালীর নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং কুমারী-হণ্টার-প্রণালী ও ডিলজের অভিমত ক্রিয়া সকল অতি সহজ। আমি এবং আমার পরিচিত বন্ধুবর্গ প্রায় ইহাদের মতানুসারে মেস্‌মেরিজম্ করিয়া ফললাভ করিয়াছি ও করিয়াছেন, অতএব আমি তোমাকে সেই গুলিই বলিতেছি শ্রবণ কর।

১। কুমারী—হণ্টার—প্রণালী—যে নিদ্রাভাজন হইবে, তাহাকে অবিযুক্ত ভাবে হাঁটু গাড়িয়া দক্ষিণ মুখে বসাইবে। সুবিধা হইলে এস্থলে দিগ্‌দর্শনের সাহায্য লইতে পার। তোমার হস্ত যদি সিক্ত থাকে, রুমাল দ্বারা মুছিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে এবং দুই হস্ত ঘর্ষণ করিবে, যদি করতল শীতল ও শুষ্ক থাকে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উষ্ণতা অনুভব না হয়, সেই পর্য্যন্ত উভয় করতলে ঘর্ষণ করিবে, পরে তাড়িৎসংক্রমণ বুঝিতে পারিলে স্থগিত রাখিবে। অতঃপর তোমার দক্ষিণ হস্ত অচাপিত * ভাবে মস্তকে স্থাপন করিবে, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চাপিয়া উহা নিম্নে ব্যক্তি-গ্রাহিতা বৃত্তির স্থান † পর্য্যন্ত আনিবে, এবং তথায় কয়েক মুহূর্ত্ত তদবস্থায় রাখিবে এবং ধীরে ধীরে গম্ভীর তাড়িতস্বরে ‡ বলিবে, "দৃঢ়ভাবে তোমার চক্ষু বন্ধ কর। দৃঢ়রূপে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখ।" মস্তক হইতে তথনও হস্ত

---

* মস্তকের উপর অচাপিত ভাবে হস্তরক্ষার উদ্দেশ্য, সহসা হৃত্তত্ত্ববিবেকবিষয়ণী কোনও প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে রক্ষা। অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতেই তাড়িতগতি সঞ্চারিত হয়। মস্তকের উপর হস্ত বিস্তৃত ভাবে রাখিবে এবং অঙ্গুলি নিম্নমুখ হইবে না।

† ব্যক্তিগ্রাহিতা বৃত্তির স্থান, নাসিকার ঠিক উপরে ভ্রূমধ্যে, দ্বিদল কমল।

‡ তাড়িত-স্বরের অর্থ, এই স্বর পাকস্থলী হইতে উঠিবে। তাড়িত ক্রিয়ার কণ্ঠাগত স্বর অতীব অকার্য্যকারী।

অপসারিত করিও না, যে পর্য্যন্ত দুই তিনবার তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহার ললাটে ঘর্ষণ করিতে না পার। এক্ষণে এই শেষবার, ঐ ব্যক্তিগ্রাহিতা বৃত্তির স্থানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আনয়ন কর এবং এমন ভাবে ঐ অঙ্গুলি তথা হইতে উঠাইয়া লও যে, নিদ্রাভাজন যেন জানিতে না পারে। তিন হইতে পাঁচ মিনিট কাল নিদ্রাভাজনকে পূর্ব্ববৎ মুদিত চক্ষুতে থাকিতে দিবে, এই সময়ে তৎপ্রতি বা অন্য বস্তুর প্রতি তুমি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া মনোযোগের সহিত যে উদ্দেশ্যে এই ক্রিয়া করিতেছ, সেই বিষয় চিন্তা করিতে থাকিবে। তৎপরে পুনরায় বাম হস্ত দ্বারা পূর্ব্ববৎ দক্ষিণহস্তকৃত শেষ ক্রিয়া অর্থাৎ বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা পুনরায় তাহার ব্যক্তিগ্রাহিতা বৃত্তির স্থান চাপিয়া ধরিবে এবং ছয়বার অপরোক্ষ ভাবে তাড়িত-ন্যাস দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার চক্ষুর নিকটে পরিচালন করিবে। অতঃপর ধীরভাবে তোমার বামহস্ত নিদ্রাভাজনের মস্তক হইতে অপসারিত করিয়া উভয় হস্ত তাহার চক্ষুর নিকটে নয়বার অপরোক্ষভাবে তাড়িত-ন্যাস পরিচালন করিবে এবং পরীক্ষার জন্য চিন্তাপূর্ণ স্বরে তাহাকে বলিবে যে "তোমার চক্ষু দৃঢ় বন্ধ আছে, তুমি কখনই উন্মীলিত করিতে পারিবে না। তুমি চেষ্টা করিতে পার কর, কিন্তু কখনই তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে না।" এইরূপ ভূমিকার পর, অধিকতর দৃঢ়স্বরে বলিবে, "কখনই না, শতবার চেষ্টা কর,—কিন্তু পারিবে না,—চেষ্টা করিয়া দেখ, কিন্তু পারিবে না।" যখন দেখিবে সত্য সত্যই নিদ্রাভাজন চক্ষু উন্মীলনে অসমর্থ হইবে, তখন তোমার উভয় হস্ত তাহার স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিবে এবং দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিবে। অতঃপর বিপরীতমুখী তাড়িত-ন্যাস সহযোগে তাহার নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষে দৃষ্টি স্থাপিত করিবে এবং তাড়িতাকর্ষণ পাসদ্বারা তাহাকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিবে। এইরূপ করিলেই সে তোমার আয়ত্তীভূত হইয়াছে

বুঝিবে এবং তদ্দ্বারা তখন তোমার অভীপ্সিত ক্রিয়া সাধন করাইয়া লইবে।

যখন তুমি কোনও নিদ্রাভাজনের উপর পাস দিতে যাইবে, তখন— বিশেষতঃ মস্তক হইতে পদের পরিচালন কালে তুমি দৃঢ়তার সহিত ইচ্ছা করিবে যে,—সে যেন চক্ষু উন্মীলিত করিতে না পারে। যদি সে চক্ষু নিমীলিত করে, তাহা হইলে এ ক্রিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহার হস্ত তোমার হস্তের মধ্যে রাখিবে এবং তাহাকে দৃঢ়তার সহিত তোমার নেত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিতে বলিবে। তাহা হইলে তাহার নেত্রদ্বয় ক্রমে বিকম্পিত ও পরে মুদ্রিত হইয়া আসিবে। যদি এইরূপে নিমীলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহার ব্যক্তিগ্রাহিতা বৃত্তির স্থানে পূর্ব্ববর্ণিতভাবে স্থাপন করিবে এবং তাহাকে মুদ্রিত চক্ষুতেই অবস্থিত রাখিয়া পূর্ব্ববৎ পাস দিতে থাকিবে।

বহুসংখ্যক তাড়িত-পরিচালক, নিদ্রাভাজনগণকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিলেও তাহারা সে আদেশ পালন করে না। তাহার কারণ, তাঁহারা পাস দিবার সময় এত অধিক সংখ্যক ইচ্ছাশক্তি নিদ্রাভাজনের প্রতি পরিচালন করেন যে, তাহারা ধারণা করিতে পারে না। এমত স্থলে নিদ্রাভাজনের তাড়িত-নিদ্রা অতি সত্বর ভঞ্জন করা আবশ্যক। এ সমুদয় ভ্রমের কার্য্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাভাজনকে আয়ত্তে রাখা আবশ্যক ততক্ষণ নিয়মিত প্রণালীতে, নিয়মিত পাসমাত্র প্রয়োগ যেমন আবশ্যক তদ্রূপই ইচ্ছাশক্তিও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যিনি অস্থির চিত্ত অসংখ্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ-কর্ত্তা, তাঁহার এই অকৃতকার্য্যতা হইতে অব্যাহতি লাভ সুদূর-পরাহত। যদি তুমি নিদ্রাভাজনকে আয়ত্তে আনিতে না পার, তাহা হইলে তাহার মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে বিপরীত তাড়িত-পাস প্রয়োগ করিবে। এইরূপ করিলেই তুমি তাহাকে আয়ত্তে

আনিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর তাহার প্রতি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে। যদি এইরূপে তাহার হস্তপদাদি বদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্থানে পাস দিবে। তাহা হইলে ঐ বদ্ধতা নিরাময় হইবে। এই পাস তোমার বাম হইতে দক্ষিণে পরিচালনা করিবে, কিন্তু সে জন্য নিদ্রাভাজনের অতি নিকটস্থ হইবার কোন আবশ্যক নাই। তবে তোমার তাড়িতাকর্ষণ-পাস পরিচালনে যখন সে অগ্রগামী হইতে থাকিবে, তখন অবশ্য তোমাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হইবে। ইহাও উপদেশ দেওয়া আবশ্যক যে, কোনও নূতন ব্যক্তিকে নিদ্রিত ও তাহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইলে, তাড়িতাকর্ষণ-পাস ব্যবহার কালে তুমি মনে যেমন ইচ্ছা করিবে, মুখেও তাহাকে তদ্রূপ নেত্র নিমীলিত করিতে বলিবে। তাহা হইলে পূর্ণতঃ তাড়িতাকর্ষণ-পাসের বলে তুমি যেমন দণ্ডায়মান হইবে এবং যেমন গমন করিবে, তোমার পাস পরিচালন কালে তাহার অঙ্গভঙ্গী দর্শন করিলেই সে কি পরিমাণে তোমার আয়ত্তীভূত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। এইরূপ-প্রক্রিয়ায় সুবিধা এই যে, কি গুপ্ত কি প্রকাশ্যভাবে বহুজন সমক্ষে তাড়িত পরিচালনের পরীক্ষায় ইহা অধিকতর শীঘ্রত্ব ও নিশ্চয়তার অনুকূল। এই প্রক্রিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও সমধিক ফলপ্রদ।

অন্য প্রকারের প্রণালীর কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা ডাক্তার জে. বোবী ডড্স সাহেব (Doctor J. Bovee Dods) তাঁহার লিখিত "ফিলসফি অব্ মেস্মেরিজম্" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি এবং আমার অনেক বন্ধু এই প্রণালীতে খুব শীঘ্র শীঘ্র মেস্মেরিজ করিতে পারিয়াছি ও পারিয়াছেন।

২। ডড্ সাহেবের প্রণালী—মানুষের বাহুমূল হইতে কণুই পর্য্যন্ত একখানি হাড় আছে। ঐ কণুই হইতে মণিবদ্ধ হাতের

সন্ধিস্থল,—(কব্জি) পর্য্যন্ত দুইখানা হাড় আছে। ঐ দুইখানা হাড়ের যে খানা কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিকে অবস্থিত আছে, তাহাকে অল্‌নার অস্থি বলে। সেই অল্‌নার অস্থির উপর দিয়া যে শিরা চলিয়া গিয়া কনিষ্ঠা অঙ্গুলি ও অনামিকার মধ্যভাগে আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা সকল বিস্তার করিয়াছে, তাহাকে অল্‌নার শিরা বলে।

মেস্‌মেরিজম্ করিবার সময়ে নিদ্রাকারক নিদ্রাভাজনের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও অনামিকার মূলের এক ইঞ্চ ঊর্দ্ধে, ঐ অল্‌নার শিরা ও তাহার শাখা প্রশাখা স্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা সকল এমন ভাবে চাপিয়া ধরিবেন যেন ঐ অল্‌নার শিরা সমস্ত শাখা প্রশাখার সহিত চাপিয়া আবৃত হইয়া পড়ে। চাপ এমত দৃঢ়রূপে দিতে হইবে যে তাহাতে নিদ্রাভাজনের ঐ স্থানে কোন বেদনা বা অসুখের কারণ উপস্থিত না হয়। তৎপরে নিদ্রাভাজন ও নিদ্রাকারক উভয়ে একদৃষ্টে পরস্পরে নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। এই রূপে মিনিট খানেক কাল অল্‌নার শিরা চাপিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে হইবে, পরে নিদ্রাভাজনের নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিদ্রাকারক তাহার অঙ্গুলিদ্বারা নিদ্রাভাজনের চক্ষুর পাতার উপরে অতিশয় মৃদু ও কোমলভাবে ঐ পাতার উপর হইতে নিম্নে বারম্বার মর্দ্দন করিবে। তৎকালে নিদ্রাভাজন তাহার নয়ন নিমীলিত করিয়া রাখিবে, কদাপি উন্মীলিত করিবে না। নিদ্রাকারককে অতীব দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত একার্য্য করিতে হইবে। তৎপরে নিদ্রাকারক, নিদ্রাভাজনের মস্তকের উপর অর্থাৎ মূর্দ্ধাদেশে সহস্রারপদ্মের উপর হস্ত রাখিয়া, আজ্ঞা-চক্র অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানের অপেক্ষাকৃত নিম্নে * বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা

* আজ্ঞাপদ্মং ভ্রূবোর্ম্মধ্যেহক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী॥
শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুংসাং পরমহংসোঽয়ং যজ্‌জ্ঞাত্বা নাবসীদতি।—শিবসংহিতা।

ঐ শাখাপ্রশাখাদি সমেত অল্নার শিরা যেরূপ ধারণ করা হইয়াছে, সেইরূপেই ধৃত রাখুন অর্থাৎ উহা ছাড়িয়া দিয়া কার্য্য করিবেন না। এইরূপ করিলেই মিস্মেরিজ করা হইবে। মেস্মেরিজম্ হওয়ার লক্ষণ এই যে, নিদ্রাভাজন তাহার চক্ষু উন্মীলিত করিতে অশক্ত হইলে, মিস্মেরিজ হইয়াছে বোধ করিতে হইবে এবং তদন্যাথায় মেস্মেরিজম্ হয় নাই। এমত অবস্থায় ঐরূপ প্রক্রিয়া দুই তিনবার করিলেই মিস্-মেরিজ হইবে। নিতান্ত না হইলে জানা যাইবে যে, নিদ্রাকারক ও নিদ্রাভাজনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সমতা প্রযুক্ত মিস্মেরিজ হইতে পারিবে না।

৩। মিঃ ডিলুম এই প্রণালী বলেন,—নিদ্রাভাজনকে সম্মুখে বসাইয়া নিদ্রাকারক তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আপনার অঙ্গুলির মধ্যে রাখিয়া এরূপ ভাবে আকর্ষণ করিবে, যেন ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কোন সংলগ্ন বস্তুকে মুছিয়া দিতেছে। এ দৃষ্টি সমভাবেই থাকিবে, কেবল পাঁচমিনিট পরে অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া এক মিনিট করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ অঙ্গুলি ধারণ করিবে ও পাস দিবে। ইহাতে শীঘ্রই মেস্মেরিজম্ হইয়া থাকে।

৩। অন্য প্রকার প্রণালী—মিডিয়ান্ নার্ভ মণিবন্ধের নিকট, করতলের উপরিভাগে, মধ্যস্থানে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশে অবস্থিত আছে। নিদ্রাভাজনের ঐ মিডিয়ান্-শিরা, নিদ্রাকারক বৃদ্ধাঙ্গুলির পর্ব্বদ্বারা মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিবেন। এইরূপে মেস্মেরিজম্ করা হইবে। এই প্রক্রিয়াদ্বারা মিস্মেরিজ হইলে তাহাকে যাহা করিতে বলিবেন, সে তাহাই করিবে ও তাহার স্বকীয় হিতাহিত বা বিবেকশক্তি কিছুই থাকিবে না।

শিষ্য। আপনি যে তাড়িতপাস, বিপরীত তাড়িত-পাস ও তাড়িত-সংহরণ ক্রিয়ার কথা বলিলেন, ঐ গুলি কি প্রকার?

গুরু। পাস আর কিছুই নহে,—হস্ত সঞ্চালন। ইহা দুইরূপে সমাধা করিতে পারা যায়, যথা—নিদ্রাকারক বা শক্তিসঞ্চালক নিদ্রাভাজন বা মোহিতের বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়া কিম্বা বসিয়া, নিদ্রাভাজনের গাত্র স্পর্শ না করিয়া, মস্তক ও কপাল দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে মুখের উপর দিয়া, উদর কিম্বা পদ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে সাবধানে এইরূপে অঙ্গুলি বিস্তার পূর্ব্বক হস্ত সঞ্চালন করিবে, যেন তাহার কোন অঙ্গুলি ঐ নিদ্রাভাজনের শরীর স্পর্শ না করে; এবং হস্তচালনার সময় ঐ নিদ্রাভাজনের গাত্র ঘেঁসিয়া যায়, আর মস্তক হইতে কপাল ও শরীরের উপর দিয়া হস্তচালনা করিয়া আনিয়া হস্তাঙ্গুলি মুঠ করিয়া ঐ হস্ত মস্তকোপরি লইয়া পুনর্ব্বার হস্তাঙ্গুলি মেলিয়া চালনা করিবে, আর ঐরূপ চালনা করিতে করিতে এক একবার নিদ্রাভাজনের চক্ষু হস্তাঙ্গুলিদ্বারা আচ্ছাদিত করিলে ভাল হয়। ফল কথা, যে প্রণালীতে যে ভাবে পাস দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা দিবে। পাস দিবার প্রণালীর স্থূল ভাব এই যে, নিদ্রাকারক তাহার দুই হস্ত এরূপে সঞ্চালিত করিবে যে, কোন প্রকারে তাহার উভয় হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ নিদ্রাভাজনের গাত্র স্পর্শ না করে; কিন্তু উহার গাত্র ঘেঁসিয়া হস্তচালনা করিতে হইবে; অথবা নিদ্রাভাজনের ঐ প্রকারে কপালের উভয় পার্শ্বদেশের উপরি ভাগ দিয়া নামিয়া ও বাহুযুগের উপর দিয়া সঞ্চালিত করা প্রয়োজন।

মস্তকের দিক্ হইতে নিম্ন দিকে হস্তচালনা করাকে পাস দেওয়া বলে এবং পায়ের দিক হইতে অর্থাৎ নিম্ন দিক হইতে ঊর্দ্ধ দিকে হস্ত চালনার নাম বিপরীত পাস।

তাড়িত সংহরণ ক্রিয়া—নিদ্রাভাজনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে এবং তাহার হস্ত স্বকীয় হস্ত মধ্যে লইবে। তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার প্রত্যেক হাতের শিরা (Ulner Nerve) চাপিয়া ধরিবে।

অতঃপর তোমার উভয় হস্ত স্থিরভাবে তাহার মস্তকের উভয় পার্শ্বে সংস্থাপিত করিবে এবং ব্যক্তিগ্রাহিতা বৃত্তির স্থানে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অচাপিত ভাবে রক্ষা করিবে। অনুভূতি ব্যক্তির (Organ of Perception) উপর তিন চারিবার পাস টানিয়া আনিবে। প্রত্যেকবার হস্ত স্থানান্তরিত করিবে ও ঝাড়িয়া ফেলিবে, অতঃপর তাহার মুখের উপর তাড়িত-পাস পরিচালন করিবে। তাহার মস্তকের উপর তোমার হস্ত আনয়ন করিবে এবং তাড়িত শক্তি-সংহরণ অভিপ্রায় মনে মনে স্থির করিয়া বলিবে, "ঠিক—সব ঠিক হইয়া গিয়াছে।" অতঃপর তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে, পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিপরীতমুখী তাড়িত-পাস পরিচালন করিবে।

মেস্‌মেরিজম্ করিতে হইলে নিদ্রাভাজনকে ইজিচেয়ার বা কোচের উপর বসাইয়া পাস দেওয়াই সুবিধা, তদভাবে নিদ্রাভাজনকে কোনস্থানে হেলানভাবে বসাইয়া কিম্বা কোন শয্যার উপরে চিত করিয়া শয়ন করাইয়া পাস প্রদান করিবে।

শিষ্য। নিদ্রাভাজন যে প্রকার উত্তরাদি দেয়, তাহার একটা ঘটনা বলুন।

গুরু। শ্যামবাবু আহিরীটোলায় বাস করিতেন, তাঁহার নিতান্ত অনুরোধে আমার একটি বন্ধু তাঁহার বাড়ীতে মেস্‌মেরিজম্ করিতে স্বীকৃত হয়েন। সেখানে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাঁহার মুখে যাহা শ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা এই—

শ্যামবাবুর অনুরোধে তাঁহার নিকট দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নিদ্রাভাজন স্থির করিয়া, তাহাকে যথোপযুক্ত ভাবে উপবেশন করাইয়া পাস দিতে আরম্ভ করিলাম। ছেলেটির দেহটী সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ—তাহাকে দেখিয়া আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সে শীঘ্রই নিদ্রিত

হইয়া পড়িল, পরীক্ষাদ্বারা বুঝা গেল যে, সে সম্পূর্ণ ভাবে নিদ্রিত এবং আয়ত্তীভূত হইয়াছে, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,--তুমি কি দেখিতেছ ?

বালক বলিল, "আমাদের মেজ বউ ঐ বাগানে গাঁদা ফুলের ঝাড়ের কাছে বসিয়া আছে।"

আমি তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার অন্দর মহলের পশ্চাদ্ভাগে একটু জায়গা আছে, সেখানে একটু বাগান মত করিয়াছি। দুইটি আমের গাছ, একটা নারিকেল গাছও সেখানে আছে।"

আমি। মেজ-বৌ কে ?

শ্যামবাবু বলিলেন, "আমার বড় ছেলের স্ত্রী। গত বৎসরের প্লেগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

আমি তখন বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের মেজ-বৌ ওখানে কি করিতেছেন ?"

বালক। তিনি আমাকে কি বলিবেন বলিয়া ডাকিতেছেন,—যাব ?

আমি। দোষ কি !

বালক। উঃ! দেখ্‌তে পেয়েছেন ?

আমি। কি দেখ্‌তে পাব ?

বালক। আমাদের সেই পুরুতঠাকুরের ছেলে আমগাছের উপর বোসে আছে। মেজ-বৌ আমাকে তাকে দেখিয়ে দিল।

আমি শ্যামবাবুর মুখের দিকে চাহিলাম, তিনি বলিলেন—"কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

আমি নিদ্রাভাজন বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

বালক। আমাদের পুরুতঠাকুরের ছেলে সেই বাঁশী, সে এই আমগাছে বোসে আছে, সে অনবরত নাকি আমাদের বাড়ীর অনিষ্ট চেষ্টা কচ্ছে। মেজ-বৌ তাকে দেখিয়ে দিয়ে আমাকে বোল্‌চে, তোমরা যাতে পার, ওকে এখান হইতে তাড়িয়ে দাও। নইলে ও তোমাদের সর্ব্বনাশ কোর্‌বে। অনবরত ও সেই চেষ্টাতেই ঘুর্‌চে। আমি তাহার গতিরোধ কোর্‌চি বোলে সে কিছুই কোরে উঠতে পার্‌চে না। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ—আমি তার শক্তির সঙ্গে পেরে উঠ্‌চি না। শক্তি সঞ্চালনে ক্লান্ত হোয়ে পোড়েছি। তোমরা এর কোন বিহিত বিধান করো।

আমি। তোমাদের মেজ-বৌকে জিজ্ঞাসা কর, কি করিলে তাড়ান যায়?

বালক। মেজ-বৌ বোল্‌ছে, তান্ত্রিকী কার্য্য করিতে।

আমি। তোমাদের পুরুতের ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর, সে কেন তোমাদের উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে?

বালক। আমি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কথা কহিল না।

আমি। আবার জিজ্ঞাসা কর, যদি এবারেও কথা না কহে, তবে তোমাদের মেজ-বৌকে জিজ্ঞাসা কর।

বালক। সে কথা কহিল না,—মেজ-বৌ বলিল, ও ব্রাহ্মণ—তোমার সহিত কথা কহিবে না। তাহা হইলে অনেক জন্ম আবার উহাকে শূদ্র হইতে হইবে। কেন না তুমি শূদ্র, তোমার আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। তুমি কখনও ত আমাদের এখানে আসনি।

বালকের চৈতন্য উৎপাদন করা হইল। তারপর সে আর কিছুই বলিতে পারে নাই। সন্ধানে শ্যামবাবু জানিলেন, তাঁহাদের পুরোহিত

ঠাকুরের বাঁশী নামক সাত বৎসরের একটি পুত্র দুই বৎসর হইল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু সে যে কেন তাঁহাদের অনিষ্ট কামনা করিতেছে, তাহার কোন কারণই নির্ণয় হইল না। যাহা হউক, শ্যামবাবু একজন উপযুক্ত তান্ত্রিক দ্বারা ভূতশান্তি করাইয়াছিলেন।

শিষ্য। মেজ-বৌয়ের প্রেতাত্মা বলিয়াছিল, উনি ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্র। ভাল সেখানেও কি ব্রাহ্মণ শূদ্র আছে না কি?

গুরু। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, যতক্ষণ গুণের শেষ না হয়, ততক্ষণ জাতিত্বেরও ধ্বংস হয় না। গুণের বা কর্ম্মের শেষ হইলেই সেই আত্মিক ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক ছাড়িয়া যায়। আত্মিকগণের স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি এই দেহের মত সমস্তই থাকে,—কেবল স্থূল হইতে সূক্ষ্ম কায়, এই মাত্র প্রভেদ।

নবম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

দূরানুভূতি ও ভাব পরিচালন।

Telepathy and thought Transference.

গুরু। আজ প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল নিয়ত পরীক্ষা দ্বারা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,—হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সাহায্য না লইয়া, মনে মনে খবর চালান যাইতে পারে। আমার মনে যে সকল ভাব বা যে সকল চিন্তার উদ্রেক হয়, অপরকে স্পর্শ না করিয়া বা তাহার ইন্দ্রিয়ের সহিত আমার ইন্দ্রিয়াদির কোন সংযোগ না থাকিলেও, আমি সে চিন্তা, সে ভাব গুলি তাহার মনেও যুগপৎ জাগরূক করিতে পারি। আমরা বাল্যকালে পিতামহীর নিকট ডাকিনী যোগিনীর গল্পে গাছ চালার কথা শুনিয়াছি, আজ পূর্ণবয়স্কাবস্থায় আমাদিগকে বিজ্ঞান বলিতেছেন, গাছের মত মনকে চালিয়া লইয়া যাওয়া যায়। একের মনের সুখ, দুঃখ, উল্লাস, অবসাদ, ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে দূর হইতে অপরের মনে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে। "নিশি-জাগানের"

কথা এদেশে কাহারও কি শুনিতে বাকী আছে? হঠাৎ কোন প্রতীয়মান কারণের অভাবে একজনের পীড়িত দেহ সুস্থ হইল, আর অপর একজন সুস্থ সবল পুরুষ, তৎসঙ্গে সঙ্গে পীড়িত মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন। ভারতের বাবর বাদসাহ ও তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের পীড়ারোগ্যের কথা কে না শুনিয়াছেন? এইরূপ ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে, পরস্পরের মানসিক ক্রিয়া বিনিময়ের নাম দূরানুভূতি বা ভাব পরিচালন।

কেহ যদি বলেন, ব্রাহ্মণ মল্লীনাথ মরিয়া জর্ম্মাণ ম্যাক্সমূলার হইয়াছেন। গদাধর শিরোমণি মরিয়া আচার্য্য গোল্ডষ্টুকার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এড্‌মণ্ড গর্ণি বর্ত্তমান যুগে আধ্যাত্মিক জাতুকর্ণীয় অবতার, আমি তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। বর্ত্তমান যুগে খ্রীষ্টীয় দেশ সমূহে এ সকল তত্ত্বের এত অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় নৈমিষারণ্য বুঝি, সাগর পার হইয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকায় তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। আমরা এই গবেষণা তত্ত্বানুসন্ধান প্রভৃতির দুই একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিব।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রফেসার ব্যারেট (Professor Barret, Royal College of Science Dublin) গ্লাসগো নগরীর বৃটিশ এসোসিয়েশান নামক সমিতিতে, এ বিষয়ে সাধারণ চিত্ত আকৃষ্ট করেন। তৎপরে প্রফেসার সিজুইক (Sidgewick) প্রফেসার ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট (Balfour Stewart) এবং এড্‌মণ্ড গর্ণি প্রভৃতি অনেকেই, তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহারা যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রাথমিক তত্ত্বটি নিম্নলিখিত ভাবে নির্দ্দেশ করিলে বিশেষ কোন দোষ হইবে না। "দুইটি মন একপথে চলিতে হইলে, একই ভাবে এবং একই রূপ চিন্তা করিয়া থাকে।

যাঁহারা একরূপ স্থানে বা একরূপ ভাবনা লইয়া থাকেন, তাঁহাদের

পরস্পরের চিন্তাগুলির ভিতর কেমন একরূপ যেন পারিবারিক সাদৃশ্য থাকে। এই জন্যই কাব্য জগতে এত অনুরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে যাহাকে চুরি বলিয়া মনে করেন, বহু স্থলে তাহা এইরূপ ভাবসাদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অন্য কোন নূতন কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা দেখাইব, কেমন করিয়া দূর হইতে একের ইন্দ্রিয় ব্যাপার অপরের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। যোগনিদ্রাবস্থায় এরূপ বিনিময় বা পরিচালনের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থার কতকগুলি সেইরূপ কার্য্যের দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জাগ্রতাবস্থায় স্বাপদপরিচালন—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ম্যাকম গথরি, জে পি, নামক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, লিভারপুল নগরীতে কোন বস্ত্রের কারখানার প্রধান অংশীদার ছিলেন। শ্রীমতী ই ও শ্রীমতী আর নাম্নী, দুইটি ভদ্রমহিলা. তাঁহার আফিসে কার্য্য করিতেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই এই সকল পরীক্ষা সংসাধিত হয়। এই পরীক্ষার ফল, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, মিঃ গথরি, মিঃ এড্‌মণ্ড গর্ণি এবং মিঃ মায়াসের সাক্ষর সম্বলিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনুবর্ত্তক বা পরীক্ষিত ব্যক্তিদ্বয় শ্রীমতী "ই" ও "আর" এর চক্ষে প্রথমে কাপড় বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পরীক্ষার দ্রব্যগুলি অবস্থানুসারে বোতল বা আবরণের ভিতর পূরিয়া, তাঁহারা কোনরূপে না দেখিতে পান, এরূপ স্থলে রাখিয়া দেওয়া হইল। তাহার মধ্যে যে গুলি তীব্রগন্ধ দ্রব্য, সে গুলিকে বোতলে পূরিয়া গৃহের বাহিরে রাখা হইল। তাহার পর পরীক্ষা আরম্ভ হইল, সে দিন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর।

এড্‌মণ্ড গর্ণি, উরষ্টারশায়ার সস্ নামক বিলাতী খাদ্য দ্রব্যের কতকটা মুখে পূরিয়া, শ্রীমতী "ই" কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি

কোন দ্রব্যের আস্বাদ পাইতেছ ?" শ্রীমতী উত্তর করিলেন "হাঁ,—উরষ্টারশায়ার সসের।" তাহার পর ম্যাকম গথরি ও পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক একটু পোর্ট মদ্য পান করিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার তুমি কোন দ্রব্যের আস্বাদ পাইতেছ।" শ্রীমতী পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর করিলেন, "এমন কোন দ্রব্য, যাহার স্বাদ ইউডি কলোন ও বিয়ার মদ্যের মাঝামাঝি।" তাহার পর মিঃ গথরি একটু ফট্‌কিরি মুখে রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করায়, শ্রীমতী উত্তর দিলেন "এমন কোন দ্রব্য, যাহার স্বাদ কতকটা লৌহচূর্ণ ও কতকটা সির্কা ও কতকটা বিলাতী কালীর মত। আমার মনে হইতেছে, সে যেন আমার ওষ্ঠে লাগিয়া রহিয়াছে। আমি যেন ফট্‌কিরি খাইতেছি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যথা ও বেদনা-চালনা—লিভারপুল নগরীতে মিঃ গথরির বাটীতে এ সকল পরীক্ষা সংসাধিত হয়। পরীক্ষকের নাম মিঃ গথরি, প্রফেসার হার্ডম্যান (Prof. Hardman) ডাক্তার হিকস্ (Dr. Hieks) ডাক্তার হইলা (Dr. Hyla) মিঃ আর সি জন্‌সন্ এফ আর এ, এস, (Mr. R. C. Johnson F.R. A. S.) প্রভৃতি। উল্লিখিত পরীক্ষার ন্যায় এবারও পরীক্ষিত ব্যক্তির চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পরীক্ষকবর্গ একে একে পরীক্ষিতের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া, আপন আপন শরীরের নানাস্থলে চিমটী কাটিতে লাগিলেন, পরীক্ষিত ব্যক্তিও সেই সেই অঙ্গের নিম্নোক্তভাবে নাম করিতে লাগিলেন।

পরীক্ষার নম্বর	আপনার যে অঙ্গে পরীক্ষক চিমটী কাটিয়াছেন তাহার নাম।	উত্তর
১	বাম হস্তের পৃষ্ঠভাগ	দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠভাগ।

২	বামকর্ণের প্রান্তমূল।	দক্ষিণকর্ণের প্রান্তভাগ।
৩	বামহস্তের কব্জি বা মণিবন্ধ।	দক্ষিণ হস্তের কব্জি বা মণিবন্ধ।
৪	বাম হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলি তার দিয়া বাঁধা হয়।	ঐ অঙ্গুলির মূল পর্ব্ব।
ইত্যাদি	ইত্যাদি	ইত্যাদি।

এইরূপ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনার অসংখ্য উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে নিউইয়র্ক নগরীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার ব্লেয়ারথ এম ডি (Dr. Blair Thaw M. D.) যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কতকগুলি ঘটনা উদ্ধৃত করিলাম। এখানেও পরীক্ষিত ব্যক্তির চক্ষু আবরণ বদ্ধ করা হয় এবং পরীক্ষক কোন একটি বর্ণের দিকে চাহিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, বল দেখি তুমি কি বর্ণ দেখিতে পাইতেছ ?

।রীক্ষক কর্তৃক লক্ষিত বর্ণের নাম।	পরীক্ষিত ব্যক্তির সে বিষয়ে প্রথম অনুমান।	পরীক্ষক ব্যক্তির তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় অনুমান।
গাঢ় বা গভীর লাল	গভীর রক্তবর্ণ	
হরিতাভ	হরিতাভবর্ণ।	
হরিদ্রা	গভীর নীলবর্ণ।	হরিদ্রা
গাঢ় রক্ত	নীল	গাঢ় রক্তবর্ণ
গাঢ়নীল	কমলানেবুর রং	গাঢ়নীল।

লেম্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানে Psychology ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান Natural (Philosophy) প্রভৃতির অধ্যাপক খ্যাতনামা

দার্শনিক ডাক্তার ওকরোওইৎঝ (Dr. Ochorowicz) তাঁহার "লা সজেশন মেনট্যাল" নামক গ্রন্থে ভাব পরিচালনা সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষিত উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দুই একটি শুনাইব। এস্থলে পরীক্ষিত ব্যক্তির নাম শ্রীমতী "ডি"। তাহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল এইরূপ, বলা বাহুল্য পরীক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় আবদ্ধ করা হয়।

পরীক্ষক পদার্থ বা যাহা পরীক্ষক দেখিতেছিলেন বা স্পর্শ বা মনে করিতেছিলেন।	পরীক্ষিত ব্যক্তির উত্তর।
১। এম্ এন্ নামক এক ব্যক্তির গঠিত প্রতিমূর্ত্তি-দর্শন।	একখানি ছবি, একজনের গঠিত মূর্ত্তি দেখিতেছেন।
২। একটী হীরকাঙ্গুরী	আপনার হাতে একটি উজ্জ্বল গোলাকৃতি সামগ্রী—হীরকাঙ্গুরী দেখিতেছি।
৩। পরীক্ষক "প্যারিস" শব্দ মনে করিতেছিলেন।	আপনি "প্যারিস" শব্দটি মনে করিতেছেন।
৪। পরীক্ষক "বারাবাণ্ট" শব্দটি মনে করিতেছিলেন।	আপনি "বার" (পরীক্ষক কথা না কহিয়া মনে মনে পরীক্ষিত ব্যক্তিকে এ উত্তরদানে সাহায্য করিবার পর) "বারাবাণ্ট" শব্দটি ভাবিতেছেন। *

* La Suggestion Mentale by Dr. Ochorowicz P P 69 75 70

আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইলাম, ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষ আপনি হাসিয়া পরকে হাসাইতে পারে, আপনি কাঁদিয়া পরকে কাঁদাইতে পারে। আপনি কোন দ্রব্য খাইলে দূর হইতে পরকে তাহার আস্বাদ অনুভব করান যাইতে পারে। কোন শারীরিক ক্লেশ, কোন চক্ষু-দৃষ্ট চিত্র, কোন মানসিক সঙ্কল্প দূর হইতে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় অপরের দেহ ও মনের ভিতর যুগপৎ ও তদ্রূপ ভাবে উপস্থিত বা জাগরূক করিতেও পারা যায়। ডায়িনী-খাওয়া বৃত্তান্ত, কোন ঈর্ষিত বৃদ্ধার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের পরিণাম ব্যাপার নহে, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য। বাহুস্তম্ভ, গতিস্তম্ভ প্রভৃতির জন্য যাঁহারা তান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তাঁহারা আদৌ ভ্রান্ত নহেন। গতিস্তম্ভ প্রভৃতির কতকগুলি প্রামাণিক বা বাস্তবীকৃত উদাহরণ সাহায্যে, সে সকল বিষয়ের মৌলিক তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যোগনিদ্রা বা চৌম্বকিক অবস্থায়, গুরু শিষ্যের ভিতর অনুভূতি বিনিময়ের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং সে বিষয়ের দ্বিতীয়বার অবতারণা করিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, তাহা প্রয়োজন বলিয়া না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনেক পুরাতন আচার্য্য একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, বহু চেষ্টায়ও কোন কোন যোগনিদ্রিত ব্যক্তির অঙ্গ চালনা বা শারীরিক গতি স্তব্ধ করিতে পারা যায় না। *

মিঃ রিচার্ড নামক জনৈক খ্যাতনামা আত্মতত্ত্ববিৎ সহজেই যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। মিঃ স্মিথের কর্তৃত্বাধীনে তাঁহার স্বপ্নজ্ঞান বা (Clairvoyance) উৎপন্ন হইত। আমরা পরীক্ষাকালে একদিন ১২টি

* Phantasism of the Living Vol. I. P P 89–91.

"হাঁ" ও "না" এর একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া মিঃ স্মিথের হস্তে প্রদান করি। মিঃ রিচার্ডকে হিপনোটাইঝ করা হইল। সে তালিকা হইতে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইতে লাগিল। মিঃ স্মিথ আপনার নীরব ইচ্ছাশক্তির বলে যতবার মনে করিলেন, ততবারই মিঃ রিচার্ডের উত্তর করিবার ক্ষমতা রোধ করিতে লাগিলেন। অবশ্য ইহা যোগনিদ্রার কথা। যাহাই হউক মানুষের যে; ইন্দ্রিয় বা দৈহিক শক্তির স্তম্ভ করা যাইতে পারে ইহার দ্বারা তাহার স্পষ্ট ও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। *

অন্যপক্ষে নীরব ইচ্ছাশক্তি দ্বারা স্তম্ভনের পরিবর্ত্তে আমরা অনেক ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্মাইতে পারি। ফলতঃ আমরা যে আমাদের অনেক ব্যাপার অপরের ভিতর পরিচালিত করিতে পারি, প্ল্যাঞ্চেট্ যন্ত্র তাহার উদাহরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্ল্যাঞ্চেট্।

এইখানি হৃৎপিণ্ডাকৃতি (বা পানের আকার) পাতলা তক্তার তিনখানি চাকাওয়ালা পায়া আছে, একথা বলিলেই মোটামুটি আমরা প্ল্যাঞ্চেটের চেহারাটা ভাবিয়া লইতে পারি। ইহার মাথার দিকে একটা ক্ষুদ্র গর্ত্ত থাকে, ইহার ভিতর লেডপেন্সিল প্রবেশ করিয়া দিতে হয়। তাহার পর যন্ত্রটিকে একখানি পরিষ্কার কাগজের উপর রাখিয়া, এক ব্যক্তি তাহার উপর দুইটি হাত রাখিয়া, কোন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ভাবনা করিতে থাকেন। আচার্য্য একটু দূরে বসিয়া এই সকল ক্রিয়া

* Proceedings of the Soc Psych Research Vol. 295

পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, দেখিতে দেখিতে যন্ত্র মধ্যে সেই ভাবিত আত্মার আবির্ভাব হয়। তখন তাঁহাকে যে প্রশ্নই করা যাউক না কেন, আত্মা আপনার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে তৎসমুদয়েরই যথাযথ উত্তর দিয়া থাকেন।

প্রেতত্ব, আতিবাহিক অবস্থা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সত্য হইলেও জগতে সকল বিষয়ের জন্য বিদেহী আত্মাকে ধরপাকড় করিলে, তাহার উপর অন্যায় জবরদস্ত করা হয়। যাহা বুঝিতে পারি না, যাহার সহজে কোন যুক্তি তর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাই ভূতের কার্য্য এরূপ বিবেচনা করা মনুষ্য বুদ্ধির স্বধর্ম্ম। যতদিন আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি হয় নাই, ততদিন অসভ্য জাতির নিকট ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতের ন্যায়, আমাদিগের নিকট প্ল্যাঞ্চেট্‌ও একটি প্রেতাধিষ্ঠিত যন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, প্ল্যাঞ্চেটে লেখে কে? কি কথা লিখে? এড্‌মণ্ড গর্ণি বলেন, যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তির যেইরূপ জ্ঞানের উদ্রেক হয়, জাগ্রত অবস্থায় প্ল্যাঞ্চেট্ লেখকেরও সেইরূপ জ্ঞানেরই কার্য্যই হইয়া থাকে। মনুষ্যের যে দুইটি জ্ঞান আছে, তাহা আমাদের দেশে সকল দর্শনশাস্ত্রেরই ভিত্তিভূমি। একটি জ্ঞান ইন্দ্রিয় জন্য বা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত অর্থাৎ এই জ্ঞানটিতে আমরা সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। মনুষ্যের আমিত্ববোধ, এই বাহ্যিক বা উপরস্থ জ্ঞান লইয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয় জন্য বহির্মুখ ও সজ্ঞাত বলিয়া, এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। জীবনে অপরটির কথা ভাবিবার অবসর আমাদের প্রায় ঘটিয়াই উঠে না। অবিজ্ঞাত জ্ঞান, এইরূপ শব্দ ন্যায়দুষ্ট না হইলে, আমরা এ জ্ঞানকে অবিজ্ঞাত জ্ঞান নামে অভিহিত করিতে পারি। নিদ্রাতত্ত্ব শীর্ষক অধ্যায়ে যে নিগূঢ় জ্ঞানের কথা বর্ণিত হইয়াছে

অর্থাৎ যে জ্ঞান মনুষ্য দেহের গভীরতম প্রদেশে আশ্রয় লইয়া জীবাত্মার অনুসঙ্গ করিয়া থাকেন, তাহা ও এই অবিজ্ঞাত জ্ঞান একই পদার্থ। অবিজ্ঞাত জ্ঞানশক্তি আত্মার অনুসঙ্গী বলিয়া তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মী, সুতরাং সীমাবদ্ধ, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানাপেক্ষা, তাহার অধিকার ভূমি অনেক বিস্তৃত। ফলকথা, মানুষ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানে অনেক বিষয় জানিতে না পারিলেও গূঢ়াসীন, আধ্যাত্মিক, অবিজ্ঞাত জ্ঞান সাহায্যে জগতে প্রায় সকল তত্ত্বই অবগত হইতে পারে। কথাটা আরো সহজ করিয়া বুঝিতে হইলে তোমাকে মনে করিতে হইবে, মনুষ্যজ্ঞানে যেন দুইটি স্তর আছে, একটি উর্দ্ধতন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত বহির্মুখ, সুতরাং সীমাবদ্ধ। অপরটি নিম্নস্থ আধ্যাত্মিক অন্তর্মুখ, অসীম। শেষোক্তটি আধ্যাত্মিক বা আত্মার ধর্ম্মপ্রাপ্ত বলিয়াই, তাহার অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা অতি অল্প। প্রথমটি জ্ঞানের নির্ঝরিণী, দ্বিতীয়টি জ্ঞানের ভূগর্ভস্থ জলরাশি। প্রথমটি শুধু বহির্জগৎকে স্পর্শ করে, দ্বিতীয়টি গূঢ়াসীন, আত্মাধিষ্ঠিত বলিয়া, জগতের অনেক আক্ষেপিক অধিকতর জ্ঞেয় বিষয়ে তাহার প্রবেশ শক্তি আছে।
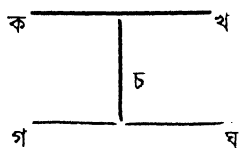
মনে কর, ক খ চিহ্নিত সীমাবদ্ধ সরল রেখাটি বাহ্যিক বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, আর গ ঘ নামক অসীম সরল রেখাটি গূঢ়াসীন বা অবিজ্ঞাত জ্ঞানের নিদর্শক। সুতরাং গ ঘ জ্ঞানটি অনন্ত বিস্তৃত। এক্ষণে চ চিহ্নিত চিত্তরোধ নামক মার্গে মনকে প্রেরণ করিতে পারিলেই, আমরা গ ঘ চিহ্নিত অনন্ত জ্ঞানের স্তরে পৌঁছাইতে পারি। অর্থাৎ মনকে বহির্জগৎ হইতে আকৃষ্ট করিয়া চিত্তবৃত্তি রোধ করিলে, মন সহজেই গ ঘ নামক অসীম জ্ঞানের স্তরে ডুবিয়া পড়ে। প্ল্যাঞ্চেট্

ব্যবহারকালে, কোন প্রেতাত্মার কথা ভাবিতে ভাবিতে, কর্ত্তার নামটি একরূপ যোগস্থ হইয়া জীবচৈতন্যের এই নিম্নতর স্তরে অধিরূঢ় হয় ও জীবচৈতন্যের এই ভাগ, শুদ্ধ চৈতন্যের রাজ্যের সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া, জাগ্রত অবস্থায়ও তিনি অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আশ্চর্য্যজনক যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে সক্ষম হন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা নিম্নে কতকগুলি বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত ঘটনার উল্লেখ করিলাম—

মিঃ পি, এচ, নিউনহ্যাম, ডেভেনপোর্টের মেকার নগরীতে উচ্চ পুরোহিতের (Vicar) কার্য্য করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নিউনহ্যাম অনেক সময়, প্ল্যাঞ্চেট্ সাহায্যে এমন অনেক জিনিষ, অনেক ভাষায় কথা লিখিতেন যে সকল বিষয়, যে সকল ভাষা তিনি কখনও কর্ণে শুনেন নাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারি, নিম্নলিখিত বিষয়ের তিনি এইরূপ উত্তর লিখেন। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার সময় শ্রীমতী একরূপ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য ছিলেন।

প্রশ্ন। প্ল্যাঞ্চেট্‌কে কিসে নাড়ায়? লেখকের মস্তিষ্ক না অন্য কোন বাহ্যিক শক্তিতে তাহা চালিত হয়?

উত্তর। ইচ্ছাশক্তি।

প্রশ্ন। কাহার ইচ্ছাশক্তি? লেখকের না অন্য কোন বাহ্যিক প্রেতাত্মার?

উত্তর। আমার—আপনার সহধর্ম্মিণীর ইচ্ছাশক্তি।

প্রশ্ন। আমার স্ত্রীর আদরের নাম কি? (প্ল্যাঞ্চেট্) ঠিক সেই নামটিই লিখিল।

প্রশ্ন। তোমার নাম কি?

উত্তর। আমার নাম যাহা তাহাই—

প্রশ্ন। আমরা তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, ভাল করিয়া বল।

উত্তর। আমি আপনার স্ত্রী।

সেদিন আর বিশেষ কিছু বাহির করিতে পারা গেল না। পুনরায় ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পরীক্ষা বসিল—

প্রশ্ন। প্ল্যাঞ্চেট্ লিখিতেছ তুমি কে?

উত্তর। আপনার স্ত্রী।

প্রশ্ন। আমার স্ত্রী কি অন্য কাহারও উপদেশ মত লিখেন? যদি তাহাই হয়, তবে সে ব্যক্তির নাম কি?

উত্তর। আত্মা।

প্রশ্ন। কাহার আত্মা?

উত্তর। আপনার স্ত্রীর আত্মা।

প্রশ্ন। আমার স্ত্রী এত বিষয় জানিতে পারেন কি করিয়া?

উত্তর। অবিজ্ঞাতে আপনার স্ত্রীর আত্মা তাহাকে সাহায্য করেন।

প্রশ্ন। যে সকল জিনিষ তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, এমন সকল বিষয়, আমার স্ত্রীর আত্মাই বা জানিতে পারেন কিরূপে?

উত্তর। কোন বাহ্যিক উপায়ে নহে।

প্রশ্ন। আন্তরিক উপায় হইলেই বা তাহা কিরূপ উপায়?

উত্তর। আপনি বুঝিতে পারিবেন না।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, ইংলণ্ডের একস্থানে একটি প্ল্যাঞ্চেট্-সভা সমাহুত হয়। শ্রীমতী এচ, শ্রীমতী বি, শ্রীমতী এম, মিঃ গ্রীন, মিঃ আর এচ্ ব্যার্টর‍্যাম প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থলে উপনীত থাকেন। মিঃ গ্রীন সভাস্থ ব্যক্তিগণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া বসিয়া প্ল্যাঞ্চেট্ চালাইতে লাগিলেন ও শেষোক্ত ভদ্রলোকটি তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন—

প্রশ্ন। আজ বৈকালে আমি কি করিতেছিলাম?

উত্তর। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতেছিলেন।

প্রশ্ন। মিঃ রজসে'র স্ত্রী এখন কেম্ব্রিজ সহরে কি করিতেছেন?

উত্তর। তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না, তবে এই বলিতে পারি, এই সভায় কোন কার্য্যোপলক্ষে মিঃ রজস' এখানে আসিতেছেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই মিঃ রজস' আসিয়া সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন।

প্রশ্ন। মিঃ রজসে'র স্ত্রী কোথা গিয়াছেন?

উ। দূরে—অনেক দূরে। লণ্ডন কি সুন্দর সুন্দর সহর!—ব্লেচনি! —ব্লেচনি যাত্রী সকলে এই ষ্টেশনে অবতরণ করেন। (অনুসন্ধানে জানা যায়, মিসেস্ রজস' বাস্তবিকই সেই দিন সেই সময়ে উল্লিখিত ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া রেলে লণ্ডনে যাইতেছিলেন।)

প্রশ্ন। আজকে এসোসিয়েশন বল-খেলায় কোন্ পক্ষের জয় হইয়াছে?

উ। অক্সফোর্ড—

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা একথা জানিতেন, তাঁহারা এ উত্তরের যথার্থত্বে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। *

শিষ্য। প্ল্যাঞ্চেট্ যে প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। এই যন্ত্রের আকার বোঁটাহীন পানের ন্যায়। পাতলা সিকি ইঞ্চি বেধবিশিষ্ট কাষ্ঠের দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ত্রিকোণ তক্তার তিন দিকে তিনটি ছিদ্র করিয়া সম্মুখের দিকে একটী শীসক—পেন্সিল দিতে হয়। অপর পশ্চাদ্ভাগের দুইদিকে চারি দিকে ঘুরিতে পারে

* Proc. Soc. Psych. Research. Vol. IX. PP 91-94.

এরূপ ঢিলা করিয়া, সুকৌশলে উৰ্দ্ধাধঃভাবে চৌকী পরাইয়া তাহাতে বোতামের ন্যায় দুইখানি হাড়ের চাকা লাগাইয়া দিতে হয়।

শিষ্য। ইহাতে এমন কি শক্তি উৎপন্ন হয় যে, প্রেতাত্মার বা মানবাত্মার আবেশ হয়?

গুরু। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেতের আবেশ প্ল্যাঞ্চেট্‌ধারী মানবের ইচ্ছাস্ফুরণ মাত্র। প্ল্যাঞ্চেট্‌টা শুধু সেই সেই আবিষ্ট লিখিবার কল।

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে কেবল জীবিত মনুষ্যের আত্মার ক্রিয়াই প্ল্যাঞ্চেটে যাহা হয় তাহাই বলিয়াছেন। মৃত মনুষ্যের আত্মাও কি মিডিয়মের দ্বারা লিখিয়া থাকে।

গুরু। হাঁ, প্ল্যাঞ্চেট্‌ধারী ব্যক্তি, যদি চক্রে বসিয়া, মৃত আত্মাকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিতে থাকেন, তবে মৃত ব্যক্তির আত্মা তাহাতে আবিষ্ট হইয়া উত্তর লিখিয়া থাকেন।

শিষ্য। সেরূপ কোথাও হইয়াছে?

গুরু। শত সহস্র স্থানে। কয়েকটী ঘটনা মাত্র তোমায় এস্থলে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

লণ্ডনের ওয়ান্‌স-এ-উইক নামক পত্রিকার (২৮শে অক্টোবর ১৮৫২ সাল) সম্পাদককে, মি আর্টিষ্ট, ২০৮নং ইষ্টার্ণরোড হইতে লিখেন,—

আপনার কাগজে প্রকাশিত প্ল্যাঞ্চেট্‌ নামক যন্ত্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, আমি একখানি প্রস্তুত করি; এবং যথানিয়মে আমি ও মিসেস্ বি, চক্রে বসি। আমার বন্ধু সিল্বার্টও আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তিনজন বসিয়া মুক্তাত্মাসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন প্রকার ফল না হওয়াতে অগত্যা আমরা ডিনার খাইতে চলিয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ঐ কাগজখানির উপর লেখা আছে,—আমার ছেলের

কাছে যাও এবং তাকে বল যে, আমি অমুক মাসের অমুক তারিখে যাব এবং সে যে বই লিখিতেছে তাহার যে যে খানে বদলাইতে হইবে তাহা বলিব,—স্বাক্ষর; আর টি ওয়েন (R. T. Owen) আমি সেই দিবস ঐ কাগজ লইয়া আর টি ওয়েন, যিনি জার্ম্মাণ ষ্ট্রীটে কোন হোটেলে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট গমন করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় কি একখানি পুস্তক লিখিতেছেন?" তিনি শুনিয়া সাশ্চর্য্যে বলিলেন "আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আমি সবে গত কল্য সে বই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।" তখন আমি প্ল্যাঞ্চেট্-লিখিত সেই কাগজখানি তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এই লেখা ও স্বাক্ষর আমার পিতার হস্তের। তিনি অনেক দিন মারা গিয়াছেন।"

লণ্ডনের ওয়ান্স-এ-উইক নামক কাগজে মিঃ এস্, আর, ওয়েল্স লিখিয়াছেন, একদিন আমরা প্ল্যাঞ্চেট্ ধরিয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে মিসেস্ বি—নাম্নী একজন বিধবা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্ল্যাঞ্চেট্ সম্বন্ধে তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। তিনি হাসিতে হাসিতে প্ল্যাঞ্চেট্ ধরিলেন,—ধরিবামাত্র প্ল্যাঞ্চেট্ লিখিল "সাবধান।" ঐ বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কিসের জন্য সাবধান হইব?" উত্তর—"টাকার জন্য"। প্রশ্ন—"কোথায়?" উত্তর—"আমেরিকার কেন্টকিতে।" এই প্রশ্নোত্তরের পর তাঁহার বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন্টকিতে কি আপনার টাকা আছে? বিধবা বলিলেন হাঁ, আমার স্বামী মৃত্যুকালীন আমাকে দশ হাজার পাউণ্ড দিয়া যান, আমি তাহা আমার একটি বন্ধুকে ঔষধের কারবারে খাটাইতে ধার দিয়াছি। তখন ঐ বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্ল্যাঞ্চেটে একথা লিখিল কে? উত্তর হইল, "বি ডব্লিউ"। বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বি ডিব্লউ কে?" উত্তর—

"আমার একটি মৃত বন্ধুর নাম, তিনি আজ ছয় বৎসর মরিয়াছেন।" বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমায় কি করিতে হইবে?" উত্তর—"কেন্‌টকিতে গিয়া ঐ বিষয় দেখ।" বিধবা এই সকল বিষয় অবগত হইয়া, তাহার বন্ধুবান্ধবগণকে বলিলেন, প্ল্যাঞ্চেটের কথা সত্য সিদ্ধই হউক আর যাহাই হউক, দুইবৎসর যখন টাকাটা দিয়াছি, তখন একবার গিয়া দেখাও চাই। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কয় দিনে সেখানে যাইতে পারিব? উত্তর—"অদ্য হইতে দুই সপ্তাহের পর দিনে।" বিধবার হাতে টাকা ছিল না। তিনি মিষ্টার ডব্লিউয়ের নিকট ধার চাহিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি উত্তর দেন "এক সপ্তাহের মধ্যেই টাকা পাইবেন।" তখন ঐ বিধবা মনে করিলেন যে, "প্ল্যাঞ্চেটের কথা মিথ্যা, আমি তৎপূর্ব্বেই আমেরিকায় যাইতে পারিব। কিন্তু সপ্তাহ পূর্ণদিবসে তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, নানা কারণে তিনি টাকা দিতে পারেন না। তখন বিধবা অন্য এক বন্ধুর নিকটে টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে বিধবা ভাবিলেন, প্ল্যাঞ্চেটের কথা মিথ্যা হইল, আমি পূর্ব্বেই যাইব।" কিন্তু যাইবার দিবসে রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া দেখিলেন, ভুলক্রমে তাঁহার মালপত্রাদি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। কাজেই সে দিবস তথায় থাকিয়া মালপত্র ঠিক করিলেন। প্ল্যাঞ্চেটের ধার্য্যদিবসে আমেরিকায় যাত্রা করিতে হইল। সেখানে গিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই তাঁহার বন্ধু কোন ক্ষতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন; পাওনাদারেরা তাঁহার সমস্ত বেচিয়া লইয়াছে।

ডাক্তার সামুয়েল ও জন লুবেয়ার * প্ল্যাঞ্চেট্ ধরিয়া যে ফল পান, তাহা এই,—

* ডাক্তার সামুয়েল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগের উচ্চপদস্থ এবং জেনারেল এসম্বিলি দলের একজন প্রধান ব্যক্তি।

প্র। আপনার নাম কি?

উ। এডোয়ার্ড।

প্র। নিবাস কোথায় ছিল?

উ। নিউসাউথ ওয়েল্‌স, লণ্ডনের হাইড পার্কে আমি টাইম্‌স পত্র বিক্রয় করিতাম। আপনারা কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? ডাক্তার যে দিন আল্‌কিংশের চিকিৎসা করিয়া পারিতোষিক পান এবং যেদিনকার টাইম্‌সে উহা প্রকাশ হয়, সেদিন আপনি আমাকে একটা সিলিং পুরস্কার দিয়াছিলেন। মনে হয়?

বেডফোর্ড পল্লীতে প্রেততত্ত্ব অনুসন্ধানের এক সভা আছে। ঐ সভায় চারি পাঁচ জন অতি অদ্ভুত রকমের মিডিয়ম ছিলেন। তাঁহারা প্ল্যাঞ্চেট্‌ ধরিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা চলিত ও উত্তর দিত। একদিন একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌ ত্রিকোণমিতির এক অতি কঠিন প্রশ্ন করিয়া তাহার সদুত্তর পাইয়া চমৎকৃত হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

টেবিল বা মেজ্‌ চালনা।

Table Tilting.

গুরু। একাগ্রচিত্ত হইলে, কর্ত্তা যে ইচ্ছাশক্তির বলে পরলোকগত আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন এবং অনেক পদার্থকে স্থান-যুক্ত করিতে পারেন, এমন কি সেই সকল গুরু পদার্থের চালনের দ্বারা আপনার অজ্ঞাতে অনেক বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা প্রভৃতি করিতে পারেন টেবিল পরিচালন তাহার আর একটি আশ্চর্য্য উদাহরণের স্থল। ইহাতে

একটি টেবিলের চতুষ্পার্শে চেয়ারে বসিয়া কতকগুলি লোককে তাহার উপর আপন আপন হস্তদ্বয় রাখিয়া, কোন বিষয় একমনে চিন্তা করিতে হয়। চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের ইচ্ছাশক্তির সূক্ষ্ম অদৃশ্য আঘাতে টেবিলটির পায়াগুলি পর্য্যায়ক্রমে একবার ভূমি ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠে আবার পড়িয়া যায়। এইরূপ আঘাত হইতে টেলিগ্রাফের ন্যায় একটি বর্ণমালা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ টেবিলটির পায়া একবার খট্ শব্দ করিলে 'ক' হইবে। দুইবার এইরূপ শব্দ হইলে 'খ' হইবে ইত্যাদি। তাহার পর দূরে অপর একটি টেবিলের উপর একটি মুদ্রিত বর্ণমালার কাগজ রাখিয়া দেওয়া হয় ও টেবিলের পায়ার শব্দানুসারে, অপর এক ব্যক্তির বর্ণমালার সেই সেই শব্দ-সূচক অক্ষরের উপর দাগ দিতে থাকেন। এইরূপ মেজের পায়ার শব্দ ধরিয়া একটি কথা তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়।

৯ই নভেম্বর তারিখে খ্যাতনামা মুশে রিচেট প্রভৃতি কতিপয় আত্ম-তত্ত্ববিৎ পূর্ব্বোক্তভাবে টেবিল লইয়া একটি চক্র করিয়া বসিলেন। ক্ষণ-কাল মধ্যেই টেবিল দুলিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা হইল, "কাহার আত্মা এ টেবিলে আবির্ভূত হইয়াছে?" উত্তর হইল "কবি ভিলনের।"

প্র। আপনার ফরাসী কবিতার দুই এক পঙ্‌ক্তি আপনি আবৃত্তি করুন।

উত্তরে টেবিলের পায়া উঠিয়া নামিয়া লিখিল On Sout los negies Antan.

প্র। ফ্রান্সের রাজগণের সহিত ভিলনের (Vileon) কিরূপ সম্বন্ধ ছিল?

উ। সম্রাট্ ফ্রান্সের লুই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন।

প্র। আপনার মতে আমাদিগের কি গ্রন্থ পাঠ করা উচিত?

উ। Essay Sur Dacmoniomanic *

আমি দেখিয়াছি চিত্তের একাগ্রতা সাধনা করিতে পারিলে, মানুষে অদ্ভুত অনৈসর্গিক ব্যাপার সকল সংসাধিত করিতে পারে। এক মনে, কি মৃত কি জীবিত কোন একজনকে চিন্তা করুন, তন্ময় হইয়া সে চিন্তায় সমগ্র আপনাকে ডুবাইয়া দিন, দেখিবেন যেরূপ ইচ্ছা করিবেন তাহার মনেও সেইরূপ চিন্তা জাগরিত করিতে পারিবেন; এমন কি তাঁহার শারীরিক ক্রিয়া, শারীরিক গতি আপনার ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন। এসকল বিষয়ে পরীক্ষিত ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। বাহুল্য ভয়ে সে বিষয়ে নিবৃত্ত হইলাম। তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, স্তম্ভন বিদ্বেষণাদি উন্মাদের প্রলাপকাহিনী নহে, তাহা বর্ত্তমান যুগে বাস্তবীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে ভেল্কী ইন্দ্রজাল বলিয়া এ সকল কথা অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সে প্রয়াস স্বল্প-জ্ঞান জন্য। হুসেন খাঁ প্রভৃতি হঠযোগিগণের আশ্চর্য্য ক্রিয়া-কলাপ যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে হাসিবার প্রবৃত্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমরা বর্ত্তমানে সেই ইন্দ্র-জাল বিদ্যার সম্ভবপর ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম। রেভারেণ্ড ক্ল্যারেন্স গডফ্রে নামক সম্ভ্রান্ত খৃষ্টধর্ম্মযাজক বলেন,—

"আমার বেশ মনে পড়ে একদিন রাত্রে ১৫ই (নভেম্বর ১৮৮৬) আমার কোন বিদেশস্থ রমণী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। একাগ্র চিত্তে কল্পনার সাহায্যে, আমি তাঁহার প্রবাস গৃহে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রায় ৮।১০ মিনিট কাল নিয়ত এইরূপ একাগ্রচিত্তে কাল্পনিক চেষ্টা করার পর আমার নিদ্রাবেশ হইল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

* Proc Soc Vol. V. P. P. 142-143.

পরদিন প্রত্যুষে আমার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার সহিত যেন আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমায় কাল দেখিতে পাইয়াছিলেন কি? তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, কাল রাত্রে আপনি আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন।" একথা শুনিয়াই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে স্বর অতি স্পষ্ট, সে মূর্ত্তি এত জীবন্ত, আমার কতক্ষণ যেন তাহা স্বপ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না, অবশেষে সে ঘোর কাটিয়া গেল। জাগ্রত অবস্থায় অনেকবার তাঁহাকে মনে করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তখন তত স্পষ্টভাবে সে মুখ আনিতে পারি নাই।

পরদিবস, মিঃ গডক্রে তাঁহার সেই স্ত্রী-বন্ধুর নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার মর্ম্ম এইরূপ,—

গতরাত্রে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমার হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়। হঠাৎ মনে হইল কে যেন আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। আমি চাহিয়া দেখিলাম কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না বলিয়া পুনরায় ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম। নিদ্রা আসিল না এবং একরূপ শয্যাকণ্টকের মত বোধ হইতে লাগিল। আমি উঠিলাম, ভাবিলাম, একটু সোডাওয়াটার খাইলে বোধ হয় উদ্বেগটা দূর হইবে। সোডাওয়াটার নিম্ন তলে ছিল, সুতরাং বাতি জ্বালিয়া নিম্নতল হইতে তাহা আনিতে গেলাম। আমি ফিরিয়া আসিতেছি দেখিলাম সিঁড়ির নিম্নে বড় জানালার পার্শ্বে মিঃ গডক্রে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সে মূর্ত্তি এত জীবন্ত, আমার তাঁহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হইল। গৃহে আমার অপর একটি বন্ধু শুইয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলাম। তিনি অবশ্য কথাটি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। *

* Apparition and Thought Transference—Podmore M. A. Contemporary Science Series P. P. 228-229.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

জীবিতাবস্থায় আত্মার গমন।

এই সকল ব্যাপারে মানবাত্মার আন্তরিক ইচ্ছাশক্তির বলে আত্মার গমনাগমন ও দর্শনাদি ঘটিয়া থাকে। আমার নিজের ঘটনা সম্বন্ধীয় একটি অতি কঠোর সত্য কাহিনী বলিতেছি।

গত ফাল্গুন মাসে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে আমি কলিকাতার বাসায় ছিলাম। আমার স্ত্রী তখন তাঁহার বাপের বাড়ীতে ছিলেন। আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় থাকেন, তিনি ঐ সময় বাড়ী যান। তাঁহার সে সময় বাড়ী যাইবার কারণ এই যে, কলিকাতায় তখন অত্যন্ত প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়া বহুসংখ্যক লোক কালের করাল গ্রাসে ঢলিয়া পড়িতেছিল, তিনি একরূপ সেই ভয়ে পলায়ন করেন। তিনি বাড়ী যাইবার সময় প্লেগের বিভীষিকা বর্ণনা করিয়া আমাকেও বাড়ী যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমার বিশেষ কার্য্য থাকায়, আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষায় সম্পূর্ণ অপারগ, তাহা তাঁহাকে বলিয়াই বিদায় হই।

প্রাগুক্ত ঘটনার আট দশ দিন পরে, একদিন রাত্রে প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে—আমার গৃহে আমি শয়ন করিয়া একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম। পাঠ করিতে করিতে যেন একটু তন্দ্রার আবেশ হইল,—কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তখনও আমার বেশ জ্ঞান আছে। পার্শ্বস্থ ফর্সীর কল্কী হইতে তাম্রকূটধূমের গন্ধ তখনও প্রাপ্ত হইতেছি,—সহসা সেই আবেশ-বিহ্বল চক্ষুতে দেখিতে পাইলাম, দরজার পার্শ্বে আমার শয্যার অনতিদূরে দেওয়াল সলগ্ন ভাবে আমার স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার আকৃতি যেন মলিন বিষণ্ণ—কিন্তু বস্ত্রাদি সমস্তই

শ্বেত ও দিব্যভাবাপন্ন। সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান আনয়নের চেষ্টা করিলাম, তখনও তাঁহার মূর্ত্তি অপসৃত হয় নাই। উঠিয়া বসিলাম, তখন সে মূর্ত্তি যায় নাই। ভাবিলাম একি! আমার ঘুম কি এখনও ভাঙ্গে নাই! চক্ষু কচালিয়া চারিদিকে চাহিলাম, এবার আর কিছুই নাই। পাশের ঘরের বন্ধু ঘরে নাই, শুধু তাঁহার ঘড়ীটি টীক্ টীক্ করিয়া সমস্ত নৈশ নিস্তব্ধতার কাণে একটু একটু আওয়াজ দিতেছে।

আমার মনটা বড় খারাপ হইল। মানুষের মৃত্যু হইলে আত্মা প্রিয়জনকে দর্শন দিয়া চলিয়া যায়,—তবে কি আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে? তাই আমাকে শেষ দেখা দিয়া গেলেন। সারারাত্রির মধ্যে ভাল করিয়া ঘুম হইল না।

তৎপরদিবস সকালে উঠিয়াই ভাবিলাম, টেলিগ্রাফ করি। কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ী যশোহর জেলার একটা পল্লীগ্রামে। সেখানে টেলিগ্রাফ পঁহুছিতেও তিন দিন সময় লাগিয়া থাকে, পত্র পঁহুছিতেও তাহাই। কারণ, সে গ্রামের নিকট রেলওয়ে ষ্টেসন বা পোষ্টাফিসে টেলিগ্রাফ তার নাই। তখন ক্রিয়াবিশেষের পরিচালনা দ্বারা জানিলাম, আমার স্ত্রীর কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। যাহা হউক সেই দিনই সেখানবার খবর জানিবার জন্য চিঠি পাঠাইলাম। বলা বাহুল্য এই চিঠি সেখানে পঁহুছিতে তিন দিন লাগিবে।

আমি যে দিন সেখানে চিঠি লিখিলাম, তৎপরদিবস সকালেই একখানা চিঠি প্রাপ্ত হইলাম,—সেখানা আমার স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র লিখিয়াছে। সে অতি বালক। মোটা মোটা অক্ষরে ভাঙ্গা কথায় যে পত্র লিখিয়াছিল,—তাহা অবিকল এইরূপ,—

"পরশুদিন রাত্রে পিসিমা আপনার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রিতাবস্থায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন এবং এখন তাঁর বড় মন খারাপ আছে। আপনার

কুশল সংবাদ লিখিবেন এবং তাঁহার ইচ্ছা যে আপনি এই প্লেগের সময় কলিকাতায় না থাকিয়া বাড়ী যান। তিনি গত রবিবারে আপনাকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার উত্তর দেন নাই কেন, সে জন্য আরও ভাবিত হইয়াছেন।”

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম হইতে চিঠি দিলে তৎপর দিবসই পত্র কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছায়। যাইতে তিন দিন লাগে, আসে এক দিনে। তাহার কারণ এই যে,—ঐ গ্রামে পোষ্টাফিস নাই, পোষ্টাফিসের নিয়মানুসারে দুই দিন অন্তর সেখানে চিঠি বিলি হয়।

পত্র পাইয়া তখন বুঝিতে পারিলাম,—আমার স্ত্রী তাঁহার দাদার নিকটে কয়দিন হইতে কলিকাতার প্লেগের ব্যাপার ও মানুষ মরার কথা শুনিয়া, আমার সম্বন্ধে অতিশয় চিন্তিত হয়েন। সেই চিন্তার ফলে ঐ সময় তাঁহার আত্মা আমার নিকট আসে,—আমি তাহাই দেখিয়াছিলাম, সন্দেহ নাই। চিন্তাবলে আত্মার অন্যত্র গমন সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ আমার জীবনে অনেক পাইয়াছি।

তোমাকে বিদেশীয় এরূপ ঘটনা আরও কতকগুলি শুনাইতেছি—

মিঃ রবার্ট ব্রুস নামক এক ব্যক্তি, কোন জাহাজের প্রধান মেট ছিলেন। লিভারপুল এবং সেণ্টজন্ নিউব্রান্সউইক নামক বন্দরে জাহাজে যাতায়াত করিতেন। এক যাত্রায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড নামক স্থানের বাঁকের নিকটে, মধ্যাহ্নকালে মেট ও কাপ্তেন জাহাজের উপরে থাকিয়া স্থান নির্ণয় করিতেছিলেন। মেট তাহার গণনায় মগ্ন ছিলেন, কাপ্তেন কি করিতেছিলেন তাহা দেখেন নাই। যখন মেটের গণনা সমাপ্ত হইল, তখন তিনি কহিলেন, আমি অক্ষ ও দ্রাঘিমাই (Latitude Longitude) স্থির করিলাম। কাপ্তেনের কোন জবাব না পাইয়া তিনি

তাঁহার স্কন্ধের উপর দিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, কাপ্তেন ব্যস্তভাবে কি লিখিতেছেন। তথাপিও জবাব না পাইয়া মেট উঠিয়া কাপ্তেনের ক্যাবিনের দ্বারের দিকে চাহিবা মাত্র দেখিতে পাইলেন যে, যাহাকে তিনি কাপ্তেন বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, সে কাপ্তেন নহে, একজন অপরিচিত লোক।

ব্রুস্ ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন না। সেই লোকটার দিকে চাহিয়া তাহার সহিত চোখোচোখি হইল, দেখিতে পাইলেন, একজন গম্ভীর প্রকৃতির লোক কাপ্তেনের আসনে উপবিষ্ট আছে, ইতিপূর্ব্বে সে জাহাজে কখনও তাহাকে দেখেন নাই। তখন তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে কাপ্তেনের নিকটে গিয়া উপনীত হইলেন। কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ ব্রুস্! আপনার কি হইয়াছে?" ব্রুস্ বলিলেন, "মহাশয়! আপনার ডেস্কে কে বসিয়া আছে?" কাপ্তেন বলিলেন,—"তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব?" ব্রুস্ বলিলেন, "একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক আপনার ডেস্কে বসিয়া আছেন।" কাপ্তেন বলিলেন, "আপনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন, না পাগল হইয়াছেন! অপরিচিত লোক!—আপনি স্বপ্ন দেখিতেছেন না কি? ছয় সপ্তাহ্ আমরা সমুদ্র বক্ষে আছি, এখানে অপরিচিত লোক কি করিয়া আসিবে? আপনি বোধ হয়, আমাদিগের কাহাকেও দেখিয়া থাকিবেন।"

তখন ব্রুস্ নাছোড়বান্দা হইয়া কাপ্তনকে লইয়া তাঁহার ক্যাবিনে গমন করিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন যে শ্লেটে সে লিখিতেছিল, তাহা তিনি তুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে—"উত্তর পশ্চিমাভিমুখে জাহাজ চালাও" (Steer to the North-west) পাঠ করিয়া কাপ্তেন বলিলেন, "নিশ্চয়ই জাহাজের কেহ এই শ্লেটে ইহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।" মেট বলিল,— না "মহাশয়!

যে লিখিয়াছে, আমি তাহাকে আর কখনও দেখি নাই।” কাপ্তেন তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া একে একে সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেহ তাঁহার ক্যাবিনে আসিয়াছে কি না, অথবা কাহাকেও আসিতে দেখিয়াছে কি না।” কিন্তু সকলেই পর পর বলিল,—না মহাশয়, আমি আসি নাই বা কাহাকেও আসিতে দেখি নাই।” কাপ্তেন তখন আর একখানি শ্লেটে একে একে সকলেরই হাতের লেখা দেখিলেন, সে শ্লেটের লেখার মত কাহারও হাতের লেখা হইল না। তখন কাপ্তেন মেটকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মিষ্টার ক্রস্! তবে ইহা কি?” ক্রস্ বিস্ময় সহকারে বলিলেন, “মহাশয়! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাউক, যদিও আমরা দক্ষিণাভিমুখে যাইব, কিন্তু একটু উত্তর-পশ্চিমমুখে জাহাজ চালাইয়া লইয়া গিয়া দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি?” কাপ্তেন তাহাতে স্বীকৃত হইয়া সেই দিকেই জাহাজ চালাইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন একখানি জাহাজ আরোহীসহ বড়ই বিপন্ন হইয়াছে,—জাহাজের মাস্তুল নাই,—কল নাই,—প্রতিকূল বায়ুতে বিঘূর্ণিত হইয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়া কাপ্তেন আরও দ্রুতগতিতে নিজেদের জাহাজ চালাইয়া নিমগ্নোন্মুখ জাহাজের নিকটস্থ হইলেন; এবং তাহার আরোহিগণকে আপনাদের জাহাজে তুলিয়া লইলেন। মিষ্টার রবার্ট ক্রস্ তাহার মধ্য হইতে একটি ভদ্রলোককে দেখিয়া কাপ্তেনের কাণে কাণে বলিলেন, “এই ব্যক্তিকে আমি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আপনার ক্যাবিনে বসিয়া লিখিতে দেখিয়াছি।” কাপ্তেন সেই ভগ্ন জাহাজের কাপ্তেনের অনুমতি লইয়া যে শ্লেটে লেখা ছিল, তাহার অপর পৃষ্ঠায় ঐ ব্যক্তিকে “উত্তর পশ্চিমাভিমুখে জাহাজ চালাও” এই কয়টি কথা লিখিতে বলিলেন। রহস্য ভাবিয়া সে ব্যক্তি তাহা লিখিলেন। কাপ্তেন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, দুই পিঠের

লেখাই একপ্রকার। তখন শ্লেট উল্টাইয়া পূর্ব্বলিখিত পৃষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া কাপ্তেন বলিলেন, "মহাশয়! ইহা কি আপনি লিখিয়াছেন? নিজের হাতের লেখা দেখিয়া সেই ব্যক্তি বলিলেন, সে কি মহাশয়, এই মাত্র আপনার সাক্ষাতে আমি উহা লিখিয়া দিলাম, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন যে, ইহা কি আপনি লিখিয়াছেন?—হাঁ উহা আমারই লেখা।" তখন কাপ্তেন উভয় পৃষ্ঠাই দেখাইয়া বলিলেন,—"এই দুই দিকেই কি আপনার লেখা?" ভদ্র ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয় আমি লিখিয়াছি একদিকে কিন্তু দুই দিকে লেখা হইল কি প্রকারে? হাঁ দুই দিকেই আমার হাতের লেখা বটে। আপনি কোন গুপ্ত বিদ্যা জানেন, তাহাতে শ্লেটের এক দিকে লিখিলে তাহা দুই দিকে ফুটিয়া উঠে; এবং তাহাই পরীক্ষার জন্য কি আমাকে শ্লেটে লিখিতে বলিয়াছিলেন?"

কাপ্তেন তখন সমস্ত ভদ্রলোকদিগকে এবং জাহাজের কাপ্তেনের সাক্ষাতে বলিলেন, "আমার জাহাজের প্রধান মেট এই ভদ্র ব্যক্তিকে আমার ক্যাবিনে বসিয়া এই শ্লেটে ইহা লিখিতে দেখিয়াছেন এবং এই লেখা দেখিয়াই আমরা জাহাজ লইয়া এই দিকে আসিয়াছি। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা কিরূপে ইহা সংঘটিত হইল?"

সেই ভগ্ন জাহাজের কাপ্তেন বলিলেন—"আপনার কথিত সময়েই আমাদের জাহাজের অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটে এবং জাহাজ যায় যায় হয়। তখন ভয়ে ঐ আরোহী ভদ্রলোকটি একরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। কিয়ৎক্ষণ পরে উনি বলেন, একখানা জাহাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে আসিতেছে। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে উহার আত্মাই আপনাদের জাহাজে আসিয়া আমাদের রক্ষার্থে শ্লেটে ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছিলেন।*

Mr. Robert Dal Owen his Footfalls on the boundary of another world page 242.

মিষ্টার এইচ, সি, কেলি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

কাপ্তেন মার্টন্‌স ডিয়োডোর নামক জাহাজে আমেরিকার অলিয়েন্স নামক নগর হইতে তুলা বোঝাই করিয়া লিভারপুলে আইসেন। সেখানে আসিয়া তুলা খালাস করিবার সময় দেখেন যে, তুলা ওজনে অনেক কম হইতেছে। এবং তজ্জন্য তাঁহাকে তুলার সত্ত্বাধিকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার বন্ধু কাপ্তেন হব্‌সনকে একথা জানাইলেন। হব্‌সন বলিলেন যে তাঁহার একটি ভগিনী আছেন, তিনি সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্ত বলিতে পারেন। তাহাতে প্রথমোক্ত কাপ্তেন ঐ স্ত্রীলোকের নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাহাজের তুলা কি হইল জিজ্ঞাসা করায়, আবিষ্ট অবস্থায় স্ত্রীলোক বলিল,—তিনি যখন তুলা বোঝাই করিতেছিলেন, তখন তাঁহারই জাহাজের পার্শ্বে কালরঙ্গের খুব বড় একখানি ফরাসী জাহাজ ছিল, ভুলক্রমে কুলীরা আপনার জাহাজের তুলা সেই জাহাজে তুলিয়া দিয়াছে। তখন কাপ্তেনের স্মরণ হইল যে, তাঁহার জাহাজের পার্শ্বে ব্রাণস্থইক নামক ফরাসীদেশীয় একখানি জাহাজ তুলা বোঝাই করিতেছিল। তদনুযায়ী তদন্তে ঐ তুলা ফেরৎ লইয়া আনা হয়।*

আমেরিকার নিউহাবান্ নগরে, ১৮৫২ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, দুইটী ভদ্র যুবক-খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন এবং কার্য্যজন্য আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যান। তন্মধ্যে একজনের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার মনের মধ্য হইতে কে যেন তাঁহাকে সর্ব্বদাই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিত, এবং শুভকার্য্যে উৎসাহ ও মন্দফল ক্রিয়ায় নিবৃত্তি করিত। একদিন তিনি তাঁহার

* Leaves from Captain James Payn's Long By H. C. Kelloy Page 173.

বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন, রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর, ঝড় জল হইতেছিল, শুইয়া শুইয়া হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, একটু ভ্রমণ করিয়া আসি,—কিন্তু সেই ঝড় জলের মধ্যে কেন এবং কোথায় যে যাইবেন, তাহা স্থির নাই, —আস্তাবল হইতে ঘোড়া লইয়া তিনি বাহির হইলেন; শেষে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে উপস্থিত হইয়া এক পর্ণকুটীর সম্মুখে অশ্ব দাঁড়াইয়া পড়িল, আর এক পদও চলে না। তিনি তখন ঘোটক হইতে নামিয়া কুটীরদ্বারে পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ করিলে জানিতে পারিলেন, সিঁড়িতে মানুষের পায়ের শব্দ হইতেছে—মনে করিলেন অবশ্য একজন মানুষ আসিতেছে। বাস্তবিকই একজন লোক একটা ল্যাম্প হাতে করিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, তাহার মুখে কেমন নিরাশ বিরক্তির চিহ্ন। লোকটি বলিল, "কেন মহাশয়! কি করিতে আসিয়াছেন?" আগন্তুক বলিলেন,—"আমি ধর্ম্মপ্রচারক এবং বিদেশী অন্যত্র স্থান না পাইয়া এখানে আসিয়াছি।" কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলিল, "না মহাশয়! আপনি আমার আত্মহত্যা নিবারণ করিতে আসিয়াছেন। আমি আত্মহত্যা করিবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছি, এমন সময় আপনি আসিয়া ডাকিলেন এবং আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সংমোহ অপহৃত হইয়াছে।"

দশম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

দৈববাণী।

Sooth-Saying.

শিষ্য। দেবালয়ে দৈববাণী হয়, তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথদেবের নিকট যাহারা পীড়িত হইয়া বা অন্যকারণে হত্যা দেয়, তাহাদিগের উপরে দৈববাণী বা দেবতার আদেশ হয়। অবশ্য সূক্ষ্মানুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এইরূপ দৈবাদেশে ঔষধ পাইয়া অনেকে চিকিৎসক-পরিত্যক্ত কঠিন রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেকে দৈববাণী দ্বারা জানিতে পারিয়াছে যে, অমুক গ্রামে অমুক ব্যক্তি আছেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্বজন্মে পিতা কি মাতা ছিলেন, অন্যায় আচরণে তাঁহাকে ব্যাথা দেওয়ার জন্য এই রোগ হইয়াছে,—তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, তাঁহার পদোদক কিম্বা প্রসাদ ভক্ষণ করিলে রোগ-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে। পীড়িত ব্যক্তি হয় ত সে গ্রাম কখন চিনে নাই,—সে লোকের অস্তিত্ব আছে কি না,—তাহার সংবাদই সে অবগত নহে। অবশেষে আদিষ্ট হইয়া নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান করতঃ

আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে বা বাঞ্ছিতানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা কোন্ শক্তির বলে ঘটিয়া থাকে? বাস্তবিকই কিছু ভগবান কথা কহিয়া মানুষকে ঐ সকল বলিয়া দেন না।

গুরু। ভগবান্ যে নিত্য নিত্য শতসহস্র রোগীর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, তাহাদের ব্যাথা আবেদন অবগত হইয়া ঔষধাদি বলিয়া বেড়ান না, তাহাও হইতে পারে। কিন্তু ঐ প্রকার আদেশকে দৈববাণী বলে। কেবল যে, আমাদের দেশেই ঐ প্রকার দৈববাণী প্রচলিত ছিল বা আছে, তাহা নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশেও এইরূপ দৈববাণীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ইহাকে অরেকল্ (Oracle) বলেন। আমাদের দেশে বীরযোদ্ধাগণ যেমন ইষ্টদেবীর পূজা করিয়া তাঁহার আদেশ লইয়া যুদ্ধে গমন করিতেন, গ্রীকগণও তদ্রূপ অরেকলের আদেশ অনুমতি লইয়া যুদ্ধে গমন করিতেন। ইহা গ্রীক ইতিহাসবেত্তাগণ সকলেই অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারা যে প্রকারে এই অরেকলের আদেশ গ্রহণ করিতেন, তাহাও ঠিক আমাদেরই দেবালয় হইতে দৈববাণী-গ্রহণেরই মত।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডেল্‌ফি নামক স্থানে এপোলো দেবের মন্দিরের মধ্যে একটি বাষ্পময় গর্ত্ত ছিল। একখানা টুল পাতিয়া কোন বীরকুমারী পুরোহিত কন্যা ঐ স্থানে বসিলে তাহার মুখ দিয়া দেবতার কথা বাহির হইত,—সে তখন ভূত' ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সমস্ত কথাই বলিয়া দিতে পারিত। আমাদের দেশেও এইরূপ দৈববাণী বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতের ব্রাহ্মণগণও এইরূপ ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারিতেন। আমি বিবেচনা করি, ক্লায়ারভয়েন্স শক্তির বলে এরূপ প্রকার ঘটিয়া থাকে। চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া যোগদৃষ্টি লাভ করিতে পারিলেই এরূপ হয়। যে প্রকারে হইতে পারে, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আর ধন্না দিলে যে, দেবাবেশ হয় বা পূর্ব্বজন্মের পিতৃমাতৃ-বিরুদ্ধে অপরাধ অবগত হওয়া যায়, তাহারও একমাত্র কারণ, তন্ময় হইয়া আত্মাকে জড়ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিবার ফল। এরূপ করিলে কাজেই আত্মা তখন সর্ব্বত্র দৃষ্টিশক্তিমান্ হয়, তখন তাহার অগোচর কিছুই থাকে না। যে বিষয়ে তাহার এমন ঐকান্তিকতা, সে তাহা সুন্দরভাবেই দেখিতে পায়। ইহা কেন ও কি প্রকারে হয়, তাহাও তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শিষ্য। আর এক প্রকারে দৈববাণী প্রকাশ হয় তাহা আপনি অবগত আছেন কি ?

গুরু। কি প্রকারে ?

শিষ্য। কোন মানুষের উপর দেবতার নাকি আশ্রয় হয়। তখন তাহার উন্মাদের মত অবস্থা হয়, সে মাথা ঘুরাইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়িয়া চাড়িয়া অস্থির করে, তাহার বাহ্যিকজ্ঞান তখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়—সে তখন আপন মনে বহুবিধ কথা বলিতে থাকে। তারপরে একটু স্থিরভাব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সকল কথাই বলিয়া দিতে পারে; রোগের ঔষধও বলিয়া দেয়। ইহাকে কি বলা যাইতে পারে ? ইহাত মনের একাগ্রতার জন্য নহে। কারণ, ইতর ব্যক্তি ও বালকবালিকাও সেরূপ আবিষ্ট হইয়া থাকে, সে হয় ত অমনই বেড়াইতেছিল সহসা একটু ছুটিয়া মাথা নাড়িয়া ঐরূপ অবস্থায় পতিত হইল। ইহাকে কখনই তন্ময়ত্বের ফল বলা যাইতে পারে না। আমাদের দেশে 'বার', 'মওয়াল' প্রভৃতি হইয়া থাকে—তাহা অধিকাংশ স্থলে ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক বা বালক-বালিকাগণের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র যে সত্য আছে তাহা নহে। অনেক স্থলেই মিথ্যা বুজ্‌রুকীর জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া

যায়। তবে বহুতর স্থলে পূর্ণ সত্য আছে, তাহাও আমি স্বীকার করি,—কিন্তু ইহার কারণ কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। অবশ্য দেবতারা যে মানুষে আশ্রয় করিয়া ঐরূপ করিয়া থাকেন, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেন না, তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র ও যুক্তি-বিরুদ্ধ।

গুরু। না, দেবাশ্রিত হওয়া সম্পূর্ণ শাস্ত্রযুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। ইংরাজীতে ইহাকে ইনিস্পিরেসন (Inspiration) বলে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই ইনিস্পিরেসনকে হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, এখনও তাঁহার শিষ্যগণ সমস্ত কার্য্যেই ভগবানের আদেশ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। এই দেবাশ্রিত (Inspire) হওয়া সকল ধর্ম্মের লোকের মধ্যেই আছে। বাস্তবিক দেবতা যে মানুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা বিশ্বাস কর আর নাই কর, ইহা যোগনিদ্রা বা আত্মার অন্তর্মুখী শক্তির ফল। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কখন কখন মানুষ এই শক্তির ক্রিয়ায় আপনি আবিষ্ট হইয়া থাকে। আমার একজন পূজনীয় আত্মীয় কাজকর্ম্ম ও ধর্ম্মচিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠে। তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার আবেশভাব হইবে, তখন তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। এইরূপ করিলেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার কোন প্রকার বাহ্যিক জ্ঞান থাকে না। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে হয় ত বলিলেন অমুকের জামাইটি গতকল্য রাত্রে মারা গিয়াছে; নয় ত বলিলেন,—পরশু রাত্রে অমুকের মেয়ের বিবাহ হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তিনি এই অবস্থা হইতে উঠিয়া যাহা বলিয়াছেন,—কখনও তাহা মিথ্যা হয় নাই। আমাদের গ্রামের একজনের দশম বর্ষীয় কন্যার এইরূপ আবেশ হইত। কিন্তু প্রতি শুক্রবারে হইত। শুক্রবারের দিন বেলা চারিটা উত্তীর্ণ হইলেই, বালিকার চক্ষু ও মুখের ভাব যেন কেমন আর একরূপ হইয়া যাইত, ইহার কিয়ৎক্ষণ

পরেই তাহার মস্তক আলোড়িত হইয়া সম্পূর্ণ বাহ্যিক জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইত।

ঐ বালিকাটির পিতা নিতান্ত অগণ্য নহে। মিষ্টান্নের বিস্তৃত কারবারে ধনী নির্ধনী সকলের সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয়। একদিন সে আমাকে বলিল, "মহাশয়! বড়ই লজ্জার কথা; লোকে বলিবে, অমুকের মেয়ের বার হইয়াছে। একটা ঢং তুলিয়াছে। আপনি যদি একবার দয়া করিয়া দেখেন ব্যাপারটা কি?"

তাহার অনুরোধে আমি একদিন বালিকার ঐরূপ আবেশের সময় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি, বস্তুতঃ বালিকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য ঊর্দ্ধদৃষ্টি। কেহ ডাকিয়াও কোন সাড়া শব্দ পাইতেছে না। তখন তাহাকে তাড়িত সংহরণ পাস দেওয়া হইল,—সে সুন্দর একটি সংস্কৃত গান গাহিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা জানা দূরের কথা, তাহার পিতামহ সংস্কৃত এই কথা বানান করিতে পারে কি না সন্দেহ।

বালিকা যে অপরিজ্ঞাত সংস্কৃত গাথা সুন্দর ভাবে উচ্চারণ করিল, তাহাকে দৈববাণী বলিতে পার—অথবা সে যে লোকের ভূত বা ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্য বা ঘটনা সংবাদ প্রদান করে, তাহা আবিষ্ট অবস্থাতে ঘটিয়া থাকে। এই আবেশ ভাবাবেশ মাত্র। যাঁহারা একটু বেশী সত্ত্বগুণান্বিত তাঁহাদিগের আত্মার কখন কখন এইরূপ আবেশ হইয়া থাকে। এইরূপ আবিষ্ট অবস্থায় তাঁহারা যাহা দর্শন করেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাকে সাইকোমেট্রিক ড্রিম (Psychometric Dream) অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্বশক্তিসম্পন্ন স্বপ্নাবস্থা বলেন। যাহা হউক, এরূপ অবস্থা ঘটিলে ঐ আবিষ্ট ব্যক্তি অনেক প্রকার ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ অন্যের প্রতি স্থির নেত্রে তাকাইয়া, তদীয় অতীত ও সম্মুখবর্ত্তী জীবনের সমস্ত ঘটনাচিত্র প্রত্যক্ষবৎ বলিয়া দিতে পারেন। অন্য প্রকার আবেশ

হইয়া থাকে, তাহা ঠিক এই প্রকার হইলেও অনেকখানি পার্থক্য আছে। তাহাতে আবেশ হয়,—কিন্তু আবিষ্ট ব্যক্তি আবেশ হওয়া মাত্রেই উচ্ছ্বসিত—অবশ ও মূর্চ্ছাগত হয়। এইরূপ আবেশকে দেহাতীত-বৃত্তিতা বা তন্ময়াবস্থা বলা যাইতে পারে। ইহার ইংরাজী নাম (Extatic trance) অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় আনন্দমোহ। এইরূপ আবেশ বা অতীন্দ্রিয় আনন্দমোহ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাঁহার শরীরে নীরোগ, স্বভাবে নির্ম্মল ও চিত্তে নির্ব্বিকার,—আত্মার বিকাশ ও অধ্যাত্ম সম্পদে অলৌকিক; অথচ যাঁহারা বিষয়-বেষ্টিত হইয়াও প্রকৃত বিষয়াশক্তি-শূন্য, আর প্রকৃতির অনিবার্য্যবেগে ভাববিহ্বল, তাঁহারাই আত্মশক্তির অনির্ব্বচনীয় আলোড়নে, বিশেষ বিশেষ সময়ে, এইরূপ ভাবাবেশে অবশ হইয়া পড়েন, এবং যখন যিনি আবিষ্ট হন, তখন তিনি তাঁহার অতীন্দ্রিয় বৃত্তিতে অপ্রত্যক্ষকেও প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত দেখিয়া, অদৃশ্য ঊর্দ্ধজগতে বিচরণ করেন। তখন তাঁহার কিছুই অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট থাকে না।

শিষ্য। আপনিই বলিলেন, ঐ বালিকাটির প্রতি শুক্রবারে আবেশ হইত। আমিও অনেকস্থলে শুনিয়াছি, কাহারও শনিবারে, কাহারও মঙ্গলবারে, কাহারও বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্টবার বা তিথিতে ঐরূপ আবেশ হয়। ইহার কারণ কি? সেই দিনই কি তাহার আত্মার ঐরূপ ক্রিয়া সংঘটিত হয়?

গুরু। এরূপ কেন হয়, তাহার রহস্য জড-সুখ-মুগ্ধ সাংসারিক বুদ্ধির অগম্য। মনে কর, রাত্রি হইলেই কেন বা মানুষের নিদ্রা আইসে, আবার প্রভাত হইলেই বা কেন নিদ্রা ভাঙ্গে,—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। পর্য্যায়শীল বা পালাজ্বর হয় ত দুইদিন অন্তর ঠিক পাঁচটার সময় আইসে,—দুই দিন সাড়ে-চারিটা পর্য্যন্ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে; কিন্তু ঠিক ঐ সময় হইলেই জ্বর আসিয়া কম্প, প্রলাপ ও নানাবিধ উপসর্গ

প্রকাশ করে। বিচ্ছেদ অবস্থায় জ্বর কোথায় ছিল, আবার ঘড়ি দেখিয়া ঠিক সময়েই বা কেমন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহার কোন প্রকার স্থির মীমাংসা অদ্যাপিও চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তদ্রূপ ঐরূপ তিথি, নক্ষত্র বা বারে কি প্রকারে আবেশ হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। ফলকথা, এরূপ অবস্থায় আবিষ্ট ব্যক্তি যে দৈববাণী করিয়া থাকেন, তাহা নিশ্চয়।

আর এক প্রকার দৈববাণী আছে, তাহাকে চিন্তা-প্রতিবিম্ব (Reflection of thought) বলে। কোন বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিতে করিতে, চিন্তার উপরে অপর ছায়া পড়িয়া না বা হাঁ শব্দ প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাকেও দৈববাণী বলিয়া জানিবে। সকলেই বোধ হয়, এই দৈববাণী শ্রুত হইয়াছেন এবং এইরূপ শব্দও যে শুনা যায়, তাহা কঠোর সত্য। যাঁহারা এইরূপ শব্দ জীবনে কখনও শুনিতে পান নাই, তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই এই দৈববাণী শুনিবার অধিকারী হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য।

শিষ্য। আমাদের দেশে "পদ্ম-হস্ত" বুলাইয়া রোগ আরোগ্য করিবার গল্প প্রচলিত আছে। অন্য স্থলে দেখাও গিয়াছে, ফিক্ বেদনা প্রভৃতি "ঝাড় ফুঁকে মুহূর্ত্তমাত্রে আরোগ্য হয়। ইহা কোন্ শক্তির বলে ঘটিয়া থাকে, তাহা আমাকে বলুন।"

গুরু। আমাদের দেশেই যে, কেবল হাত বুলাইয়া রোগ আরোগ্য করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা নহে; বাইবেলে বোধ হয় পড়িয়া

থাকিবে যে যিশুখ্রীষ্ট রোগীর দেহে হস্ত বুলাইয়া রোগ আরোগ্য করিতেন। ইহা আর কিছুই নহে, মেস্‌মেরিজম্ অথবা মেস্‌মেরিজমের একটা অঙ্গ। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, মেস্‌মেরিজম্, যোগনিদ্রাবিধায়িনীশক্তি, ক্লার্‌ভয়েন্স বা অপ্রত্যক্ষদর্শনকারিণীশক্তি, সাইকোপ্যাথি বা বিনা ঔষধে রোগ প্রতীকার এবং হিপনটিস্ এ সমুদয়ই বিভিন্ন-ভাব প্রকাশক এক শক্তিরই অন্তর্গত।

এই সাইকোপ্যাথির দ্বারা বিনা ঔষধেই রোগ আরোগ্য করা যাইতে পারে। মেস্‌মেরিজম্ করিতে যেরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, ইহাতে সেরূপ করিতে হয় না,—কারণ, সেরূপ করিলে পীড়িত ব্যক্তি নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ইহাতে কেবল ব্যথিত বা পীড়িত স্থানেই পাস দিতে হয়। উত্তমরূপে অভ্যস্ত না হইলে ঝটিতি রোগ আরোগ্যকারিণী শক্তি জন্মে না। আবার একজন যে রোগীকে আরোগ্য করিতে অসমর্থ হয়েন, সেই রোগীকে অন্য একজন অনায়াসে আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং এই কার্য্যটি সম্পূর্ণ বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে।

মন্ত্রাদি দ্বারা বাত ঝাড়া প্রভৃতি কার্য্য আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। বিনা মন্ত্রে মেস্‌মেরিজমের শক্তি দ্বারা ঐ সকল অতি সহজে আরোগ্য হইয়া থাকে। যথা,—শরীরের যে স্থানে বাত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়, সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বেদনা স্থানের দক্ষিণ কোণ দিয়া ঝাড়িলে ঈদৃশ ফল লাভ হইবে, যেন ঐ স্থানের বেদনা একেবারে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইল বলিয়া বোধ হইবে। সাইকোপ্যাথির পাস, নিশ্বাস ও ফুৎকার দ্বারাও চালিত হইয়া থাকে।

ডাক্তার ফিসার একজন বিখ্যাত শক্তি-সঞ্চালক। ইনি তাড়িৎ-পরিচালনের জন্য যে পাত্র ব্যবহার করিতেন, তাহা চতুষ্কোণ, তিন ফিট

উচ্চ, দেড় ফিট বিস্তৃত। ঐ বাক্স দেড় ইঞ্চি স্থূল এরূপ কাষ্ঠে নির্ম্মিত। বাক্সের ডালাখানি আধ ইঞ্চি স্থূল এবং দুই পার্শ্ব স্ক্রুপ দ্বারা আবদ্ধ। বাক্সের ভিতর টীনের চাদর দ্বারা মোড়া এবং বাক্সের ভিতর লোহার মরিচা এবং জলদ্বারা পূর্ণ। ঐ জল কূপ-জল হওয়া উচিত। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত বাক্স তাড়িতিক রোগ নিরাময়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিশেষতঃ বাত বা তথাবিধ পীড়ার এই তাড়িতজল আরও প্রতিরোধক ও নিবারক। যে রোগে জীবনীশক্তি (vitality) কম হইয়া আসিতেছে, তাহাতেও এই চিকিৎসা সমধিক-ফল-বিধায়িনী।

তুমি বোধ হয়, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ যে, সামান্য সামান্য বেদনাদিতে হাত বুলাইয়া দিলে তাহার উপশম হইয়া থাকে, কিন্তু বোধ হয় জান না যে, তাহাই সামান্য প্রকারে মেস্‌মেরিজম্ বা সাইকোপ্যাথির ক্রিয়া। রুদ্যমান বালককে যে, কাণ চাপড়াইয়া ঘুম পাড়ান যায় এবং তাহার যান্ত্রিক বা কোন অনির্দ্দিষ্ট অসুখের নিবারণ করা যায়, তাহা ঐ সামান্য প্রকারের মেস্‌মেরিজম্ বা সাইকোপ্যাথির ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমাদের দেশে সাধু মহান্তগণ এখনও কেবল ঝাড় ফুঁক করিয়া অনেক কঠিন রোগাক্রান্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়া থাকেন, তাহাও যে, মেস্‌মেরিজম্ বা সাইকোপ্যাথিক্রিয়ারই প্রসূতফল, তাহা যাঁহারা রোগ আরোগ্য করেন তাঁহারাও জানেন না। তাঁহারা তাঁহাদিগের গুরুর নিকটে কিরূপ ভাবে ঝাড় ফুঁক করিতে হইবে, কিরূপ ভাবে হস্ত চালনা করিতে হইবে, রোগীকে কি প্রকার ভাবে বসাইতে বা শয়ন করাইয়া ছাড় ফুঁক করিতে হইবে, তাহাই উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া, সেই শক্তি পরিচালনের দ্বারা রোগাদি সুন্দর রূপে আরোগ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু কেন এবং কোন্ শক্তির বলে, রোগ আরোগ্য হইল, তাহা তাঁহারা বা তাঁহাদিগের গুরুরাও জানেন না।

এই শক্তি লাভ করিতে হইলেও কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যথা বা ফিক্‌ বেদনা হইতে আরম্ভ করিয়া কঠিন কঠিন রোগে পাস দিতে হয়। শিক্ষা করিতে হইলে দৃঢ়চিত্ততা ও কঠোর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

বশীকরণ।

শিষ্য। বশীকরণ—কি?

গুরু। মানুষ বা যে কোন জন্তুকে স্পর্শ করিলে বা আজ্ঞা করিলে, ঐ জীব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে এবং আজ্ঞাকারী হয়, ইহাকেই বশীকরণ বলা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন শত্রু মিত্র হইয়া পড়ে, যে স্ত্রী স্বামীকে দেখিতে পারে না বা যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে না অথবা পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষ ভাব থাকিলে, তাহা নিরাকরণ করিয়া, মিত্রভাবাপন্ন যে বিদ্যাবলে হয়, তাহাকে বশীকরণ বলা যাইতে পারে। কথিত আছে, তিব্বতে আজও ঐ বিদ্যা, সকলের দ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে। একবার দৃষ্টি বা স্পর্শ মাত্র জীব মাত্রকেই বশীভূত করা যায়, ইহা যে অসাধারণ ক্ষমতা—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিলাতের লোকেরও ইহাতে প্রচুর বিশ্বাস। বিখ্যাত উপন্যাস লেখক লর্ড লিটনের গ্রন্থাবলী এবং হাগার্ডের পুস্তকাবলী যাঁহারা মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার সারবত্তা বুঝিতে পারেন।

প্রধানতঃ তিন প্রকার প্রণালীতে কার্য্যসাধন করা যাইতে পারে। যথা,—

মেঢ্রান্তরে যোনিস্তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে। ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধূক-সন্নিভম্। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা। তথাপি হিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ। গচ্ছতি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ। অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দ-লক্ষণম্। শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারা-প্রবর্ষিণম্॥ পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলম্। পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা। সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিন্তন্ত্রে ময়োদিতা। পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদি-শিবাত্মকম্। যোনিমুদ্রা পরা হ্যেষা বন্ধস্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তস্যাস্তু বন্ধনমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্নসাধয়েৎ।

প্রথমে পূরকযোগদ্বারা স্বীয় মূলাধার পদ্মে বায়ুর সহিত মনকে পূরক করিবে। গুহ্যদ্বার অবধি উপস্থ পর্য্যন্ত স্থানকে যোনিমণ্ডল বলে। এই যোনিদেশকে আকুঞ্চিত করিয়া যোনিমুদ্রা বন্ধনে প্রবৃত্ত হইবে। তাহার পর ব্রহ্মযোনিমধ্যে, বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কোটিসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল কামদেব অবস্থিত আছেন, এইরূপ ধ্যান করিয়া, তাহার ঊর্দ্ধভাগে বহ্নিশিখার ন্যায় সূক্ষ্মা চৈতন্যস্বরূপা পরমাশক্তি পরমাত্মার সহিত একীভূতা হইয়া আছেন, ইহা চিন্তা করিবে। প্রাণায়াম যোগ প্রভাবে বায়ুর সহযোগে তিন লিঙ্গ, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকার অবয়ব বিশিষ্ট জীবাত্মা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্র-মধ্য দিয়া ক্রমে ব্রহ্মমার্গে গমন করেন। শিরঃস্থিত অধো-মুখ কমল-কর্ণিকা-মধ্যে সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পরমাত্মার সহিত সঙ্গমাসক্তা আছেন। তাহা হইতে পরমানন্দময় তেজোবিশিষ্ট পাটলবর্ণ অমৃতধারা গলিত হইতেছে। জীবাত্মা যোগপ্রভাবে মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়া সেই দীপ্তিবিশিষ্ট কুলামৃত পান করিয়া পুনর্ব্বার অধো-দেশে অবতারিত হইয়া, সেই মূলাধারস্থ ব্রহ্মযোনিমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ

করেন। সাধক জীবাত্মার পুনর্ব্বার উর্দ্ধভাগে এবং অধোভাগে ব্রহ্মযোনিতে গমন এবং আগমনরূপ ক্রিয়া প্রাণায়াম মাত্রাযোগেই করিবে; এইরূপ গমনাগমন ও সুধাপানরূপ প্রাণায়াম তিনবার করিবে। সেই মূলাধারপদ্মে ব্রহ্মযোনিস্থিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, পরমাত্মার প্রাণস্বরূপা হইয়া আছেন। এইরূপ গমনাগমনের পর পুনর্ব্বার ঐ জীবাত্মা কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মক ব্রহ্মযোনিতে প্রলীন হইতেছেন, ইহাই চিন্তা করিবে। ইহার নাম যোনিমুদ্রা।

শিষ্য। অবশ্য আমি আপনার শেষোক্ত প্রণালীতে কখনও চেষ্টা করি নাই, কিন্তু অন্য প্রকার দুই এক রকমে তন্ত্রোক্ত বিধানে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সফলকাম হই নাই।

গুরু। না হইবারই কথা। চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত ঔষধ সেবন করিয়া রোগ আরোগ্য হয়, ইহা স্বীকার কর?

শিষ্য। নিজ প্রত্যক্ষ বিষয় অস্বীকার করিব কেন?

গুরু। চিকিৎসা-পুস্তকে অনেক বিষয়ই ছাপা আছে,—এক এক অধিকারে অগণ্য ঔষধ লেখা আছে, কিন্তু রোগ নির্ণয় করিয়া তদুপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করা যেরূপ বিচক্ষণ বৈদ্যের কার্য্য, তদ্রূপ এক এক বিষয়ে বহুমন্ত্র ও প্রক্রিয়া থাকিলেও তাহা অবস্থা, কাল, সময় ও পাত্রভেদে প্রয়োগ করিতে না পারিলে, কখনই ফলপ্রদ হয় না। তদ্ভিন্ন মন্ত্রাদির প্রয়োগে কলিতে চারিগুণ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। মনে কর, বশীকরণ কার্য্যে মেষচর্ম্মের আসন, কামদ নামক অগ্নি, মধু, খৈ ও ঘৃত দ্বারা হোম করিতে হয়। পূর্ব্বমুখে বসিয়া মন্ত্র জপ করিতে হয়। প্রবাল, হীরক, অথবা মণির মালায় জপ,—জপে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা মালা চালনা করিতে হয়। বায়ুতত্ত্বের উদয়ে, দিবসের পূর্ব্বভাগে, মেষ, কন্যা, ধনুঃ অথবা মীন লগ্নে, বারুণ-মণ্ডল মধ্যগত নক্ষত্রে বশীকরণ করিতে হয়।

বারুণ-মণ্ডল মধ্যগত নক্ষত্র যথা,—উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষা। বৃহস্পতি কিম্বা সোমবারযুক্ত ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী অথবা দশমী তিথিতে বসন্তকালে বশীকরণ কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্যের দেবতা বাণী। যেমন রোগ হইলে ঔষধি নির্ব্বাচন করা বহুদর্শী ভিষকের প্রয়োজন, তদ্রূপ কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ মন্ত্রের প্রয়োগ ফলপ্রদ তাহা বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

একাদশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

মন্ত্রদ্বারা ভূত ছাড়ান।

যে ব্যক্তির উপরে দুষ্টাত্মার আবেশ হয়, তাহাকে বিবিধ প্রকারে যাতনা প্রদান করিয়া থাকে, তাহার নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগ হয়, উন্মাদের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। কখন কখন সে ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের সংবাদ বলিয়া থাকে। দুষ্টাত্মার আবেশ হইয়াছে, কি অন্য প্রকার ব্যাধি হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে কেশভূষাদি রহিত পরিষ্কৃত বালুকা মেঝের উপরে উত্তমরূপে ছড়াইয়া ও হস্তদ্বারা সমান করিয়া কুশমূলদ্বারা তদুপরি পর পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ভূতছাড়ান চক্র অঙ্কিত করিবে, এবং চক্রমধ্যে যেখানে যে বীজ-মন্ত্র লেখা আছে, সেই স্থানে তাহা লিখিবে। তদনন্তর দুষ্টাত্মাবিষ্ট ব্যক্তিকে উপবেশন করাইবে। ভূতে পাইলে ঐ ব্যক্তি ঐ চক্রে কিছুতেই বসিতে চাহিবে না,—সে উঠিয়া যাইবার জন্য অসীম বলপ্রয়োগ করিবে। এবং না হয় ত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকিবে। অন্য ব্যাধি হইলে কিছুই করিবে না; স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিবে।
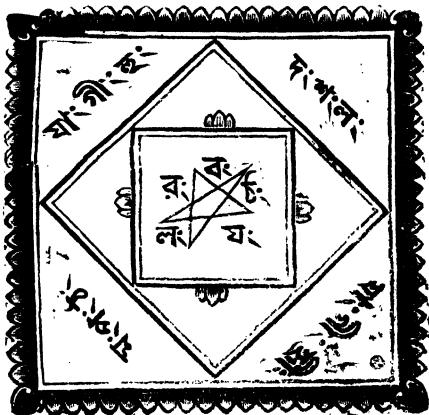
তন্ত্রমতে ভূতাদি ছাড়াইতে হইলে পূজা, হোম, জপ ও কবচাদি উৎকৃষ্ট। ওষধিতেও ফল হইয়া থাকে।

রোগীকে উপরি অঙ্কিত চক্রে বসাইয়া এক ঘটিকা জল দ্বারা তাহাকে স্নান করাইবে। স্নানের মন্ত্র যথা, "ওঁ বাচা ছোড়ি কুবাচা কবোতো কুন্তী নারক পরেউ ভাস্নকী স্নকরে ফট্ স্বাহা।" অনন্তর কিঞ্চিৎ শ্বেত সর্ষপ গ্রহণ করিয়া—"অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারেস্তেনশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সরিষাগুলি রোগীর গাত্রে ছিটাইয়া ভূত বলি প্রদান করিবে। তদনন্তর—"হুঁ ভেদ ভেদ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীর কর্ণে ফুঁ দিবে। "হুঁ" এই মন্ত্র তাহার মস্তকের উপর একশত আটবার (কলিতে চারিশত বত্রিশ বার) জপ করিবে। তদনন্তর—"ওঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।" এই মন্ত্রদ্বারা ব্যাপকন্যাস অর্থাৎ নিজের দুই হস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া রোগীর

মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত হস্ত টানিয়া আনিবে, কিন্তু তাহার গাত্র স্পর্শ হইবে না—অথচ গায়ের অতি নিকট দিয়া ঘেঁসিয়া যাইবে। এইরূপ সাত বার করিতে হইবে।

ইহার পর, তাহার হস্তে একটি রক্ষাকবচ বান্ধিয়া দিবে।

রক্ষাকবচ—ভূর্জ্জপত্রে রক্তচন্দন দ্বারা—"ওঁ ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হূঁ হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা।" এই মন্ত্র লিখিয়া তাম্র বা স্বর্ণ মাদুলিতে পূরিয়া, স্ত্রীলোক হইলে বাম বাহুতে ও পুরুষের দক্ষিণ বাহুতে বাঁধিয়া দিবে। শিখাতে উভয়েই ধারণ করিতে পারে।

এই সময়ে রোগী যদি বেশী চঞ্চল হয় বা কাঁপিতে থাকে, তবে উক্ত মন্ত্রদ্বারা অথাৎ "ওঁ ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হূঁ হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে সর্ষপ প্রহার করিবে।

শাকিনী দমন মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে মহানীলাপল লীল-জাম্বুবৎ-বালিসুগ্রীবাঙ্গদহনূমন্ত-সহিতায় বজ্রহস্তেন শাকিনীনাং হন হন দম দম মারয় মারয় ভেদয় ভেদয় ছেদয় ছেদয় সর্ব্বদোষাণাকর্ষয় ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্ স্বাহা।"

রাক্ষস ডাকিনী আদি দমন মন্ত্র—"ওঁ হ্রীঁ কুরু কুন্দে স্বাহা।"

পরী ছাড়ান কবচ—"ওঁ লং শ্রীং কাপালিকং জং জং তিষ্ঠতি মহিষং চং চং চর্ব্বং শং হং সঃ।" পরীর দৃষ্টি হইলে শ্বেত চন্দনদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে ঐ মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিলে পরী ছাড়িবে।

ব্রহ্মদৈত্য ছাড়ান কবচ—"ক্লীং চর্ব্বং হ্নং হ্নং ঝং শাঃ।" এই মন্ত্র পারুলপত্রে লিখিয়া ব্রহ্মদৈত্য পাওয়া রোগীর মস্তকে কবচ করিয়া ধারণ করাইলে তাহাকে ব্রহ্মদৈত্য ছাড়িয়া পলায়ন করে।

ডাকিনী দূরীকরণ—"ওঁ রক্ত জয় জয় ফট্ রক্তাম্বরধারিণীং উৎকটবেধতীং স্বাহা।" এই মন্ত্র জপদ্বারা ডাকিনীভয় দূর করা যায়।

ডাকিনী বন্ধন প্রকরণ—হুঁ হুঁ অগ্নিনিয়া মঞ্জিবন্ধনিমি নাগপতে নমানকং স্বাহা।" এই মন্ত্রদ্বারা ডাকিনীকে বন্ধন করা যায়। "মরালং সরালং করে ওঁ স্বাহা।" এই মন্ত্রদ্বারা ডাকিনীর মুণ্ড বন্ধন করা যায়।

পিশাচ গ্রহণ ও তাহা নিবারণ—"ওঁ টং টাং টিং টীং টুং টৃং টেং টৈং টোং টৌং টং টঃ। অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন পিশাচ স্বাহা।" শাখোটবৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা নয় অঙ্গুলি পরিমিত কীলক নির্ম্মিত করিয়া, এই মন্ত্রদ্বারা সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, "অমুকং" এই শব্দের স্থলে যাহার নাম করিয়া চৌমাথা পথের মধ্যে পুতিয়া রাখিবে, এবং সেই স্থলে পিশাচকে মাষকলায়, মাংস, রক্তবর্ণ পুষ্পাদিযুক্ত অন্ন নিবেদন করিয়া দিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পিশাচে পাইবে। কাহারও নামে যদি কেহ এইরূপ প্রক্রিয়া করে, তাহা হইলে সেই অভিমন্ত্রিত কীলক চৌমাথা পথ-মধ্য হইতে তুলিয়া ফেলিলে, সেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া পিশাচ পলাইয়া যায়।

ডাকিনী গ্রহণ ও তৎ-শান্তিকরণ—"ওঁ ডং ডাং ডিং ডীং ডুং ডৃং ডেং ডৈং ডোং ডৌং ডং ডঃ। অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন ডাকিনী স্বাহা।" মানুষের অস্থিদ্বারা ছয় অঙ্গুলি পরিমিত কীলক প্রস্তুত করিয়া, এই মন্ত্রদ্বারা সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করতঃ "অমুকং" শব্দের স্থলে যাহার নাম করিয়া শ্মশানের মধ্যে ছুড়িবে, তাহাকে ডাকিনীতে পাইবে; এবং ঐ কীলক গৃহমধ্যে ছুড়িলে সপরিবারকেই ডাকিনীতে পাইবে। যদি কাহাকে বা কাহারও সপরিবারকে এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা ডাকিনী পাওয়াইয়া থাকে, তবে—"ওঁ সং সাং হাং অমুকং শান্তির্ভবতু স্বাহা।" এই মন্ত্রদ্বারা ঘৃতমিশ্রিত সর্ষপ দ্বারা সহস্রবার হোম করিলে, ডাকিনী ছাড়িয়া পলাইবে।

আত্মরক্ষা,—"ওঁ আহাঙ্গ ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরী অবতর

অবতর স্বাহা। ১। ওঁ দশাঙ্গুলি ভীন্দলী বিকন্তহারি ভেরুন্ত ভৈরবী বিন্তারিণী রোণাবন্ধ মুষ্টিবন্ধ কৃত্যবন্ধ রুদ্রবন্ধ নৈখবন্ধ গ্রহবন্ধ প্রেলবন্ধ ভূতবন্ধ রাক্ষসবন্ধ কঙ্কালবন্ধ বেতালবন্ধ আকাশবন্ধ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বদিশাবন্ধ বেঁ আচ কহ কহ হস হস অবতর অবতর দশাবিপ্রাণী দশাঙ্গুলি শতাস্ত্রবন্ধিনী বন্ধাসি হুঁ ফট্ স্বাহা।”

এই সকল মন্ত্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে রেখা অঙ্কিত করিয়া গণ্ডী দিয়া তন্মধ্যে যে অবস্থিতি করে, তাহার কদাপি ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, দৈত্য, রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য, শাকিনী, ডাকিনী, যোগিনী, রাক্ষসী, যক্ষিণী, হাকিনী, পিশাচী, প্রেতিনী, পরী, দানবী, দৈত্যা, ভূতিনী প্রভৃতির ভয় থাকে না। ওঝা বা তান্ত্রিকগণ এইরূপ গণ্ডী করিয়া তন্মধ্যে বসিয়া, তবে রোগীকে দেখিয়া থাকেন। অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে জল পড়িয়া রোগীকে সেবন করাইতে হয়।

জলপড়া মন্ত্র,—“ওঁ আং ক্রৌং হুঁ মার হস্ত গাং হ্রীঁ কারে সমস্ত দোষান্ হর হর বিগর হুঁ ফট্ স্বাহা।”

কে কোন প্রকারেই ভূতের উপদ্রব, ভূতের আবেশ বা ভয় উৎপাদিত হউক, এক সপ্তাহকাল ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই কবচ পাঠ করিলেই নিশ্চয়ই তাহা বিদূরিত হইয়া থাকে।

অথ নৃসিংহকবচম্,—“ওঁ নমো নৃসিংহায়। নারদ উবাচ। ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতে। মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো। যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন। কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্। যস্য প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥ স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ। লক্ষ্মীর্জ্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ। পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ। ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে

ভূতাদিবিনিবারকম্। যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসা ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ। পঠনাদ্ধারণাদ্‌যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ। ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাপি কবচস্য প্রজাপতিঃ। ঋষিশ্ছন্দোঽস্য গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ। ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং। দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ। কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্‌ভগবতে চক্ষুষী মম। নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্। দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্। সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশায় চ সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচ পচ দ্বয়ং। রক্ষ রক্ষ বর্ম্ম চাস্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং মম। তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্ গুদং মম। ক্লীং পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ। নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রোং ক্ষ্রৌঞ্চ হুং ফট্। ষড়ক্ষরঃ কটীং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদম্। বাসুদেবায় পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং উরুদ্বয়ম্। ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ। ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্। ক্ষ্রৌং নৃসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু। ইতি তে কবচং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ। গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ। সর্ব্ব-পুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ। শতমষ্টোত্তরঞ্চাপি পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ। হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধকোত্তমঃ। ততস্তু সিদ্ধি-কবচম্ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ। স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ। পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ। অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ। ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্। যোষিদ্বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে। বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ। কাকবন্ধ্যা

চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ। জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহু পুত্রবতী ভবেৎ। কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ। ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। ভূতপ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে। তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্। যস্মিন্ গৃহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি। তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ।

ইতি ব্রহ্মসংহিতায়ং ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম
নৃসিংহকবচং সমাপ্তং।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঔষধদ্বারা ভূতছাড়ান।

গুরু। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির আরোগ্য জন্য তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে অনেকপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে তাহাও বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।

শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা।
তেন নস্য-প্রদানং স্যাদ্ ভূতবৃন্দস্য বিদ্রবম্॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল তণ্ডুলের জল (চেলুনি জল) দ্বারা পেষণ করিয়া নস্য প্রদান করিলে ভূত ছাড়িয়া যায়।

অগস্ত্যপুষ্পনস্যো বৈ সমরীচশ্চ ভূতহৃৎ।

মরিচের সহিত বকফুল একত্র করিয়া নস্য করিলে ভূত ছাড়ে।

ভুজঙ্গবর্ম্ম বৈ হিন্দু নিম্বপত্রাণি বৈ যবাঃ।
গৌরসর্ষপ এভিঃ স্যাল্লেপো ভূতহরঃ কৃতঃ॥

সাপের খোলস, হিং, নিম্বপত্র, যব ও শ্বেতসর্ষপ একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়।

গোরোচনা মরিচানি পিপ্পলী সৈন্ধবং মধু।
অঞ্জনঙ্কৃতমেভিঃ স্যাদ্ গ্রহভূতহরং শিবে॥

গোরোচনা, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধব ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ভূত পলাইয়া যায়।

বচাত্রিকটুকঞ্চৈব করঞ্জং দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা শিরীষো রজনীদ্বয়ম্॥
প্রিয়ঙ্গু নিম্বত্রিকটু গোমূত্রেণাবঘর্ষিতম্।
নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনন্তথা॥
অপস্মারবিষোন্মাদশোষালক্ষ্মীজ্বরাপহম্।
ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চ শাসনম্॥

বচ, ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, ডহরকরমচা, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, শ্বেতকন্টিকারী, শিরীষ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু এবং নিম্ব গোমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ, শরীরে লেপন, স্নান ও গাত্র মার্জ্জন করিলে অপস্মার, উন্মাদ, শোষ ও জ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হয়। বিষদোষ থাকে না, অলক্ষ্মী ছাড়ে, সর্ব্বপ্রকার ভূতের ভয় বিনাশ পায়, এবং রাজদ্বারে কোন নিগ্রহই থাকে না।

কূর্ম্মমৎস্যাখুমহিষগোশৃগালাশ্চ বানরাঃ।
বিড়ালবর্হিকাকাশ্চ বরাহোলুককুক্কুটাঃ॥
হংস এষাঞ্চ বিণ্মূত্রং মাসং বা রোমশোণিতম্।
ধূপং দদ্যাজ্‌ জ্বরার্ত্তেভ্য উন্মত্তেভ্যশ্চ শান্তয়ে॥

অপস্মারাভিভূতেভ্যো গ্রহার্ত্তেভ্যশ্চ শান্তয়ে।
এতান্যৌষধজাতানি কথিতানি মহেশ্বরি॥

কচ্ছপ, মৎস্য, ইন্দুর, মহিষ, গো, শৃগাল, বানর, বিড়াল, ময়ূর, কাক, বরাহ, উল্লুক, কুক্কুট এবং হংস এই সকল জন্তুর বিষ্ঠা, মূত্র, মাংস, রোম কিম্বা রক্তদ্বারা ধূপ প্রদান করিলে, অপস্মার ও জ্বররোগী, উন্মত্ত এবং ভূত ও গ্রহ কর্তৃক পীড়িতদিগের শান্তি হইয়া থাকে।

গজাহ্বপিপ্পলীমূলব্যোষামলকসর্ষপান্॥
গোধা-নকুল-মার্জ্জারঋক্ষপিত্তপ্রভাবিতান্।
নস্যাভ্যঞ্জনসেকেষু বিদধ্যাদ্ যোগতত্ত্ববিৎ॥

গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ এবং আমলকী ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোসাপ, বেজী, বিড়াল ও ভল্লুকের পিত্তে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ নস্যে, অঙ্গমর্দ্দনে ও স্নানে প্রয়োগ করিবে। ভূততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ভূতাধিষ্ঠান বিদূরীত হয়।

খরাশ্বাশ্বতরোলূককরভশ্বশৃগালজম্।
পুরীষং গৃধ্রকাকানাং বরাহস্য চ পেষয়েৎ।
বস্তমূত্রেণ তৎসিদ্ধং তৈলং স্যাৎ পূর্ব্ববর্দ্ধিতম্॥

গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, পেচক, হস্তিশাবক, কুক্কুর, শৃগাল, গৃধিনী, কাক ও শূকর এই সকল জন্তুর বিষ্ঠা ছাগলের মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া তাহার সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈলে ভূতকৃত রোগ বিশেষ হিতকর।

শিরীষবীজং লশুনং শুণ্ঠীং সিদ্ধার্থকং বচাম্।
মঞ্জিষ্ঠাং রজনীং কৃষ্ণাং বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ।
বর্ত্তীশ্ছায়াবিশুষ্কাস্তাঃ সপিত্তা নয়নাঞ্জনম্॥

শিরীষবীজ, রসুন, শ্বেতসর্ষপ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও তেউড়ি এই সকল ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ছায়াতে শুষ্ক করিয়া, তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ভূতজনিত রোগ শান্তি হয়।

অঞ্জন করিতে হইলে ঔষধ সকল পেষণ করতঃ গুটিকা করিয়া সেই গুটিকা ঘসিয়া অঞ্জন করিবে। পান ও সেবন করিতে হইলে ক্বাথ করিয়া পান ও সেবন করিবে। উদ্বর্ত্তন করিতে হইলে ঔষধ সকল চূর্ণ করিয়া কিম্বা পেষণ করিয়া গাত্রে ম্রক্ষণ করিবে।

ভূতাধিষ্ঠান-শান্তি-কার্য্যে কোনরূপ অযৌক্তিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। দৈবগৃহে এই শান্তি বিধান করিবে। প্রেতপ্রক্রিয়া ভিন্ন প্রতিকূল আচরণ করিবে না। ভূতাধিষ্ঠানের প্রতিকূল-প্রক্রিয়া করিলে রোগী ও বৈদ্য উভয়কে মহাবলশালী ভূতগণ বিনাশ করিয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ভূতের নাম ও ক্রিয়াভেদ।

শিষ্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ভূতগণের নাম ও ক্রিয়াভেদ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহী হইলেই সকলেই ভূত, তবে তাহার আবার শ্রেণী ও নামভেদ কেন হইয়াছে?

গুরু। মানুষ মাত্রেই এক—তবে আবার পৃথক্ পৃথক্ নাম হয় কেন? মানুষ বলিয়া ডাকিলেই চলে। তারপরে কর্ম্মানুসারেও পৃথক্ সংজ্ঞা করা হয়, যথা—গুরু, পুরোহিত, গ্রন্থকার, ডাক্তার, কবিরাজ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার ইত্যাদি ইত্যাদি। তদ্রূপ আত্মিকগণ তাহাদের পূর্ব্ব-কর্ম্মার্জ্জিত সংস্কার লইয়া আত্মিকযোনিতে যেভাবে কার্য্য করিবে,

তাহাকে সেই শ্রেণীতে ফেলা হইয়া থাকে। নাম বা শ্রেণী কেবল আমাদের বুঝিবার জন্য। কবিরাজ বলিলে দ্বারিক, হরীশ, নরীশ প্রভৃতি যাহারাই কবিরাজী করে, তাহাদিগকে যেমন বুঝায়; আবার দ্বারিক, হরীশ, নরীশ মরিয়া কেদার, ভবনাথ, রামদুলালও যেমন কবিরাজ,—তদ্রূপ যে আত্মিক যে ভাবে কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে সেই শ্রেণী বা নামে ভুক্ত করা হয়। সে একটা কোন নির্দ্দিষ্ট আত্মিক নহে। কার্য্য দেখিয়া ঐ নামে আখ্যাত করা হয়।

শিষ্য। তাহাদের শ্রেণী বা নাম ও তদাবিষ্ট রোগীদিগের অবস্থা ও প্রতিকার আমাকে বলিয়া দিন।

গুরু। তন্ত্রশাস্ত্রে ভূতগণের অষ্টপ্রকার শ্রেণী বলা হইয়াছে। ঐ আটপ্রকার শ্রেণী যথা,—দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃগ্রহ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস ও পিশাচ। বলা বাহুল্য—ইহারা ঐ সকল নামধেয় স্থূলদেহী নহে, ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা দেবগ্রহ।

পূর্ব্ব কথিত আট প্রকার ভূতাধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কথিত হইতেছে।

১।—যাহার প্রতি দেবগ্রহের আবির্ভাব হয়, সেই ব্যক্তি সন্তুষ্ট, শুদ্ধমতি, গন্ধমাল্যপ্রিয়, তন্দ্রাবিহীন, অসম্বদ্ধসংস্কৃতভাষী, তেজীয়ান, স্থিরনয়ন, বরদাতা ও ব্রহ্মতেজস্বী হয়।

২।—যাহার প্রতি দানবগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, তাহার শরীরে ঘর্ম্ম হইতে থাকে; এবং সেই ব্যক্তি দ্বিজ, গুরু ও দেবতার দোষ বর্ণনা করে এবং কঠিন নয়ন, নির্ভয়, বিমার্গদৃষ্টি, অন্নপানাদিতে অসন্তুষ্ট ও দুষ্টাত্মা হয়।

৩।—গন্ধর্ব্বগ্রহপীড়িত ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্ত, পুলীন ও উপবনসেবী, স্বাচারনিরত এবং গীত ও গন্ধ-মাল্যপ্রিয় হয়। সেই ব্যক্তি কখন নৃত্য করে, কখন বা হাসে ও কোন সময়ে মনোরম অল্প শব্দ করে।

৪।—যক্ষ গ্রহাভিভূত ব্যক্তির চক্ষু তাম্রবর্ণ হয়। ঐ ব্যক্তি সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ বস্ত্রধারী ব্যক্তিকে ভালবাসে এবং গাম্ভীর্য্যশীল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয়। এবং অল্প বাক্য বলে ও "কাহাকে কি দিব" এইরূপ বাক্য বলিয়া থাকে।

৫।—যাহার উপর পিতৃগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, সেই ব্যক্তি দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করিয়া কুশাস্তরণে মৃত ব্যক্তিকে পিণ্ড ও জল প্রদান করে এবং শান্তচিত্ত, মাংসলিপ্সু ও তিল, গুড় এবং পায়সাভিলাষী হয়।

৬।—যে ব্যক্তি ভুজঙ্গম গ্রহকর্তৃক পরিপীড়িত হয়, সে কদাচিৎ সর্পের ন্যায় ভূমিতে গমন করে এবং জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠের প্রান্তস্থল লেহন করিতে থাকে এবং নিদ্রালু ও গুড়, দুগ্ধ, মধু এবং পায়সলিপ্সু হয়।

৭।—রাক্ষসগ্রহাভিভূত ব্যক্তি মাংস, রক্ত ও নানাপ্রকার মদ্য-বিকার-লিপ্সু হইয়া থাকে—এবং নির্লজ্জ, অতিনিষ্ঠুর, অতিধীর, ক্রোধশীল ও বিপুল বলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেষী হইয়া থাকে।

৮।—পিশাচগ্রহাধিষ্ঠিত ব্যক্তি ঊর্দ্ধহস্ত, কৃষ্ণ ও কঠোর হয়। বহু-প্রলাপী, দুর্গন্ধযুক্ত, অশুচি, অতি-চঞ্চল ও বহ্বাহারী হয় এবং নির্জ্জন-স্থান, হিম, জল ও রাত্রিসেবী হইয়া থাকে। নিশ্চেষ্ট হইয়া ভ্রমণ করে এবং রোদন করিয়া থাকে।

পূর্ণিমাতিথিতে দেবগ্রহ, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা সময়ে দানব, অষ্টমী তিথিতে গন্ধর্ব্ব, প্রতিপৎ তিথিতে যক্ষ, কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগ্রহ, পঞ্চমী তিথিতে ভুজঙ্গম, রাত্রিতে রাক্ষস ও চতুর্দ্দশীতে পিশাচ মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে। যেরূপ দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে ছায়া, প্রাণিশরীরে শীতোষ্ণতা, সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্যকিরণ এবং দেহে প্রাণ প্রবেশ করে, সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে মনুষ্যশরীরে গ্রহভূতাদি প্রবেশ করিয়া থাকে।

ভূতাধিষ্ঠিত রোগীর চিকিৎসার জন্য নিয়মপূর্ব্বক জপ ও হোম করিবে

এবং রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য ও সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য দিবে, ইহা সামান্য বিধি। বস্ত্র, মদ্য, মাংস, ক্ষীর, রুধির প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য যে যে গ্রহের অভিলষিত সেই সেই দেবগ্রহকে সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিবে। যে সকল দিনে যে দেবগ্রহের মনুষ্যে অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, সেই সেই দিনই সেই দেবগ্রহের পূজার প্রশস্ত দিন। দেবালয়ে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক হোম করিয়া দেবগ্রহের বলি প্রদান করিবে। কুশ, তণ্ডুল, পিষ্টক, ঘৃত, ছত্র ও পায়স এই সকল দ্রব্য চত্বরাদি স্থানে দানবকে অর্পণ করিবে। চতুষ্পথ মধ্যে অথবা ভয়ঙ্কর বনমধ্যে রাক্ষসগ্রহের বলিদান করিবে। শূন্যগৃহে পিশাচগ্রহের বলি প্রদান করিবে।

এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের সমাধান জন্য তান্ত্রিক ও কর্ম্মী এবং ভূতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই প্রশস্ত। অতএব নিজে এই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া, উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করানই কর্ত্তব্য;—কেন না, এই সকল কার্য্যের অঙ্গহানি হইলে কোন ফল হয় না, অধিকন্তু বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পেঁচোয় পাওয়া।

শিষ্য। বালকগণের আঁতুড়ে রোগকে ডাক্তারি-মতে কন্‌ভল্‌সন্ ও ক্রুপ (Convulsion and Croup) বলে, এই রোগকেই কি "পেঁচোয় পাওয়া" বলা হইয়া থাকে?

গুরু। কন্‌ভল্‌সন্ ও ক্রুপ এবং পেঁচোয় পাওয়া এক রোগ না হইতে পারে। কিন্তু আঁতুড়ে বালকের ঐরূপ রোগ হইলেই ডাক্তারি

চিকিৎসায় সময়ে সময়ে যে ফল পাওয়া যায় না, তাহা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, রোগ নির্ব্বাচন করিতে অপারগতা। অনেক ওঝার দ্বারা বালকগণের এই রোগ আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, ইহা বোধ হয় তুমি অনেক স্থলে শুনিয়া থাকিবে। অনেক স্থলে কন্‌ভল্‌সন্ ও ক্রুপ রোগ হইতে পারে, কিন্তু "পেঁচোয় পাওয়া" রোগও যে সাধারণ, তাহাই বলা বাহুল্য। কেন পেঁচোয় পায় এবং পেঁচোয় পাওয়া বালকের লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিয়া দিতেছি। পেঁচোয় পাওয়া আর কিছুই নহে,—বালকের মাতা প্রভৃতির পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য নয়টি বালগ্রহের আবেশ হইয়া থাকে। নয়টি বালগ্রহ যথা—স্কন্দ, স্কন্দাপস্মার, শকুনী, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমণ্ডিকা ও নৈগমেশ।

ধাত্রী ও মাতার পূর্ব্বকৃত অপরাধ, মঙ্গলাচারশূন্যতা, শৌচাচার-হীনতাদি কারণে বালকদিগের প্রতি ভূতাধিষ্ঠান হইয়া থাকে। বালকের প্রতি ভূতাবেশ হইলে, তাহারা কখন ভীত বা তর্জ্জিত হয়, কখন বা হাসে, কোন কোন সময় কাঁদে। পূজাহেতু ভূতগণ বালকদিগের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। স্কন্দাদি বালগ্রহগণ বালকের প্রতি আবির্ভূত হইলে, বালকগণের যেরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে, শ্রবণ কর।

যে বালকের প্রতি স্কন্দগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, তাহার কুক্কুরের ন্যায় চক্ষু হয়, শরীরে ক্ষত জন্মে ও তাহাতে দুর্গন্ধ হয়। স্তনপানে বিদ্বেষ হয়, মুখ বক্র হয় এবং এক চক্ষু বিনষ্ট ও এক চক্ষু স্বাভাবিক থাকে। ঐ বালক সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইয়া অল্প অল্প ক্রন্দন করিতে থাকে ও দৃঢ়রূপে মুষ্টিদ্বয় বন্ধন করিয়া থাকে।

স্কন্দাপস্মারগ্রহ-পীড়িত শিশু কখন অচেতন ও কখন সচেতন থাকে, কোন সময়ে নিস্তব্ধ ও কোন সময়ে কর-চরণ দ্বারা নৃত্য করে, বিষ্ঠা ও

মূত্র পরিত্যাগ করে এবং সশব্দ জৃম্ভণ করিয়া থাকে ও তাহার মুখ দিয়া ফেনা বহির্গত হয়।

যে বালকের প্রতি শকুনির অধিষ্ঠান হয়, তাহার অঙ্গ সকল শিথিল ও সে বালক ভয়-চকিত হয়। তাহার শরীরে পক্ষিগাত্রের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায় ও সর্ব্বাঙ্গে ব্রণ জন্মে। ঐ সকল ব্রণ হইতে পূঁজাদি স্রাবিত হইতে থাকে। ব্রণ সকলে দাহ হইয়া থাকে।

যাহার প্রতি রেবতীর আবির্ভাব হয়, তাহার মুখ রক্তবর্ণ, মল হরিদ্রা-বর্ণ, দেহ পাণ্ডুবর্ণ কিম্বা পিঙ্গলবর্ণ হয় এবং জ্বর হয়, মুখ পচিয়া থাকে ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়।

পূতনাগৃহীত বালক, দিবা কিম্বা রাত্রি কোন সময়েই সুখনিদ্রা লাভ করিতে পারে না। অধিক বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে। তাহার গাত্রে কাক-গাত্রের ন্যায় গন্ধ অনুভূত হয়। বমন হইতে থাকে, গাত্র রোমাঞ্চিত হয় এবং ঐ বালকের অতিশয় পিপাসা থাকে।

যে বালক স্তন্য পান করে না, অতিসার, হিক্কা, কাস, বমন ও জ্বরে পীড়িত থাকে, বিবর্ণ হয় ও সর্ব্বদা অধোবদনে শয়ন করে; এবং যাহার শরীরে অম্লগন্ধ অনুভূত হয়, তাহার প্রতি অন্ধপূতনার অধিষ্ঠান হইয়াছে জানিবে।

যে বালক উদ্বিগ্ন ও অতিশয় কম্পিত হয়, রোদন করে ও নিদ্রিত থাকে এবং যাহার অঙ্গে শব্দ হয়, অঙ্গ শিথিল হইয়া যায় ও অধিক বিষ্ঠা নিঃসারিত হয়, তাহাকে শীতপূতনা-পরিগৃহীত জানিবে।

যাহার শরীর ম্লান হইয়া যায়, কিন্তু হস্ত পদ ও মুখের উত্তম দীপ্তি থাকে; যে বালক অধিক আহার করিতে পারে, যাহার উদরে কৃষ্ণবর্ণ শিরা প্রকাশ পায় এবং যে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে ও যাহার শরীরে মূত্রতুল্য দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, সেই বালকের প্রতি মুখমণ্ডিকার আবির্ভাব জানিবে।

যে বালক ফেনা বমন করে ও যাহার মধ্যভাগ নম্র হয়, যে উদ্বিগ্ন-চিত্তে বিলাপ করে, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকে, জ্বরিত হয় ও নিশ্চেতন থাকে, যাহার শরীরে বসার ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়, সেই বালকের প্রতি নৈগমেশ ভূতের অধিষ্ঠান হইয়াছে, নিশ্চয় করিবে।

বালগ্রহ-পীড়িত যে বালক নিস্তব্ধ হইয়া থাকে, মাতৃস্তন পান করে না ও ক্ষণে ক্ষণে মোহিত হয়, সে বালককে অচিরকাল মধ্যে গ্রহ বিনাশ করিয়া থাকে। উক্ত লক্ষণগ্রস্ত বালককে চিকিৎসা করিবে না। ইহার বিপরীতে সাধ্য অর্থাৎ অচিরকালজাত রোগের চিকিৎসা করিবে।

বালকের বয়স ছয়দিনের হইতে আর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে বালগ্রহের আবেশ হইতে পারে।

রোগাক্রান্ত বালককে পুরাতন ঘৃতদ্বারা অভ্যক্ত করিবে। পবিত্র গৃহে রাখিবে এবং সেই গৃহে সর্ষপ নিক্ষেপ করিবে। সর্ষপ তৈলদ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবে। বালকের নিকট অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিবে। সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, সর্ব্বৌষধি ও গন্ধমাল্যদ্বারা বালককে অলঙ্কৃত করিবে। অতঃপর যে বালগ্রহের অধিষ্ঠান হইয়াছে, লক্ষণের দ্বারা তাহা অবগত হইয়া, তাহার হোম, বলিপ্রদান ও মন্ত্রাদি পাঠ করিবে; এবং ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবে।

স্কন্দগ্রহের মন্ত্র ও ঔষধ,—রক্তমাল্য, রক্তপতাকা, রক্তগন্ধ, বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, ঘণ্টা ও কুক্কুর এই সকল দ্রব্যদ্বারা বালকের হিতার্থ স্কন্দগ্রহের বলি নিবেদন করিবে। তৎপরে তিন দিবস পর্য্যন্ত রাত্রিকালে চত্বরস্থানে নূতন ধান্য ও নূতন যবযুক্ত জল গায়ত্রীমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা আচমন পূর্ব্বক অগ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিবে। সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, সুরামুণ্ড ও কট্‌ফল দ্বারা হোম করিবে।

রক্ষামন্ত্র,—"তপসাং তেজসাং চৈব যশসাং বপুষাং তথা। নিধনং

যোঽব্যয়ো দেবঃ স তে স্কন্দ প্রসীদতু। গ্রহসেনাপতির্দেবো দেবসেনাপতির্বিভুঃ। দেবসেনারিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্ গুহঃ। দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্য চ যঃ সুতঃ। গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রযচ্ছতু। রক্তমাল্যাম্বরঃ শ্রীমান্ রক্তচন্দন ভূষিতঃ। রক্তদ্রব্যবপুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ॥" এই মন্ত্রে প্রত্যহ বালকের গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিবে।

বাতঘ্ন বৃক্ষের পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বালককে স্নান করাইবে এবং বাতঘ্নবৃক্ষের মূলের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখাইবে।

দেবদারু, রাস্না ও মধুর বৃক্ষ এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত ও দুগ্ধ পাক করিয়া বালককে সেবন করাইবে।

সর্ষপ, সাপের খোলস, বচ, শ্বেত কচু, ঘৃত এবং উষ্ট্র, ছাগল, মেষ ও গরু ইহাদিগের লোমে এই সমুদয় দ্রব্য একত্র করিয়া ধূমপান করিলে শিশুর ভূতাধিষ্ঠান নিবৃত্তি হয়।

সোমলতা, ইন্দ্রবল্লী, শমী, বিল্বকণ্টক ও রাখালশশার মুণ্ড এই সকল গ্রন্থন করিয়া ভূতাধিষ্ঠিত বালককে ধারণ করাইলে ভূতের দৃষ্টি ছাড়ে।

স্কন্দাপস্মার গ্রহের মন্ত্র ও ঔষধ,—বিল্ব, শিরীষবৃক্ষ, শ্বেতদূর্ব্বা ও সুরসাদিগণ এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জল দ্বারা বালককে চতুষ্পথে স্নান করাইবে, শান্তির জন্য পক্ক ও অপক্ক মাংস, রক্ত ও দুগ্ধ আদি ভূতোদন নিবেদন করিয়া দিবে। তিল, তণ্ডুল, মাল্য, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য দ্বারা বলি প্রদান করিবে।

রক্ষামন্ত্র,—"স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা। বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশোঃ শিবোঽস্তু বিকৃতাননঃ॥"—এই মন্ত্রে বালকের গাত্র মার্জ্জনা করিবে।

ক্ষীরীবৃক্ষের ক্কাথে কাকোলী আদিগণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া

দুগ্ধ সহযোগে পান করাইবে এবং বচ ও হিঙ্গুদ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করিবে।

গৃধিনী ও পেচকের বিষ্ঠা, কেশ, হস্তীর নখ, ঘৃত ও বৃষের লোম এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে স্কন্দাপস্মার গ্রহের দৃষ্টি ছাড়ে।

দূর্ব্বা, শাল্মলীমূল, তেলাকুচারমূল ও শূকশিম্বীর মূল এই সকল একত্র করিয়া বালকের গলায় ধারণ করাইলে রোগ মুক্ত হয়।

শকুনি গ্রহের মন্ত্র ও ঔষধ,—বেতস, আম্র ও কদ্বেল এই সকলের ক্বাথ করিয়া বালককে নিকুঞ্জ স্থানে যথাবিধি স্নান করাইবে এবং বিবিধ পুষ্পদ্বারা শকুনির পূজা করিবে।

রক্ষা-মন্ত্র,—"অন্তরীক্ষচরা দেবী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। অধোমুখী তীক্ষ্ণতুণ্ডা শকুনিস্তে প্রসীদতু॥ দুর্দ্দর্শনা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্বরা। লম্বোদরী শঙ্কুকর্ণী শকুনিস্তে প্রসীদতু॥"

যষ্টিমধু, বেণার মূল, বালা, অনন্তমূল, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, গৈরিক এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শিশুর গাত্রে মাখাইয়া দিবে। শিশুর শরীরে ব্রণ থাকিলে দ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া তাহাতে দিবে।

স্কন্দগ্রহাধিষ্ঠানে যে প্রকার ধূপ ও ঘৃত ব্যবস্থা আছে, ইহাতেও তাহার প্রয়োগে শান্তি হইয়া থাকে।

শতমূলী, সহদেবীলতা, কর্কটী, বিছুটী, কণ্টিকারী, লক্ষণা ও বৃহতী, এই সকল দ্রব্য বালককে ধারণ করাইবে।

রেবতী গ্রহের মন্ত্র ও ঔষধ,—অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, অনন্তমূল, পুনর্নবা, সহদেবীলতা ও ভূমিকুষ্মাণ্ড এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া বালককে ও স্তন্যদায়িনীকে নদীসঙ্গম স্থলে স্নান করাইবে।

শর্করা, গোধূম, লাজা, দুগ্ধ ও শাল্যোদন এই সকল দ্রব্য দ্বারা রেবতীকে গোতীর্থে নিবেদন করিবে।

রক্ষা-মন্ত্র,—"নানাবস্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যানুলেপনা। চলৎ কুণ্ডলিনী শ্যামা রেবতী তে প্রসীদতু। লম্বা করালা বিনতা তথৈব বহুপুত্রিকা। রেবতী সততং মাতা সা তে দেবী প্রসীদতু।"

বটবৃক্ষ, শালবৃক্ষ, অর্জ্জুনবৃক্ষ, ধাতকী, গাববৃক্ষ এবং কাকোলী আদিগণ ইহাদিগের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে রেবতীদৃষ্টির শান্তি হয়।

কদ্বেল, শঙ্খচূর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য একত্রে প্রলেপ দিবে।

গৃধিনীর বিষ্ঠা, পেচকের বিষ্ঠা, যব, পিয়াজ ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রাতে ও সায়াহ্নে ধূপ দিবে।

বরুণকাষ্ঠ, নিম্বকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, কর্পূর ও জীবপুত্রিকা একত্রে মালা করিয়া ধারণ করিলে শান্তি হইয়া থাকে।

পূতনা গ্রহের মন্ত্র ও ঔষধ,—ব্রাহ্মীবৃক্ষ, অরণু, বরুণবৃক্ষ, নিম্ববৃক্ষ, দুরালভা, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে বালককে স্নান করাইবে ও বলিদ্রব্য এবং বিবিধ উপহারদ্বারা পূতনা দেবীর পূজা করিবে।

রক্ষা-মন্ত্র,—"মলিনাম্বরসম্বীতা মলিনা ব্রহ্মমূর্দ্ধজা। শূন্যাগারস্থিতা দেবী দারকং পাতু পূতনা। দুর্দ্দশনা সুদুর্গন্ধা করালা মেঘকালিকা। ভিন্নাগারশ্রয়া দেবী দারকং পাতু পূতনা॥"

বচ, হরীতকী, শ্বেতদূর্ব্বা, হরিতাল, মনঃশিলা, কুড় ও ধূপ এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিয়া বালকের গাত্রে মাখাইবে।

বংশলোচন, মধুরাদিগণ, কুড়, তালিশপত্র, খদির, রক্তচন্দন,

তিলিকাবৃক্ষ এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া বালককে সেবন করাইবে।

দেবদারু, বচ, হিঙ্গ, কুড়, ধারাকদম্ব, এলাইচ ও রেণুক এই সকল দ্রব্যের ধূপ দিবে।

শ্বেতগুঞ্জা, কণ্টিকারী, তেলাকুচা ও গুঞ্জা এই সকল দ্রব্য বালককে ধারণ করাইবে।

বালদ্রব্য, যথা—মৎস্যান্ন, তিল, তণ্ডুল ও মাংস এই সকল দ্রব্য দুইটী শরাবের মধ্যগত করিয়া শূন্য গৃহে বলি প্রদান করিবে।

অন্ধপূতনার মন্ত্র ও ঔষধ,—পটোলপত্রের ক্বাথে চতুষ্পথে বালককে স্নান করাইবে ও অপক্কমাংস, পক্কমাংস রক্ত দ্বারা চতুষ্পথে বলি প্রদান করিবে।

রক্ষা-মন্ত্র,—"করালা পিঙ্গলা মুণ্ডা কষায়াম্বরবাসিনী। দেবী বালমিমং প্রীতা সংরক্ষত্বন্ধপূতনা।"

সুরা, কাঁজি, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা ও ধূপ এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া বালককে মাখাইবে।

সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য দ্বারা বালকের গাত্রে ও চক্ষুতে প্রলেপ দিবে।

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, মধুরাদিগণ, মধু, শালপর্ণী, বৃহতী ও কণ্টিকারী এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া বালককে পান করাইবে।

কুক্কুটের বিষ্ঠা, কেশ, চর্ম্ম, সাপের খোলস ও পুরাতন ভিক্ষাপাত্র একত্র করিয়া ধূপ দিবে।

শাল্মলীবৃক্ষ, আলকুশী, শিম্বীমূল ও দূর্ব্বা এই সকল দ্রব্য ধারণ করাইবে।

শীতপূতনার মন্ত্র ও ঔষধ,—কদ্‌বেল, শেফালিকা, তেলাকুচা, বিম্ব, প্রচীবল, বচ ও ভল্লাতকী এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার

ক্বাথে জলাশয়ের প্রান্তভাগে বালককে স্নান করাইবে ও মুগের অন্ন প্রস্তুত করিয়া বিবিধ উপহার, বারুণী মদ্য রুধিরের সহিত নদীতীরে শীতপূতনার বলি প্রদান করিবে।

রক্ষা-মন্ত্র,—"মুদ্গৌদনাশনা দেবী সুরশোণিত-পায়িনী। জলাশয়ালয়া দেবী পাতু ত্বাং শীতপূতনা।"

ছাগলের মূত্র, গোমূত্র, মুথা, দেবদারু, কুড় ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল দ্বারা বালকের গাত্রে অভ্যঞ্জন করিতে হয়। মঞ্জিষ্ঠা, সর্জ্জবৃক্ষ, খদিরবৃক্ষ, পলাশবৃক্ষ ও অর্জ্জুনবৃক্ষ এই সকল বৃক্ষের ছাল লইয়া তাহার ক্বাথ করিয়া, সেই ক্বাথে উক্ত তৈল পাক করিবে,—পাককালে দুগ্ধ দিবে।

গৃধিনীর বিষ্ঠা, পেচকের বিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, সাপের খোলস, নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ প্রদান করিবে। এবং গুঞ্জা ধারণ করাইবে।

মুখমণ্ডিকার মন্ত্র ও ঔষধ,—কদ্বেল, বিল্ব, জয়ন্তী, বংশলোচন, এরণ্ডবৃক্ষ ও পাটলীবৃক্ষ এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া মন্ত্রপূত জলদ্বারা গোষ্ঠমধ্যে বালককে স্নান করাইবে ও হরিতালচূর্ণ, মাল্য, অঞ্জন, পারদ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য ও পায়স এবং সংস্কৃতঘৃতদ্বারা বলিপ্রদান করিবে।

রক্ষা-মন্ত্র,—"অলঙ্কৃতা রূপবতী সুভগা কামরূপিণী। গোষ্ঠমধ্যালয়রতা পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিকা॥"

ভৃঙ্গরাজের স্বরস, অজগন্ধা ও অশ্বগন্ধা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল ও বসা পাক করিয়া বালককে মাখাইবে।

মৌরি, দুগ্ধ, বংশলোচন, মধুরাদিগণ, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে।

বচ, ধূপ, কুড় ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যের ধূপ দিবে, চাতকের জিহ্বা ও সাপের জিহ্বা ধারণ করাইবে।

নৈগমেশ-মন্ত্র ও চিকিৎসা,—বিল্ব, অগ্নিমন্থ, পূতিকা, সুরা, কাঁজি ও ধান্যাম্ল এই সকল দ্রব্যের দ্বারা বটবৃক্ষের নিম্নে বালককে স্নান করাইবে এব তিলতণ্ডুল, মাল্য ও নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা ষষ্ঠী তিথিতে বটবৃক্ষমূলে বলি প্রদান করিবে।

রক্ষা-মন্ত্র,—"অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ কামরূপী মহাযশাঃ। বালং পালয়িতা দেবো নৈগমেশোঽভিরক্ষতু॥"

প্রিয়ঙ্গু, সরলকাষ্ঠ, শতমূলী, গুল্‌ফা, কৈবর্ত্তমস্তক, গোমূত্র, দধি, ঘোল ও কাঁজি এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া বালককে মাখাইবে।

দশমূলের ক্বাথ, দুগ্ধ, মধুরাদিগণ ও খর্জ্জুরের মস্তক এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে। বচ, হরীতকী, শ্বেতদূর্ব্বা ও জটামাংসী এই সকল দ্রব্য বালককে ধারণ করাইবে ও ঐ সকল দ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করিবে।

শ্বেতসর্ষপ, বচ, হিঙ্গ, কুড়, আতপতণ্ডুল, ভেলা, যমানী এই সকল দ্রব্য দ্বারা ধূপ দিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ভূত ছাড়ান।

গুরু। কামরূপ কামাখ্যা প্রভৃতি দেশের এবং ওঝাদিগের নিকট শ্রুত পরীক্ষিত বিবিধ ভাষার মন্ত্র ও প্রক্রিয়া বলিতেছি; শ্রবণ কর।

মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত বয়সেই ভূতাবেশ হইতে

পারে। জন্মের দিন হইতে ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভূতাবেশ হইলে তাহাকে 'পেঁচোয় পাওয়া' বলে। তদূর্দ্ধে 'ভূতে পাওয়া' বলিয়া থাকে।

যাহাকে ভূতে পাইয়াছে, তাহাকে ভূতছাড়ান চক্রের উপর বসাইবে এবং ওঝা নিজে নিম্নলিখিত গণ্ডী-মন্ত্রে গণ্ডী দিয়া নিজে উপবেশন করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভূতাদির আবেশ হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে হইলে, নিজেকেও বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়। নতুবা প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। অপিচ এই সকল স্থলে অন্যান্য ওঝাতে বাদ সাধিয়া থাকে, সুতরাং সেজন্য সাবধান হওয়া চাই।

নিজে যে স্থানে বসা যায়, তাহার চারিদিকে দাগ দিতে যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহাকেই গণ্ডী বলে।

গণ্ডী দিবার মন্ত্র,—"রাম কুণ্ডলী ব্রহ্মচাক। তেত্রিশ কোটি দেবদেবী অমুকে বেড়িয়া থাক, অমুকের অঙ্গের বাণ কাটম্ সন্ধান কাটম্ কুজ্ঞান কাটম্। কার বাণে কাটে রাজা রামচন্দ্রের বাণে কাটে। কার আজ্ঞা রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা। এই গণ্ডী অমুকের অঙ্গে শিঘ্‌গির লাগ্‌গে।"

নিম্নলিখিত মন্ত্রে চারিদিকে রেখা দিয়া রাখিলে, ভূতাদিতে কিম্বা কোন মন্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ওঝাতে "বাধ সাধিয়া" কিছুই করিতে পারে না।

মন্ত্র,—"ওঁ অইঙ্গ ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরী অবতর অবতর স্বাহা।"

"ওঁ দশাঙ্গুলি ভীন্দলি বিরুগুহারী ভৈরগু ভৈরবী বিদ্যারাণী রোলাবন্ধ মুষ্টিবন্ধ কৃত্যবন্ধ রুদ্রবন্ধ নৈখবন্ধ গ্রহবন্ধ প্রেতবন্ধ ভূতবন্ধ যক্ষবন্ধ কঙ্কাল-বন্ধ বেতালবন্ধ আকাশবন্ধ পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সর্ব্বদিশাবন্ধ—যে আর যে আছে কহ হুশ হুশ অবতর অবতর অবতর দশা বিপ্রোরাণী দশাঙ্গুলি শতায় ববিন্দান্দাসি হুঁ ফট্ স্বাহা।"

সামাল মন্ত্র,—"ওঁ কালরূপং ভৈরবং ভৈরবং হাকবলৈ বজ্রকা

কপাট তোড়না চলে সাবুক কর্ত্রী লোহেকী কমান তহাং বৈঠা কালীকা-পুত্র ভৈরবান্ চল চল ভৈরবং কালীমাতাকে আন ব্রহ্ম বাচা রুদ্র বাচা বিষ্ণু বাচা শিব বাচা ছোড়ি কুবাচা করেতো ধোবীকে কুণ্ডমে পরে বলি বেউন রূপ বীজে মেনাচী পুংলীসলো খণ্ডাবে কমানে সখলা খণ্ডী চেড়ীর লাউন মারণে জা অঙ্গা সমায়ণে তে অঙ্গপীড়া পাবে। ধূলি মন্ত্ৰন ভূতা বরিটাকনে সর্প পরম দুঃখিত হোয় জারি বেগীতা ব্রজাঙ্গ লতরী কীটো মন্ত্রাবী ভূমি চরি মারি জে ভূতা তেখোন বায়েন্তুণা ভূতা ধূলি টাকনে তৎকাল জায়।”

আত্মরক্ষা মন্ত্র,—“সিংহটহন্তা লাগে ব্রজকে বারবেরী মারে উবলা নিস্তারে সত্যা নরসিংহা আজ্ঞা। সতীথ ভেগ্নকত নরসিংহ বীর পটলন্ত কারণ লক্ষ্মী নরসিংহ বোলো পাজতে পীরকে করেতো পোন পীঠকো পরোজতে পীরকী রক্ষা শ্রীনরসিংহ করে গুরুকী শক্তি মেরী ভক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরবাচা।”

“ওঁ অমুকী মাতা অন্তনী মাতা বাপো পিতা জাউ দ্রোণাগিরি পর্ব্বত হত থুন আনুন গিরিশিলাতো দেই বৈরা হাতি বৈরা লাগি বিগ্নপাটী মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরীবাচা।”

এই সকল মন্ত্রে আত্মরক্ষাদি করিয়া আবিষ্ট ব্যক্তির চক্ষুতে তৈল পড়িয়া দিবে।

তৈল পড়ার মন্ত্র,—“ওঁ নমো দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা। মেধাং দক্ষিণামূর্ত্তিঃ॥ ওঁ আদেশ গুরুকোং পশ্চিম দেশসো জকাকুবতী হাটী ভীহুর্ব্বা প্রগাস ছায়ছ স্বাহা। মেধাং দক্ষিণামূর্ত্তিঃ। পুনঃ ওঁ আদেশ গুরুকোং পশ্চিমে দেশসো জকাকুবতী হাটী ভীহুর্ব্বা প্রগাস ছায়ছ স্বাহা। পছা মেরা মণ্ডলেকা বিলাস মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর উবাচ।”

অনন্তর রোগীর চক্ষুর দৃষ্টির উপরে আপন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যত দীর্ঘ সময় রাখিতে পার, তাহা রাখিবে। তদনন্তর ব্যাপক-ন্যাস প্রদান করিবে।

ব্যাপক-ন্যাস,—"ওঁ সর্ব্বযোগীশ্বরী হুঁ ফট্ স্বাহা।" এই মন্ত্র একবার পাঠ করিবে এবং নিজের দুই হস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া রোগীর মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত শরীরে অত্যন্ত ঘেঁসিয়া ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া লইবে। এইরূপে সাতবার করিতে হয়। এইরূপ করিলে রোগী স্থির হইবে। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কে তুমি? কেন ইহাকে পাইয়াছ? ইত্যাদি যাহা কিছু জিজ্ঞাসার প্রয়োজন।

সহজে উত্তর না দিলে, বাণমন্ত্র প্রয়োগ করিবে। বাণমন্ত্র সহ্য করা দুঃসহ, তখন আবিষ্টভূত আপনিই সমস্ত বলিবে।

বাণমন্ত্র,—"ওঁ নমো আদেশ গুরুকোঁ কালভৈরব কপিল-জটা হাথটীক রাখে লে চৌহট্টা হাড়কী ধনু ঈনপলোকে বাণ ডিসকোং নয়া-রেতো ঈশ্বরী পার্ব্বতীকী আন মহাদেব লাগে দেখো ভেরী শক্তি ফুরো মন্ত্র স্বাহা।" যদি ইহাতে কোন দুষ্টাত্মা রোগীকে ছাড়িয়া না যায় বা জিজ্ঞাস্য বিষয়ে উত্তর না দেয়, তবে সরিষা বাণ মারিবে।

সরিষা-বাণ,—"ওঁ আঘারে আঘারেশ্বরী ঘোরমুখা চামুণ্ডে ঊর্দ্ধ-কেশী হ্রীং স্ফীং ফট্ হুঁ স্বাহা।"—এই মন্ত্র চল্লিশবার জপ করিয়া এক মুঠা সরিষা লইয়া পাঠ করিবে,—"ওঁ ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হুঁ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ স্বাহা॥"

রোগীর গাত্রে ঐ সরিষা ছিটাইয়া দিবে।—ইহাতে রোগীর গাত্রেও সর্ষপাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা হইতে পারে।

অনন্তর জলপূর্ণ ঘড়া দাঁতে করিয়া তুলিতে বা নিশ্বাস বায়ুতে বৃক্ষের

ডাল ভাঙ্গিয়া যাইতে ভূতকে আদেশ করিবে। যদি সে স্বীকৃত না হয়, পুনরায় সরিষা বাণ মারিতে উদ্যত হইবে বা মারিবে; তাহা হইলেই অনুজ্ঞামত কার্য্য করিবে।

ভূত ছাড়িয়া গেলে, রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে নিম্ন লিখিত মন্ত্রে পড়া তৈল মাখাইয়া জলসার করিবে।

তৈলপড়া,—"তেলেনীর তেল পশার চৌরাশি সহস্র ডাকিনীর ছেলে, এতেলের ভার মুই তেল পড়িয়া দেম, অমুকার অঙ্গে অমুকার ভার আড়দন শূলে যক্ষা যক্ষিণী দৈত্যা দৈত্যানি ভূতা ভূতি প্রেতা প্রেতী দানা দানবী নিশাচৌরা কুচিমুখা গাভূরডলনম বার ভাইয় লাড়ি ভোগাই যামি পিশাচী অমুকের অঙ্গে যা, কালজটার মাথা খা হ্রীঁ স্বাহা সিদ্ধি গুরুর চরণ রাড়ির কালীকার আজ্ঞা।"

এই মন্ত্রে খাঁটি সরিষার তৈল পড়িয়া রোগীকে মাখিতে দিবে। এ তৈল ভূত ছাড়ার দশ বার দিন পর পর্য্যন্তও মাখিতে দিবে। কেন না যদি কোনরূপ দৃষ্টি থাকে, কাটিয়া যাইবে।

জলসার,—একটা নূতন হাঁড়ি লইয়া ঘাট দিয়া নামিয়া আঘাটের জল লইয়া আঘাট দিয়া উঠিবে। অনন্তর ঐ জল কোথাও না নামাইয়া একেবারে লইয়া আসিবে। ঐ জলে দশগাছ দূর্ব্বা রাখিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে,—"ওঁ আদেশ গুরুকোঁ ওঁ কালী কালী মহাকালী ব্রহ্মাকী চেটী ইন্দ্রকী শালী গলে মুণ্ডমালী মদ্য মাংস সতরালী কালী মৃগাক্ষানা ভূরি ভূরী পিণরকী ডালী বৈঠিক যাবে বারে হাথ কালানী শংখিনী ডাকিনীকো ভধতা দুরাচারীকো ভফনব পাখণ্ডীকো ভফনা যতী সতীকো রখনা কালী মহাকালী শিরজটা মুখ বিকরালী ফুরো মন্ত্র ফট্ স্বাহা।"

পেঁচোয় পাওয়া ছেলের চিকিৎসা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নৃসিংহকবচ, রক্ষা-কবচ, যাবনিক রক্ষা-তাবিজ এ সকল সকল বয়সের সকল প্রকার

ভূতাবিষ্ট রোগীকেই ধারণ করাইলে রোগ শান্তি হইয়া থাকে। অধিকন্তু সুস্থদেহিগণ এই তাবিজ ও কবচ ধারণ করিলে তাহাদিগের প্রতি ভূতাবেশ হইতে পারে না।

যাবনিক রক্ষা-তাবিজ,—"বিষ্‌মোল্লা হর্‌ রহিমান্‌ রহিম্‌ অঘুপরো লমীনম্‌ সদীম্‌, বিষমোল্লা হর্‌ রহিমান্‌ রহিম্‌ সুলতান্‌ সপদ অহংমদ, কঙ্কণ খিস্তা খৈগে পাকোহু হিলেহি জোরকা অজু জুসা দিল্লীকা পচারাগ ঠগা জনহীকা খীম ভূত নাম বাদা মহংমদা বীর তো আব্‌সেলে তোর কাণীক পূত লটাফকীর কাঁউরুকা জৈসে বমেকী তিজারি মরতজীয় তুরন্ত আলেদৈ জে সীটক করণে ভাবীকো বাংধে অষ্টকো বান্ধে ভাবীকো বান্ধে রনারী সনারীণকে। বান্ধে বীরানেখেত পরকো বান্ধে চলী চলা-ঈকো বান্ধে আপথরীকো নদী নারীকো বান্ধে ছিনীছিনা উজুকী বান্ধে ষোলী দ্রলমরাইলীকো বান্ধে হরা বান্ধে ডহর বান্ধে রক্তাপত্তিকোং বান্ধে ভবরপিত্তিকোং বান্ধে বান্ধে পহিবাদ কুছারীকো লে বান্ধে সোহামেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি মেরী ভক্তি বাচা ব্রহ্ম বাচা চুকেউ ভাসুকেক মনা-রেকী যাবী বিষমোল্লা হর্‌ রহিমান্‌ রহিম্‌ অঘু ঘুমকে লমীনম্‌ সদীম্‌॥"

নৃসিংহকবচাদির বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ স্বর্ণ বা তাম্র দ্বারা মাদুলি প্রস্তুত করিয়া কবচমন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া তন্মধ্যে পূরিয়া ধারণ করিতে হয়।
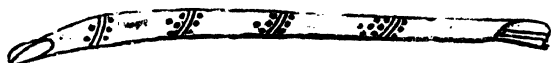
এই ভৌতিকদণ্ড অনেক প্রকার বস্তুর দ্বারা এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। চুম্বক পাথর, লৌহ, ইস্পাত, মানুষের পায়ের অস্থি, বন্যপশুর অস্থি, এই সকল সংগ্রহ করিবে। যষ্টির অগ্রভাগে

চুম্বক পাথর থাকিবে, তৎপরে মানুষের পায়ের হাড়, তারপর ইস্পাত, আবার নরাস্থি,—তৎপরে লৌহ, তৎপরে বন্য পশুর হাড়, তৎপরে খাঁজে খাঁজে ইস্পাতের অনতিপ্রসর পাত দিয়া বাঁধা এবং সেই পাতের পার্শ্বে চিত্রের লিখিতমত চিহ্ন সকল থাকিবে। ইহা আরও অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই দণ্ড ভূতনামান ভূতছাড়ান প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজন। এই দণ্ডদ্বারা ভূতগণ নিতান্ত শাসিত থাকে; জানি না, ইহার কোন্ আধ্যাত্মিক শক্তি আছে;—যাহাতে জড়াতীত সূক্ষ্মাত্মা এই জড়ের ভয় করিয়া থাকে। জানি না, কিন্তু এই দণ্ডের অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্রিয়া পরিজ্ঞাত আছি। পেঁচোয় পাওয়া ছেলেকে এই দণ্ড ধরিয়া উঠিতে বলিলে উঠে এবং কথা কহে। কথা কহে, অন্য প্রকারে অর্থাৎ ভূতেই কথা কহিয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—ঃ*ঃ—

ভূত আনয়ন।

গুরু। আমি পূর্ব্বে তোমাকে ভূত আনয়নের সকল প্রকার কৌশলের কথাই বলিয়াছি। ইংরাজী মতে যে প্রকারে ভূত আনয়ন করিতে পারা যায়, তাহাও এস্থলে বলিতেছি। এক ও দুই নম্বরের যে প্রকার দুইখানি চক্রের আদর্শ অঙ্কিত করা হইয়াছে, ঐরূপ ভাবে দুইটি চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার এক নম্বরে যাহার উপরে ভূতাবেশ করাইবার ইচ্ছা করিবে, তাহাকে উপবেশন করাইবে এবং দুই নম্বর অঙ্কিত চক্রে নিজে উপবেশন করিবে। অতঃপর পূর্ব্বে যে ভৌতিক দণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, সেই দণ্ড দক্ষিণ হস্তে করিয়া এবং বাম হস্তে পার্শ্বে অঙ্কিত ছুরিকার অনুরূপ একখানি ছুরি প্রস্তুত করিয়া লইয়া দাঁড়াইবে।

এই ছুরির বাঁট মহিষ বা গাধার হাড়ে প্রস্তুত হইবে, এবং ছুরিখানি সম্পূর্ণ ইস্পাতে প্রস্তুত হইবে। যে কয়টী অক্ষর উহাতে লেখা আছে, তাহাও লিখিত থাকিবে। ঐ শব্দের কোন অর্থই বোধগম্য নহে, কিন্তু এ সকল শব্দের বা মন্ত্রাদির সমস্ত অর্থ বুঝিবার আমাদের উপায় নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে এ সকল আবিষ্কার করেন, তাঁহারাই ক্রিয়ানুযায়ী ঐ সকল শব্দ বিনস্ত করিয়াছেন। সুতরাং
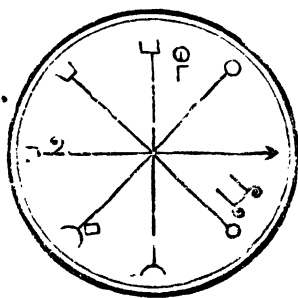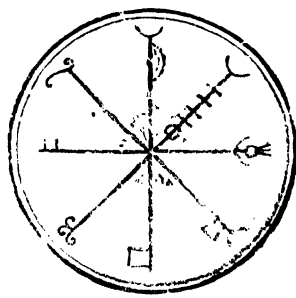
অর্থের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য নহে। অতঃপর ইংরাজী ভাষায় নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

মন্ত্র,—I, who am the servant of the Highest, do by the virtue of his Holy Name, Immanuel, sanctify unto myself the circumference of nine feet round about me + + + from the east, glonrob from the west, garron from the north, Cabon from the south, Berith which ground I take for my proper defence from all malignant spirits, that they may have no power over my soul or body, nor come beyond these limitations, but answer truly being summoned without daring to transgress their bounds worron, worrah, harcat gambalan. + +

এই মন্ত্রে চক্র শুদ্ধ হইয়া থাকে। তৎপরে নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিয়া, একাগ্রচিত্ত হইয়া এবং চরিত্র চিন্তন পূর্ব্বক ভূতকে আহ্বান করিবে।

মন্ত্র,—By the virtue of the holy resurrection and the torments of the damned, I conjure and exercise the spirit of N. deceased, to answer my life demands being obedient unto these secret ceremonies on pain of ever-lasting torment and distress, then let him say. Berald Beroald. Balbin gab gabor agaba, arise, arise I charge and command thee.

ভূতের আবির্ভাব হইবার সময়ে নানারূপ বিভীষিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্প, ব্যাঘ্র, দৈত্য প্রভৃতি রূপও প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বেই সম্মুখে হোম-কুণ্ডের ন্যায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ বিভীষিকা দৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিলেই ঐ অগ্নিতে মত্য, ধূপ ও রক্তবর্ণ পুষ্প প্রক্ষেপ করিবে। ইহাতে ভূতগণ শান্ত হইয়া অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করিয়া থাকে।

নিম্নে যে কয়খানি কবচের চিত্র অঙ্কিত হইল ইহা দস্তা, রৌপ্য, তাম্র বা স্বর্ণের দ্বারা নিম্নলিখিত অক্ষরাদি সংযুক্ত আকারেই প্রস্তুত করিতে হয়। প্রাচীন ইংরেজগণ এইরূপ কবচ গলায় ধারণ করিতেন। ইহাতে কোন প্রকার ভৌতিক আবেশ হইতে পারে না এবং হইলেও এই কবচের বলে শরীর হইতে দূরে পলায়ন করে।
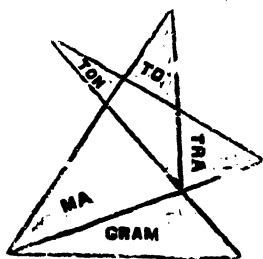
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে একটী অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-সভা আছে। অত্রস্ত প্রধান প্রধান অনেকগুলি বড়লোক উহার সভ্য। এই সভায় প্রেতাত্মার আনয়ন ও তদ্দারা পারলৌকিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ ও পর-জগতের অবস্থাদি জ্ঞাত হওয়া যাইত। এই সভায় সানসন নামক একজন গণনীয় সভ্য ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে উক্ত সভার সভা-পতিকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরই যেন, তাঁহার আত্মাকে আহ্বান করা হয়। তিনি পরলোকের সংবাদ প্রদান করিবেন।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ এপ্রেল তারিখে উক্ত সভ্যের মৃত্যু ঘটে এবং ঐ সভার সভ্যগণ ঐ মৃত ব্যক্তির গৃহেই এক চক্র করিয়া সানসনের আত্মাকে আহ্বান করেন। তিনি চক্রে আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রকার,—

"সংসারের অবসাদ কষ্ট মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। আমি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছি, সংসার ত্যাগ করিয়া আসা অবধি আর আমাকে সেই মাংসের বোঝা বহিতে হইতেছে না। আমি এখন নূতন দেহ (সূক্ষ্মদেহ) লাভ করিয়াছি। এ বড় আনন্দ। পৃথিবীর দুঃখ সকল ধৈর্য্যের সহিত ভোগ করিয়া, সত্যপথ অবলম্বন করিলে, অসীম সুখ-সম্ভোগ করা যায়। যদি প্রকৃত সুখ চাও, তবে সকলকে সুখী কর।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

মন্ত্র-চৈতন্য।

গুরু। শব্দ-ব্রহ্ম! অনেক অবোধ্য কথার মত, এ কথাটা লইয়াও আমরা আপন আপন বিদ্যা-বুদ্ধির সনন্দপত্রের মত, পাণ্ডিত্যের মজলিসের বড় আস্ফালন করিয়া থাকি। তাহার পর বিদেশীয় ব্রহ্মবিদ্যা হইতে ইহার দুই একটি কনিষ্ঠ সহোদরের সন্ধান করিতে পারিলে, সকলের সন্দেহ, সভাস্থ জিগীষাটা আমাদের পাণ্ডিত্যের সেই বলিষ্ঠ পারিবারিক সংযোগ দেখিয়া একেবারে নীরব, বর্জ্জিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম কি তাহা বুঝি, আর নাই বুঝি, তবু শব্দ-ব্রহ্ম, এ কথা বলিবার প্রতিবন্ধক কি হইতে পারে! না বুঝিয়া কাজ করিলেও ভাল ফল আকাঙ্ক্ষা করা যায়। শিবরাত্রি ব্রতোপাখ্যানে, না-বুঝার ধর্ম্মে ব্যাধের সদ্গতি হইয়াছিল। "শব্দ-ব্রহ্ম" কথাটার ব্যবহারও অনেকের পক্ষে একরূপ অবোধ্যতার শিবরাত্রি।

ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় এখানে আলোচ্য না হইলেও তোমার শুনিয়া রাখিতে ক্ষতি নাই যে, "ব্রহ্ম" বলিলেই ধাত্বর্থসূত্রে আমাদিগকে একটি অনন্তব্যাপী সত্তা বুঝিতে হয়। শব্দ অর্থাৎ অর্থযুক্ত স্বর বিশ্বব্যাপী কি না তাহা জানিবার উপায় না থাকিলেও ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, জগতে যেখানে গতি আছে, সেখানে ঝঙ্কার আছে। যেখানে ঝঙ্কার

আছে, সেইখানেই স্বর বা শব্দ উৎপন্ন হয়। মনুষ্য-কর্ণে সে স্বর, সে ঝঙ্কার সকল সময়ে পরিস্ফুট না হইতে পারে, তাহা বলিয়া, তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। মীমাংসা সূত্রের টীকার ন্যায় দর্শনোদ্ধৃত যে পরাপর ভেদে তিন প্রকার শব্দের কথা পড়িয়াছ, তাহা এই সার্ব্বভৌম স্বর বা ঝঙ্কারের ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থা মাত্র। তুমি অবশ্য বলিতে পার জগতে কোন পদার্থ ই নিরর্থক জন্মে না। আর কিছুই হউক বা না হউক ভগবানের মত পাকা মহাজন বিশ্বসংসারের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার আড়তে কোন দ্রব্যেরই বস্তা পচা হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এতটা স্বর, এতটা শক্তি যে দিবারাত্রি ব্যয়িত হইতেছে, ইহা কি সম্ভব?

নিরর্থক ব্যয়ের কথা তোমায় কে বলিয়াছে? বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, ঋষিদিগের মতে প্রণব বা ওঁকারের শক্তিসাফল্যে এ বিশ্ববিকাশের সূতিকাগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ বিশ্বের যখন গঠন ও নামকরণ হয় নাই তখন ওঁকার ছিল। ওঁ হইতে ব্যোম হইয়াছে, ব্যোম হইতে জগৎ।

এখন কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, ঋষিরা ওঁ বলিলে কি বুঝিতেন। কোন একটি সূক্ষ্ম ধাতুফলক বা শূন্যোত্থিত ধাতুদ্রব্যে আঘাত করিলে, অ-উ ম্-ওঁ রূপ একপ্রকার ঝাঙ্কারিক স্বর উত্থিত হয়। সে শব্দ বা স্বর ঘাত প্রতিঘাত জন্য। তাহার পর বুঝিয়া দেখ, ঋষিরা বলিয়াছেন, এ বিশ্ববিকাশ ঘাতপ্রতিঘাত জন্য—পরমাণুপুঞ্জের উপসর্পণ অপসর্পণীতে ইহার নাড়ীচ্ছেদ হইয়াছে। সুতরাং—অউ—ম্ বা ঘাতপ্রতিঘাতিক তত্ত্বের সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা অব্যয়াত্মক ওঁ যে সর্ব্বশক্তির বীজ স্বরূপ, সকল স্ফুরণসঞ্চরণের আদিপুরুষকে গৃহীত হইবে, তাহা বোধ হয়, এখন বুঝিতে তোমার কষ্ট হইবে না। কিম্বদন্তী আছে, জলপূর্ণ কটাহে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া,

তাহাতে দণ্ড-তাড়নার সাহায্যে বৈশেষিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদ, পরমাণুসূত্র (Atomic Theory) আবিষ্কার করিয়াছেন। ওঁকারোপলক্ষিত তথ্যও হয় প্রথমে এইরূপভাবে আর্য্যচৈতন্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে, তাহার পর ধ্যান-ধারণার সাহায্যে, তাহা সম্যক্ বা সর্ব্বাংশে পরিস্ফুট হইয়াছে।

সে যাহাই হউক, আমাদের মত ওঁকার বিশ্ববিকাশের মূলস্বরূপ। অর্থযুক্তভাষা লইয়া, শুদ্ধ চৈতন্য (ব্রহ্ম) বিকার বা বিকাশের (Phenomena) আবর্ত্তে ঘুরিয়া ছুটিতেছেন। বিশুদ্ধ নিত্য অবিকৃত সত্তার অনিত্য, বিকৃত, অধ্যারোপ অবস্থার সংক্রমণ-স্থলে, আমরা বিস্ফুরণ-বিকম্পন পূর্ণ প্রণব-ঝঙ্কারকে দেখিতে পাই। ব্রহ্মের জীবত্বরূপে বিকাশের পথ এই ঝঙ্কারিত ওঁকারের ভিতর দিয়া। ঝঙ্কার তাই প্রজাপতির সৃষ্টিকার্য্যের রহস্য মন্ত্র; এই ঝঙ্কার তাই সরস্বতী বা পূর্ণ জ্ঞানের আনন্দ বল্লভীমূর্চ্ছনা।

এক্ষণে তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়া থাকিবে, ওঁকার বা ভাষা বা আত্মব্যক্তির বীজ এ বিশ্ববিকাশের মূলে অন্তর্হিত ছিল বলিয়া, মনুষ্যের মত বা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব এজগতে জন্মাইতে পারিয়াছে। জড় হইতে আত্মজ্ঞ মনুষ্য জাতি পর্য্যন্ত এক একটি অবস্থান্তরের কথা ভাবিয়া দেখ,—জড়, উদ্ভিদ, জীবাণু, অমেরুদণ্ডী, মেরুদণ্ডী প্রভৃতি এক একটি জৈবিক অবস্থা-শৃঙ্খলের বিষয় বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে, সকল অবস্থাতেই ভাষা আছে। জড়কে জৈবিক অবস্থা বলিয়াছি বলিয়া তোমার একটু মর্ম্মজ্বালা হইয়াছে, এখন তুমি বিশ্বাস করিয়া যাও, জগতে জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তোমার টম্‌সন্ ম্যাক্সওয়েলের মতেও পরমাণুকে জড় বলা যায় না। তোমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সূত্রমত ব্যাখ্যা করিতে হইলেও অণুকে ব্যাপ্তির মাঝে চৈতন্যসত্তার প্রক্ষিপ্ত ব্যষ্টি অংশ

(Projection of units of consciousness in space) ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। প্রয়োজন হইলে, এ বিষয় সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

সে যাহা হউক, নদীর কল্লোল, মেঘের গর্জ্জন প্রভৃতিকে জৈবিক ভাবার ন্যায় ভাবা না বলিতে পারা যাইলেও তাহাতে যে তাহাদের আপন আপন অস্তিত্বের মৌলিক অর্থ পূর্ণরূপে সংসাধিত হয়, তাহার কোন ভুল নাই। মেঘের উদ্দেশ্য যদি জলবর্ষণ হয়, তাহা হইলে গর্জ্জন সে বিষয়ে পূর্ণ সহায়ক বটে। তুমি বলিলে, মেঘের গর্জ্জন বা সাগরের কল্লোল ঘাত-প্রতিঘাত জন্য। ভাবিয়া দেখিলে, মানুষের ভাষাও তাই। বাহ্যিক বা মানসিক কোন বিষয়ের সাক্ষাৎ না পাইলে তোমার আমারও কোন কথা ভাবিবার অবসর হয় না। সুতরাং দেখিতে পাইলে যেখানে প্রতিভাসিক বিকাশ (Phenomena) আছে, সেইখানেই অর্থ আছে। * শব্দার্থের নিত্য সম্বন্ধটা এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি ?

তবে দেখিতে পাইলে, আপন আপন অস্তিত্বের পূর্ণোদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই শব্দ বা ভাষার সৃষ্টি। সকল শব্দের বীজ স্বরূপ আদিম ওঁকার ঝঙ্কারপূর্ণ বলিয়া, কতকগুলি ব্যোমিক ঝঙ্কারপুঞ্জ, শব্দমাত্রেরই সাহচর্য্য করিয়া থাকে। ওঁ হইতে ব্যোম হইয়াছে অর্থে, যে চিৎশক্তি আপনার অভিব্যক্তির জন্য বিশ্ববিকাশের অন্তর্নিহিত, সেই শক্তি হইতেই সেই বিশ্ববিকাশের প্রাথমিক উপাদান বা ব্যোম উৎপন্ন হইয়াছে। ব্যোম না থাকিলে শব্দশক্তির ন্যায় অন্য অনেক শক্তিসঞ্চার জগতে হইতে পারিত না।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, ব্যোম বলিলে, কি পদার্থকে বুঝিতে হইবে। ব্যোম অর্থে একরূপ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, যাহা জগতে সর্ব্বত্র

* শব্দার্থয়োর্নিত্যং—মীমাংসাসূত্রম্।

পরিব্যাপ্ত। সকল পদার্থের ভিতর ব্যোম আছে। ব্যোম না থাকিলে আলোকস্ফুরণাদি কিছুই হইতে পারিত না। সুদূর গ্রহ উপগ্রহের পরস্পরের আকর্ষণ বা তাপরশ্মির আদান প্রদান, ব্যোমের সাহায্যেই সংসাধিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বব্যাপী, জগতে সকল সম্মিলনের অনিবার্য্য বিবাহ-বাসর। ঝঙ্কারিত, বিস্ফুরিত, বিকম্পিত ব্যোম—ভগবানের আনন্দ-শীৎকার। এই শীৎকার সাহায্যে একই জাতীয় পরমাণু হইতে অসংখ্য ভিন্ন জাতীয় পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে। তুমি বিজ্ঞানের উপাসক। আমার মুখ হইতে এ সকল কথা শুনিলে, হয় ত তোমার বিশ্বাস না হইতে পারে। তোমার ইউরোপীয় বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহা পর্য্যালোচনা না করিয়া আমি এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি না।

গ্রীক বা যবনাচার্য্যেরা এ বিষয়ে অনেকটা আমাদিগের অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে অতি প্রাচীন কালের কথা। তাহার পর প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীসে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে ডেকার্ট প্রথমে নির্দ্দেশ করেন যে, ব্যাপ্তিই জড় পদার্থের একমাত্র গুণ। ব্যাপ্তির (Extension) নিগূঢ় ধর্ম্মেই জড়ের অস্তিত্ব। সুতরাং দূরস্থ গ্রহ উপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী ব্যাপ্তি বা অবকাশ স্থানকে নিশ্চয়ই ঐরূপ কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড় পদার্থে পূর্ণ থাকিতে হইবে। যাহা কিছুই নহে, তাহার ব্যাপ্তি হইতে পারে না। ব্যাপ্তি বলিলেই আমাদিগকে কোন পদার্থের ব্যাপ্তি বুঝিতে হয়। *

* Extension can not be extension of nothing space is substance. The whole universe is full of matter and of one kind.... Descartes.

আলোক স্ফুরণতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া, হিন্‌জিন্‌সকে (Hinggins) প্রথমে ইথর বা ব্যোমতত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আলোক যে জড় পদার্থ নহে, কেবল ইথর বা ব্যোমতত্ত্বের ঝঙ্কার বা বিকম্পনের প্রসব একথা তিনি সর্ব্বপ্রথমে জগতে প্রতিপন্ন করেন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক-গণের মতে, ব্যোমের অবাধে শক্তি-সঞ্চালন-শক্তি, স্বকীয় মৌলিক ধর্ম্ম-ঘনত্ব প্রভৃতি অনেক গুণ আছে। ইথর বা আন্তর্নাক্ষত্রিক পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক সঞ্চার হয়, তাহা কাচ, স্ফটিক বা অন্যান্য স্বচ্ছ পদার্থ হইতে ভিন্নধর্ম্মশীল।

ব্যোমতত্ত্বের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য আচার্য্যেরা ঐক্য-মতে বলেন, অন্যান্য জড় পদার্থের ন্যায় সূক্ষ্ম ব্যোম অন্তর্বিচ্ছিন্ন বা পরমাণুপুঞ্জ সম্বন্ধ (Molecular) নহে, তাহা অবচ্ছেদহীন। এক ব্যাপ্তি সংযুক্ত (Continuous) ব্যোমতত্ত্বকে ঘটপটাদির ন্যায় ভাগ বা বিচ্ছেদ করা যায় না, তাহা অসংযুক্ত অনন্তবিস্তীর্ণ। ফ্যারাডে স্থির করিয়াছেন, চৌম্বকিক আকর্ষণ-বিশ্লেষণও ব্যোমতত্ত্বের আর একটি অধিকন্তু গুণ—ইথর বা ব্যোম বলিয়া কোন পদার্থ থাকিলে, আলোকস্ফুরণ ও তাপ বিকীরণ ভিন্ন, অন্যান্য অনেক অজ্ঞাত উদ্দেশ্য বা কার্য্য তাহার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। * একরূপ উপাদানাত্মক (Homogeneous) অবিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিশীল (Continuous) ব্যোমকে গতি (Motion) বা কম্পনের তারতম্যের দ্বারা বহু বা ভিন্নোপাদানাত্মক (Heterogeneous) করা যাইতে পারে। স্যার উইলিয়ম্ টমসন্ তাঁহার কৃত (Vortex) পরমাণুপুঞ্জের সূত্রে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। †

---

* Faraday's Experimental Researches—3074.

† A medium however homogeneous and continuous may be rendered heterogeneous by its motion as in Sir William Thomson's Hypothesis of Vortex in a perfect liquid.

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, জগতে যদি এক জাতীয় ভিন্ন দ্বিতীয় জাতীয় মৌলিক তত্ত্ব বা জড় সত্ত্বা নাই, তবে এত বিভিন্ন শ্রেণীর জড় বা জীবদেহ আসিল কোথা হইতে? বোধ হয় রাসায়নিক তত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের কথা তুমি শুনিয়া থাকিবে। বোধ হয় শুনিয়াছ, রেডিয়ম হইতে হিলিয়ম পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ আবিষ্কৃত হওয়ার পর, রাসায়নিক জগতে একটা খুব বিপ্লব পড়িয়া গিয়াছে। এখন আর বহু প্রকার ভৌতিক উপাদানের (Element) অস্তিত্বে বিশ্বাস করার বহু প্রতিবন্ধক হইতেছে। এক মৌলিক পদার্থ হইলে, বিভিন্ন প্রকারের জীবশরীর যে কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে, সে বিষয়ে শ্রদ্ধেয় আচার্য্য গেলনের মত আমি তোমায় শুনাইতেছি। কোন বিশিষ্ট সময়ে আণবিক কম্পন বা ব্যোমাত্মিক ঝঙ্কারের তারতম্যে একটি মৌলিক পদার্থ হইতে বিভিন্ন জাতীয় গঠন হইতে পারে। জৈবিক বীজকে শুদ্ধ জড়ধর্ম্মশীল বলিয়া বিবেচনা করার ন্যায় মূর্খতা কিছুই নাই। ‡

বোধ হয়, এখন আর তোমার বুঝিতে কষ্ট হইবে না।—"ওঁ হইতে ব্যোম্, ব্যোম্ হইতে জগৎ।" বোধ হয়, এখন তুমি অবাধে বিশ্বাস করিতে পার যে ব্যোমের বিকার ঘটাইতে পারিলে, জগতে ইচ্ছামত সকল পদার্থকেই বিকৃত করিতে পারা যায়। তাহার পর, আলোক বিকীরণ, শব্দ সঞ্চালন ভিন্ন ব্যোমতত্ত্বের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে এই সূক্ষ্মভূতের সাহায্যে উন্নত দেবাত্মিক জীবের শরীরাবয়ব সংগঠিত হয় কি না। কে বলিতে পারে, এই ঝঙ্কার কম্পনের সাহায্যে, তুমি আমি পরস্পরের ভাগ্য-

‡ No one material system can differ from another only in configuration and motion at a given instant......The properties of a germ are not those of a purely material system (F. Galon On Blood Relationship.)

বিধাতৃত্ব করিতে পারি কি না! এই বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম-সাগর পার হইয়া কোন দেবতার জাহাজ, মর্ত্ত্যের উপকূলে অক্ষয় বাণিজ্য করিতে আইসে কি না! কে বলিতে পারে, এই সাগরের ঊর্দ্ধ স্তরে উঠিতে পারিলেই, দেবকন্যাগণের শয়ন-কক্ষের মঙ্গল-দীপরশ্মি দেখিতে পাওয়া যায় না বা বিশ্বপতির অনন্ত মন্দিরের আরতির শঙ্খ কর্ণে প্রবেশ করে না। *

এক্ষণে দেখা গেল যে, স্ববিজ্ঞান ও ভাষা বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই একত্রিত। ভাষা না হইলে ভাবনা হইতে পারে না। ভাবনা করিতে হইলে ভাষার প্রয়োজন। জীবন থাকিলে ভাবিতেই হইবে। ভাবনার বিনিময় না হইলে, জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে। আবার ভাষা না হইলে, ভাবনা অসম্ভব। সুতরাং ভাষা ও জীবন একই সত্তার দুইটি বিভিন্ন প্রান্তভাগ। জীব-চৈতন্য, ব্রহ্ম চৈতন্যাধিষ্ঠিত হইলে, জৈবিকভাষাও ব্রহ্মাত্মিক। শব্দ তাই ব্রহ্ম।

এখন দেখা যাউক, বিশিষ্ট শব্দ বা বীজমন্ত্র জপ বা আবৃত্তি করিলে, কি করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বে উপস্থিত হওয়া যায়। দৈনন্দিন ভাষায় ভগবানের নাম করিয়া, ক্রোঁ বা ক্লীঁ প্রভৃতি অর্থহীন অনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণের প্রয়োজন কি! কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব, এই মন্ত্র জপ করিলে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় বা মানুষে বাহ্যিক জড়তত্ত্বের উপর অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে।

---

* Whether the vast homogeneous expanse of isotropic matter is fitted not only to be a medium of physical interaction between distant bodies, and to fulfil other physical functions of which perhaps we have as yet do conception, but also as the author of unseen Universe seems to suggest, to contribute the material organisms of being exercising functions of life and mind as high, or higher than ours, at present is a question for transcending the limits of Physical Speculation Ency, Brit Vol. VIII.

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে, তোমায় বুঝিতে হইবে, ক্রীঁ ক্লীঁ প্রভৃতি বীজমন্ত্রগুলির অর্থ কি এবং কেনই বা তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

তুমি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদিতে পড়িয়া থাকিবে, সকল শব্দই সাঙ্কেতিক, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির বাল্যকালে কতকগুলি পদার্থ বা ভাবের সঙ্কেত স্বরূপ কতকগুলি শব্দ-জাতীয় চৈতন্য উদয় হইয়া থাকে। তাই "গো" বলিলে একজাতীয় চৈতন্যে লোকের মনে, শৃঙ্গ পুচ্ছাদি-সম্পন্ন কোন একরূপ চতুষ্পদ জন্তুর কথা মনে আইসে। টেলিগ্রাফের মত ভাষা, কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত সঙ্কেত সমষ্টি হইলে, এক শব্দ প্রয়োগে একজাতীয় সকল লোকে. একই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত না। তাহার পর স্বর বা কোলাহলের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, শব্দের কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবে না। দশ সহস্র লোক সমবেত হইয়া "গো" শব্দ উচ্চারণ করিলে, স্বর বা কোলাহলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ শব্দগত অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। সুতরাং শব্দও নিত্য। আর একটু বুঝিলে বুঝিতে পারিবে চৈতন্য নিত্য বলিয়া ভাষা বা তাহার অভিব্যক্তির উপায়ও নিত্য। দেখিতে পাইতেছি, তুমি ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছ; ভাবিতেছ, আমি কোন ইউরোপীয় গ্রন্থের অনুবাদ করিতেছি। তুমি জান না, খ্রীষ্ট জন্মিবার বহুপূর্ব্বে, মহর্ষি জৈমিনি কর্ত্তৃক এ সকল তত্ত্বের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। মীমাংসাসূত্রের শবর স্বামী ও কুমারিল ভট্টের টীকায় এ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার বোধ হয়, শব্দের নিত্যত্ব সম্বন্ধে, আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না। শব্দ বলিলেই যে শব্দগত অর্থ ও তাহার বাহ্যিক অভিব্যক্তি বা স্বর বুঝায় তাহাও তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে

দেখিতে হইবে, ক্রীঁ হ্রীঁ প্রভৃতি সৃষ্টির প্রয়োজন কি? ইহারা কি কোন মৌলিক শব্দ, না পশ্চাৎকালীন উদ্ভাবিত সঙ্কেত।

সকল ভাষারই একদিন এমন অবস্থা ছিল, যখন কোন শব্দই একাক্ষর ভিন্ন দ্ব্যক্ষরসম্পন্ন ছিল না। এই অবস্থাকে আমরা ভাষায় ধাতুকাল বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। * ক্রমবিকাশসূত্রে নব বিকশিত মনুষ্যজাতি বনে-প্রান্তরে বাস করিত। গভীর রাত্রি, বনের ভিতর সহস্র ঝিল্লি, অসংখ্য পতঙ্গের রবে অরণ্য-বিভীষিকা দ্বিগুণ ভয়াবহ হইয়া উঠে। মাথার উপর অগণ্য নক্ষত্র যেন সেই একতান ঝিঁ—ঝিঁ—ঝিঁর তালে তালে চক্ষু মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে বলিতে থাকে, যে অন্ধকার অনন্তে আমরা ভাসিয়া বেড়াইতেছি, তাহারও বীজমন্ত্র ঐ আমায় অম্বিকা প্রতিমার ন্যায় অতলে অন্ধকার পূর্ণ অনন্তে, ঘুমন্ত ভরা ভীষণে মোহিনী জড়িত, ঐ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ-রে দার্শনিক তত্ত্বময়। দূরে অসংখ্য হিংস্র জন্তু গর্জ্জিয়া উঠিতেছে,—সে রবও প্রায় একাক্ষর বদ্ধ!—নৈশবায়ু বৃক্ষশাখাস্থ অন্ধকার ঝাড়া দেওয়া শোঁ শোঁ করিয়া বহিয়া যায়, বৈদিক বৈখানস সেই বাণপ্রস্থ গোষ্ঠপতি ভাবিলেন, যাহারা চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে; তাহারাও যেন ঐ সূর্য্য-চন্দ্রমসের মাতৃভূমি হইতে সেই শোঁ শোঁ শোঁর ভিতর, তাহাদের কি তারকিত পাবকিত ইতিহাস পাঠাইয়া দিতেছি।—বৈখানস দেখিলেন, রাত্রি দেবতা, অগণ্য তারকার মুণ্ডমালিনী বধূ মহাকালের অনন্ত অন্ধকার অভিসারে যাইতেছে, নূপুরে ঝিল্লিরব—মাঝে মাঝে যেন তাহা শুনিবার জন্য ঐ প্রান্তরে—ঐ ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বেলায়—ঐ পর্ব্বতের ছায়ায় কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৈখানস বুঝিলেন, যে মন্ত্রে রাত্রি অনন্তকে

* See Chapters on Root Period and Idola of Gluttology (Comparative Philology Syce)

আবাহন করেন সে মন্ত্র অনেকটা ঐ ঝিঁ ঝিঁর মত—ঐরূপ অনুনাসিকান্ত। ঋষি অনন্ত বিভীষিকার রহস্যতত্ত্ব কুড়াইয়া পাইলেন। জগতে আগে কাব্য, তাহার পর বিজ্ঞান,—আগে দর্শন, তাহার পর গণিত।

পূর্ণিমার রাত্রি, বনে বসন্ত আসিয়াছে, কোকিলের কুহু কুহু শান্ত নির্ঝরের কল কল, পাপীয়ার পীউ পীউ, ভ্রমরের গুঞ্জন, প্রস্ফুটিত কুসুমের ছড়াছড়ি। সৌন্দর্য্যের সেই রাসলীলার ভিতর ঋষি সেই রূপসী প্রকৃতির অনন্তরূপের উৎসের ভিতর আপনার আত্মা ডুবাইয়া দিলেন। বুঝিলেন, সে আনন্দ, সে রূপের অভিব্যক্তি, অনেকটা কুহুস্বরে, অনেকটা জল-কল্লোলে, অনেকটা ভ্রমর-গুঞ্জনের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাই কুহুর ক, কলকলের ল, পীউর ঈ, গুঞ্জনের অনুনাসিক অন্ত লইয়া (ক্লীঁ) একটা বীজ গঠিয়া লইলেন। ঋষি আবার জগতের সৌন্দর্য্য তত্ত্বাহ্লাদিনী শক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। ক্লীঁ তাহার অভিব্যক্তি। আজিও তেমন ডুবিতে পারিলে আমরাও এ সকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি। প্রকৃতির সহিত মানবের আর সে পৌর্ব্বতন-প্রীতি-ভালবাসা নাই। তুমি আমি আর প্রকৃতির অনাবৃত উৎসঙ্গে বসবাস করি না। ইট, কাঠ, ঘর দরজা দিয়া এ বিচ্ছেদ আমরা প্রত্যহই বাড়াইয়া তুলিতেছি। এই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেল. আজিও দেখিতে পাইবে, তোমায় আমায় ছাড়িয়া ভগবান্ তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে পারিবেন না। যাহা পূর্ণ চৈতন্য, তাহাকে নিরন্তর সজীব বা সচেতন বা স্বাভিব্যক্ত হইতে হইবে। যাহা নিত্য, বিকাশ তার অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য পারিণাম। শিব ছাড়া জীব নাই। শুধু তাহা নহে, জীব না হইলে শিবের শিবত্ব থাকিতে পারে না।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, সকল বীজমন্ত্রেরই কি এইরূপ জড়াত্মিক ভিত্তি আছে?—এবং দ্বিতীয়তঃ একদলের উদ্ভাবিত বীজই বা ঋষি

সাধারণে গৃহীত হইয়াছিল কেন? উত্তরে একথা বলিতে পারা যায়, সকল বীজের এরূপ সাক্ষাৎভাবে বাহ্য প্রকৃতি হইতে গৃহীত না হইলেও যে তত্ত্বে তাহারা প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্বব্যাপী বা বিশ্বের অন্তরাত্মা হইতে সংগৃহীত। কোন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বা ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া এক একটি বীজ সৃষ্ট না হইলেও, যে যে তত্ত্বে যে সকল বীজের ভিত্তিভূমি, তাহা বিশ্বাত্মার গতি, প্রকৃতি আনুসাঙ্গিক স্বর প্রভৃতির বিশেষ পরীক্ষা ও আলোচনার ফল। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে, ঋষিরা সত্যের সেবক ছিলেন। তোমার আমার মত মুড়ুলি-দলাদলি করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। সুতরাং যাহা সত্য, তাহা স্বীকার বা অবলম্বন করিতে সেকালে এখনকার মত বিভ্রাট উপস্থিত হইত না। তাহাদের সত্য পরীক্ষা করিয়া লইবার ক্ষমতা ছিল। একালের মত অক্ষমতায় কোলাহল, অকার্য্যে পাণ্ডিত্য, বদরিকা বা নৈমিষারণ্যের গভীর ছায়ার ভিতর দৃষ্টিহীন হইয়া বসিয়া পড়িত।

এক্ষণে দেখিতে পাইলে, কতকগুলি বিশ্বব্যাপী তত্ত্বের স্বতঃ বা স্বাভাবিক অভিব্যক্ত স্বর লইয়া, এই সকল বীজমন্ত্রগুলি গঠিত। আমরা দেখিয়াছি শব্দ নিত্য, শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য। সুতরাং বীজমন্ত্রও তাহার তত্ত্বগত অর্থসত্ত্বাও নিত্য। তাহার পর বীজমন্ত্রের হ্রস্ব, সংক্ষিপ্ত বা সন্ধীকৃত আকৃতির বিষয়ে, একথা বলা যাইতে পারে, শব্দ সঙ্কেতের সাহায্য না লইয়া, মানুষের ধ্যান-ধারণা-কার্য্য একেবারেই অসম্ভব। তাহার পর প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়া ভিন্ন যখন চিত্তের একাগ্রতা সাধন একেবারেই সুদূরপরাহত, তখন ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণার কালে এমন একটি শব্দ-সঙ্কেত আবশ্যক, যাহা ধ্যেয় অভীষ্ট তত্ত্ব লইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড হইবে; এবং তাহা যতদূর সংক্ষিপ্ত হইতে পারে, ততদূর তাহাকে হ্রস্বাকার করা কর্ত্তব্য। বীজমন্ত্রের এরূপ সম্পূর্ণত্ব না থাকিলে বা বীজ-

মন্ত্র আপেক্ষিক দীর্ঘাকৃতি হইলে, জপকালে চিত্তের আক্ষেপ হয়। দীর্ঘ মন্ত্র আপনার বহুস্বর-সম্বন্ধত্ব হেতু ভাবের আনুসঙ্গ সূত্রে (Association of Ideas) অনেক অপর কাহাকেও মনে জাগাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যাহা ভক্তি শ্রদ্ধার সামগ্রী, যাহা ধ্যান-ধারণার বিষয়, তাহাকে যতটা পুরাতন পরিচ্ছদ পরান যাইতে পারে, ততটা পুরাতন আবরণে ঢাকিয়া রাখা মনুষ্যপ্রকৃতির স্বধর্ম্ম। বনিয়াদীর মর্য্যাদাটা— যখন সকলের মনে আছে, তখন মন্ত্রে থাকিবে না কেন? সকল ভাষার ন্যায় সংস্কৃত ভাষারও (অন্ততঃ যাহা হইতে সে ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে) একদিন এমন অবস্থা ছিল, যখন একাক্ষর ভিন্ন দ্ব্যক্ষর সম্পন্ন করা ছিল না। তাহার পর জাতীয় চৈতন্যে যেমন নূতন নূতন জটিলতর ভাবের আবির্ভাব হয়, ভাষার গঠনগত জটিলতা সম্প্রসারণও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভাবে ভাষা গড়ে, সাধারণ ব্যক্তিগত প্রয়াসে তাহার পুষ্টি বা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় না। ব্যাস, বাদরায়ণ, সেক্সপিয়ার, নিউটন প্রভৃতি তাই এক এক জন ভাবের অবতারিত্বে, জাতীয় ব্যাকরণ অভিধানের যে পরিপুষ্টি হয়, শতাব্দির প্রয়াসে টম্, জোন্স বা রাম, যদু প্রভৃতি তাহার শতাংশের একাংশও সাধিত করিতে পারেন না। ভাষা উন্নতি কল্পে পরিষদ বা সমিতি প্রভৃতির উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি না। ভাষার উন্নতি অর্থে ভাবের উন্নতি। যে ভাষায় কোন একটি বিশিষ্ট ভাব সর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা গ্রাম্য বা আত্মীকৃত, যাবনিক বা বৈদেশিক শব্দ হইলেও সে স্থলে তাহা অপেক্ষা সুষ্ঠু শব্দ কিছুই হইতে পারে না। ভাষার উন্নতি প্রতিভার সহজ অধিকার বিস্তারত্ব বা শাস্ত্রী সম্প্রদায়ের তাহা অনধিকার-চর্চ্চা।

সুতরাং দেখিতে পাইলে, চিত্তের আক্ষেপ নিবারণ বা একাগ্রতা সাধন ও তাহার বনিয়াদিত্ব বা আভিজাত্যের বহুকালব্যাপী অবিচ্ছিন্ন

বংশগৌরব সম্পাদনের ইচ্ছায় বীজমন্ত্রগুলিকে হ্রস্বাকৃতি করা হইয়াছে। এরূপ প্রক্রিয়ার শিল্প বা গঠনগত নজীর বৈদিক প্রণব। হইতে পারে; তান্ত্রিক বীজগুলি এইরূপ ভাষার ধাতুকালের ধ্বংসাবশেষ অভ্রান্ত সত্য, সেগুলি বিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্বের স্বতঃ বা মৌলিক অভিব্যক্তি স্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাত্মা যে স্বরের তত্ত্ব পরিস্ফুট করেন, মহর্ষিরা যোগযুক্ত শ্রবণে সেই স্বর ধরিয়া রাখিয়া, বীজমন্ত্রের গঠন কার্য্য সমাধা করিয়াছেন।

তাহার প.., মানসিক অধ্যারোপ বা তত্ত্বন্যাস। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, একটি বীজ উদ্ধার করিতে হইলে, তাহার প্রত্যেক অক্ষরের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বা অর্থ প্রথমে মনে ভাবিয়া লইতে হয়। এইরূপ এক একটি বীজগত অক্ষর এক একটি অনন্ত ভাবতত্ত্বের সঙ্কেত স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহার পর, জাপকরে ইচ্ছাশক্তির সংযোগে অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই স্বর আপনার কল্পিত অর্থতত্ত্বকে উদ্বোধিত করিয়া তুলে। এ কথা শুনিয়া তুমি বলিতে পার, আমি না হয় রেফকে বহ্নি তত্ত্বের সঙ্কেত বলিয়া ধরিয়া লইলাম। না হয় রেফযুক্ত বীজমন্ত্র জপকালে এই কথাই ভাবিলাম যে, আমি বহ্নিতত্ত্বের ভাবনা করিতেছি। তাহাতে বাস্তবিক বহ্নিতত্ত্বের উদয় হইবে কি করিয়া? "র" বা "রেফের" এমন বহ্নি-জনন শক্তি থাকিলে. চক্‌মকি বা আরুণি কাষ্ঠের ব্যবহার থাকিত না। "র" বা "রেফ" বর্ণমালার ভিতর যে একটি প্রচ্ছন্ন দিয়াশ-লাইয়ের কারখানা, এতদিন আমার এ জ্ঞান ছিল না। বাহির দেখিয়া, ভিতর বুঝা বড় দুরূহ ব্যাপার।

এ কথা বুঝিতে হইলে, তোমার মনে রাখা আবশ্যক, বহ্নি ও বহ্নি-তত্ত্বে প্রভেদ আছে। প্রথমটি ফল, দ্বিতীয়টি কারণ। বহ্নিতত্ত্ব হইতে বহ্নি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ এমন কোন জিনিষ, যাহা জড়ক্ষেত্রে আগুন, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ক্রোধ। যাক্, সে কথা এখানে আলোচ্য

নহে। তবে একথা বলি, এক সত্ত্বের শুধু জড়াত্মিক বিকাশ লইয়াই মানুষের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। জগতে শুধু জড়সত্য ভিন্ন অন্য কোন সত্য নাই, এরূপ ভাবনাই ইংরাজি-বিকৃত যুবার ধ্বংস-বিপত্তির কারণ। ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যেও যাঁহারা বিশিষ্ট দার্শনিক, তাঁহারাও এইরূপভাবে সমাজের জড়প্রণবতা দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। তুমি বোধ হয়, জর্ম্মাণ শোফেনহরের লেখা পড়িয়া থাকিবে। *

যাক্—শব্দ বা স্বরের দ্বারা জড় বা মানসিকতত্ত্ব উদ্রেকের কথা শুনিয়া হাসিবার কোন কারণ নাই। তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, বেহালা বাজাইয়া অনেকে আসরে ঝাড়ের বাতি ইচ্ছাক্রমে জ্বালাইতে নিভাইতে পারেন। ডারুইন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সঙ্গীতের সাহায্যে গাছের আকারগত হ্রাস-বৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়। তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে—নিশারাত্রে এক একদিন মাঠের পরপারে বা নদীর অপর কূল হইতে এমন বাঁশীর স্বর আইসে, সে সঙ্গীতের অর্থ জানি না, যে বাজাইতেছে তাহাকে কখনই দেখি নাই, তবু যেন সে গান শুনিয়া মনে হয়, হৃদয়ের নিভৃত কুটীরের ভিতর এক প্রদোষের বধূ বাস করিত —প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে যেন শঙ্খ বাজাইয়া মঙ্গল দীপ জ্বালিয়া মরমের পরিচ্ছিন্ন অলিন্দে যে একটি শ্যাম স্নিগ্ধ তুলসীবৃক্ষ ছিল, তাহার মঞ্জুল মঞ্জরী, যৌবন শ্যামিকা হইতে জলের ধারা দিয়া অনন্তের বাহু বিস্তারকে হৃদয়ের গলিপথের ভিতর আগে আগে করিয়া চলিত; সে বাঁশীর গানে

* To say that the world has only a physical and not a moral significance, is the greatest and most pernicious of all errors. The fundamental blunder, the real perversity of mind and temper... Schopenhaner Zur Ethik and Zur Rechtslehere and politic (B Saunder's translation) P. P. 1-2.

২৫৫